সেবা প্রকাশনী

কামিনী কাঞ্চন ১

সুধাময় ক

প্রকাশক :

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রকাশনী

১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৮০

প্রচ্ছদ : শাহাদত চৌধুরী

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণে :

মো: রুহুল আমিন
পলাশ মুদ্রণ
২৪, মোহিনী মোহন দাস লেন
ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :

সেগুনবাগান প্রকাশনী

১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

দুরালাপনী : ৪০৫৩৩২
জি, পি, ও, বক্স নং ৮৫০

KAMINI KANCHAN-1
By Sudhamay Kar

এক

বেলাভূমি যেখানটায় পশ্চিমে বাঁক নিয়েছে তার ডান দিকে কিছু দূরে একটা বাংলো। টালির ছাউনি। চারদিকে টিন। ভিটি পাকা। সাগরের দিকে মুখ করে প্রশস্ত বারান্দা। একটিই রুম। রুমের ভেতর এক প্রান্তে একটা ডিভান। মাঝামাঝি সোফা সেট, সেন্টার টেবিল। অন্য প্রান্তে একটা টেবিল আর চারটা চেয়ার। একটা চেয়ারে বসে খোলা জানালা পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাসেল। সাগর শান্ত। ছোট ছোট ঢেউ সাদা ফেনা নিয়ে এসে বালুকাময় বেলাভূমির গা ছুঁয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড রোদ। সূর্য আগুনের হল্‌কা ছড়াচ্ছে। বাতাসে ভর করে উত্তপ্ত সে-হল্‌কা এসে ঝাপ্‌টা মারছে রাসেলের চোখে-মুখে। পাহাড়ের গা থেকে নেমে আসা আঁকা-বাঁকা রাস্তাটার ওপর আবার চোখ ঘুরালো রাসেল। ঐ পথ ধরেই আসবে শাহেদ খান।

অসহ্য গরম। বাইরের বালু রাশির মতো ঘরের ভেতরটাও

বেশ তেতে উঠেছে। ঘামে ভেজা জামাটা খুলে ফেললো রাসেল। একটা চাপা অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠলো তার চেহারায়—গরমের জন্যেই কিনা বোঝা যাচ্ছে না। লম্বা টান দিয়ে জানালা পথে সিগারেটটা ছুঁড়ে দিলো রাসেল।

শক্ত-সমর্থ স্বাস্থ্য রাসেলের। গায়ের রং কালো। চেপ্টা মুখ। কালো মোটা গোঁফ। মায়াময় এক জোড়া চোখ। ডান চোখের নিচটা চিন্ চিন্ করে জ্বালা করছে। চোখটার নিচে হাত বুলালো রাসেল। অনেকটা কেটে গেছে। কাটা জায়গাটা ভেজা ভেজা। রক্ত।

ঘড়ি দেখলো রাসেল। তিনটে বাজেনি। শাহেদ খান আসতে এখনও পাক্কা দু'ঘন্টা বাকী।

বাইরে থেকে ঘরের ভেতর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো রাসেল। আড়মোড়া ভাঙলো। তারপর হঠাৎ করেই নজর চলে গেল ঘরের অন্য প্রান্তে, ডিভানটার ওপর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ দুটো সেখানে থেমে গেলো।

চিত হয়ে পড়ে আছে মেয়েটা। পা দু'টো একটার গায় আরেকটা লেপ্টে আছে। কোমরের বাঁকটা যেখান থেকে শুরু সেখানে কাপড় নেই। নাভিটা স্পষ্ট। আঁচলটা মেঝেতে। ব্লাউজের নিচে কালো ব্রা দেখা যাচ্ছে—উত্তাল যৌবন ঠেকিয়ে রেখেছে। টিনের ছিদ্রপথে এক ফোঁটা রোদ তেস্‌রা হয়ে মেয়েটির গালের ওপর এসে পড়েছে।

খুট্ করে একটা আওয়াজ হতেই চমকে উঠলো রাসেল। টেবিলের ওপর ন্যাশনাল প্যানাসোনিক টু-ইন-ওয়ান। ক্যাসেটটা

রিওইণ্ড হয়ে ঠিক জায়গা মতো এসে গেছে। নাহ্, আর দেরি করা ঠিক হবে না।

উঠে দাঁড়ালো রাসেল। এগিয়ে গেলো। আবার চোখ চলে গেলো মেয়েটার মুখে। নিজের মনেই শিউরে উঠলো রাসেল। ঐ মেয়ের দিকে আর তাকানো যায় না। মুখটা নীলচে হয়ে আছে। চোখ জোড়া কোটর থেকে বের হয়ে এসেছে। জিভটা মুখ থেকে ঝুলে পড়েছে। জোর করে চোখ ফিরিয়ে আনলো রাসেল। সেন্টার টেবিলে রাখা আছে রেঞ্চটা। টুল বক্স থেকে এনে রেখেছে। ভারী রেঞ্চটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিলো রাসেল।

আবার চেয়ারে বসলো। রেঞ্চটা টেবিলে রাখলো। এখনই রেকর্ড শুরু করা দরকার। ৯০ মিনিটের ক্যাসেট শেষ হবার পর হাতে আরও কিছু সময় সে পাবে। নিজেকে গুছিয়ে নেবার জন্যে সময়টা যথেষ্ট।

টু-ইন্-ওয়ানটা কাছে টেনে নিলো। রেকর্ডিং বাটনে হাত রেখে কাহিনীটা, যা রেকর্ড করবে, ভেবে নিতে চেষ্টা করলো রাসেল। কাহিনীটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দ্রুত এক চক্কর দিয়ে মন আবার চলে গেল মেয়েটার দিকে। নরম তুলতুলে একটা ছবি ভেসে উঠলো। হাসলে গালে টোল পড়ে। তার বাঁচার কি আপ্রাণ প্রচেষ্টা! শেষ মুহূর্তে আতঙ্কিত চোখে একরাশ করুণ মিনতি। কোন কিছুই ঠেকাতে পারেনি রাসেলকে। প্রচণ্ড আক্রোশে ওর দু'হাতের আঙুলগুলো ধীরে ধীরে চেপে বসেছে ঐ নরম গলায়।

যত্তোসব! নিজের মনকেই নিজে শাসন করলো রাসেল। সিগারেট ধরালো। ওসব ভেবে আর কি হবে? সে তো মরেই গেছে। এখন নিজের কথা ভাবতে হবে। সামনে সাংঘাতিক বিপদ। তা থেকে যেমন করেই হোক বেরিয়ে যেতে হবে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বাইরে, সাগরের দিকে চোখ ফেরালো রাসেল।

মনকে তৈরি করে টেপ-রেকর্ডারটা আরও কাছে টানলো। তারপর বাটন টিপে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বলতে শুরু করলো…

'জনাব পুলিশ কমিশনার সাহেব, আমি নালা-পাড়ার রাসেল বলছি। একটা খুনের স্বীকারোক্তি করছি—যে খুন আমি নিজে করেছি, আজ ৩১শে আগস্ট, বেলা দুটো তেত্রিশ মিনিটে।'

একটু থেমে বাইরের দিকে, পাহাড়ী পথটার দিকে তাকালো রাসেল। ঢোক গিলে গলা ভিজিয়ে আবার বলতে শুরু করলো, 'যে খুন আমি নিজে করেছি, সে কথা খুব সহজেই বলতে পারি। বলতে পারি, কেন এটা খুন জেনেও স্বনামধন্য গোয়েন্দা কবীর হোসেন আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারলেন না। কিন্তু এতসব কিছুর পরে আরও অনেক কথাই থেকে যায়, যা আমি আপনাকে সবিস্তারে জানাতে চাই। আমার কথায় আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারবেন—কেমন করে এ ঘটনার শুরু, আর কেমন করেই বা খুনের মধ্য দিয়ে তার শেষ হলো।'

'এ খুনের ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা জানার জন্যে সবাই উৎসুক। আপনিও। আমি সবই বলছি।'

'শুনুন…'

দুই

একটু পেছন থেকে শুরু করতে হচ্ছে। গত বছর এপ্রিল মাস। ওভারসিজ ব্যাঙ্কিং লিমিটেডের হেড অফিসে আমার ডেস্কে বসে নানারকম চিন্তা করছি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এমনি সব চিন্তা আমাকে প্রায়ই পেয়ে বসে। আমি তখন ব্যাঙ্কের স্টক ও সিকিউরিটি বিভাগের জুনিয়র অফিসার।

উঠে গিয়ে চিঠি পত্রের বাক্স দেখলাম। পাঁচটা চিঠি এসেছে। টেবিলে ফিরে এসে চিঠিগুলো খুললাম। তিনটে এসেছে পাওনাদারদের কাছ থেকে। ইউনিভারসিটি থেকে বের হয়ে তিন তিনটে বছর বেকার জীবন কাটাতে হয়েছে। সে-সময়ে বেশ কিছু টাকা ধার করেছিলাম। সে-টাকায় নিজে চলেছি, বাড়িতেও কখনো কিছু দিয়েছি। কিন্তু চাকরী পেয়ে ইচ্ছে থাকলেও সে-টাকা এখনও শোধ করতে পারিনি। বারবারই ওরা তাগাদা দিচ্ছে। প্রথম প্রথম নিজেরাই আসতো, এখন চিঠি লেখে। এর একজন আবার ধারের

কথা মালিককে জানিয়ে দেবে বলে শাসিয়েছে। আমি এ নিয়ে বড় চিন্তায় দিন কাটাই। ফলে প্রায়ই ব্যাঙ্কের কাজে মন বসাতে পারি না। গাফিলতি হয়। ভাবনা ত শুধু টাকা, আমার আরও টাকা চাই।

চতুর্থ চিঠিটা বাড়ি থেকে এসেছে। বাড়িতে আরও টাকা চাই। জমিজমা বিক্রি করে আমাকে লেখাপড়া শেখানো হয়েছে। কিন্তু চাকরী করে যে টাকা পাঠাই তা খুবই নগণ্য। ছোট বোনের দু'টো ভাল সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। টাকার অভাবে কিছু করা যায়নি। এবারের সম্বন্ধটা ফিরিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। টাকার দরকার।

শেষ চিঠিটা লিখেছে রিতা। আমার অনেক দিনের বন্ধু। অত্যন্ত ফাস্ট মেয়ে। বেপরোয়া। তবু রিতা বেকার জীবনে আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। সে নিজে একটা বিদেশী ফার্মে চাকরী করে। প্রয়োজনে এখনও টাকা দেয়। মাঝে মাঝে রিতার ওখানে রাত কাটাই। দিন কয়েক হলো সে ঢাকায় গেছে। সেখান থেকে লিখেছে, সে অন্তঃসত্ত্বা।

রিতাকে নিয়ে আমার কোন ভাবনা নেই। অন্ততঃ যতদিন না সে ঢাকা থেকে ফিরে আসছে। মেয়েদের কিভাবে সামলাতে হয় তা আমি জানি। সুতরাং রিতাকে ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারবো। কিন্তু শালার ঐ পাওনাদারগুলো — কত আর এ কথা সে-কথায় ভুলিয়ে রাখা যায়। যেমন করেই হোক আমার বেশ কিছু টাকা এখন যোগাড় করতে হবে। টাকার দরকার। আমার অনেক টাকা চাই। টেলিফোনটা

বেজে উঠলো।

রাসেল বলছি,—গলাটাকে যথা সম্ভব নরম করে কথা বললাম।

'মিঃ রাসেল, আপনি এখনই একবার এম ডি রেজা সাহেবের অফিসে আসুন।'

ও প্রান্তের রিসিভারটা রেখে দিল। আর এদিকে আমার শরীরে এক ঝলক গরম হাওয়া ছড়িয়ে পড়লো। ঘেমে উঠলাম। এ ধরনের ডাক আসাটা বিপদজনক। সবাই জানে এই ডাক আসার অর্থ। বুকটা ধড়াস করে উঠলো। ওই পাওনাদারদের কেউ তো ওখানে বসে নেই? নাকি কাজে কোন মারাত্মক ভুল হলো?

যা আছে কপালে, সারি সারি টেবিলের পাশ দিয়ে এম. ডি-র ঘরের দিকে চললাম। অনেকেই আমাকে দেখছে। তারা হয়তো জানে, আমি কোথায় যাচ্ছি। তারা হাসছে।

আসলে ওই লোকগুলোর অনেকেই আমাকে পছন্দ করে না। প্রায় সকলেই বিয়ে-থা করেছে। ঘোর সংসারী। আমি ওসবের ধারে কাছেও নেই। কাজে ফাঁকি দেই। সুন্দরী ঐ কেরানী মেয়েটার সাথে আমার খুব ভাব—এতেই তাদের আরো জ্বালা। শুধু আবদুর রশিদই আমাকে পছন্দ করে। সে কাজের লোক।

মাসুহুল হক রেজা, এম. ডির দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পিয়ন দরজা খুলে সরে দাঁড়ালো।

এগিয়ে গেলাম আমি। এম ডি ফাইলের লাল ফিতে বাঁধতে বাঁধতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসো রাসেল। বসো।'

বসলাম। ধীরে, একটা চেয়ার টেনে। অল্প চোখ তুলে তাকালাম। রেজা সাহেবের মুখটা গম্ভীর। রিতার অফিসের বস আমাকে যেদিন প্রথম তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন, সেদিন তাঁকে এত গম্ভীর মনে হয়নি। চাকরীটা হওয়ার পরও যত-টুকু মনে পড়ে, তাঁকে এ চেহারায় আর দেখিনি। হাতের সামনের কাগজগুলো একপাশে গুছিয়ে রেখে তিনি বললেন, 'তোমার বয়স কতো রাসেল?'

'একত্রিশ, স্যার।'

'তুমি কতদিন ধরে এখানে আছো?'

'তিন বছর, স্যার।'

'আবদুর রশিদও তোমার সাথে একই দিনে জয়েন করেছে। সে এখন কেরানী থেকে অফিসার। আর তুমি?'

'আমার চেয়ে সে হয়তো বেশি বুদ্ধিমান।'

'না। সে তার কাজ সম্পর্কে খুব যত্নবান, আগ্রহী। কাজের পেছনে সে লেগে থাকে। তুমি এর উল্টো। যত-টুকু দরকার তার চেয়েও কম কাজ কর।'

'তা ঠিক নয়, স্যার...' কি যেন বলতে চেয়েও বলতে পারলাম না। তাঁর চোখের দিকে চেয়েই আমি থেমে গেলাম।

'কোন অজুহাত শুনতে চাই না। তোমার সম্পর্কে সব

রিপোর্ট আমি দেখেছি। গত ক'দিন ধরেও আমি নজর রেখেছি। সত্যি বলতে কি, কাজ তুমি কিছুই কর না। ব্যাঙ্কের কাজের প্রতি তোমার একদম আগ্রহ নেই।'

ব্যাপারটা যে আমার স্বপক্ষে থাকছে না তা বেশ বুঝতে পারলাম। আর এ কথাটা মনে হতেই আমার গলাটা শুকিয়ে গেল। এরপর আরেকটা চাকরী যোগাড় করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

'অন্য কেউ হলে তাকে অনেক আগেই বিদায় করতাম।' একটু থামলেন রেজা সাহেব। তারপর গলার স্বর অনেকটা নরম করে বললেন, 'তোমার কি হয়েছে, রাসেল? তুমি কি এখানে থাকতে চাও না?'

তাঁর কাছ থেকে হঠাৎ করে এমন সহৃদয়তা আশা করিনি। দেরি না করে বলে ফেললাম, 'কাজে অবহেলার জন্যে আমি দুঃখিত, স্যার। আমি থাকতে চাই। এবারের মতো ক্ষমা করলে, আমি কথা দিচ্ছি—এ রকম আর হবে না।'

চোখে-মুখে প্রসন্নতার ছাপ ফুটে উঠলো রেজা সাহেবের। গা ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন। 'মিঃ টম্ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমাদের ভালো ক্লায়েন্টও বটে। শুধু এ কারণেই তোমাকে আর একটা সুযোগ দিতে চাই। তবে এবার একটা অন্য ধরনের কাজ দেবো তোমাকে।'

আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। 'ধন্যবাদ, স্যার।'

'ধন্যবাদ জানাবার জন্যে এত ব্যস্ত না হলেও চলবে।'

রেজা সাহেব আবার সামনের দিকে ঝুঁকে বসলেন। 'এটা বিশেষ ধরনের কাজ। একটু এদিক ওদিক হলে কাজটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। কুঁড়ে লোকদের জন্যে অসুবিধে হচ্ছে, একটু পিছলেছো কি মরেছো। শোন, কাজে উৎসাহের জন্য এ মাস থেকেই তোমাকে দু'শ টাকা বেশি দেবার ব্যবস্থা করছি। তবে সাবধান। কোনরকম ভুল যেন না হয়। লেগে থাকো, এ কাজ তোমাকে আরও লাভবানও করে দিতে পারে। হ্যাঁ, মনে রেখ, এটাই তোমার শেষ সুযোগ।'

ঝিম্ মেরে বসে রইলাম। আমার চেতনা মনে হয় লোপ পেয়েছে। বিশেষ কাজ বলতে তো ঐ একটা কাজই আছে যা আবদুর রশিদের দিবা রাত্রির দুঃস্বপ্ন। প্রমোশন পাওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ঐ বিশেষ কাজটি বেচারার চুলে পাক ধরিয়ে দিয়েছে। এ ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের জন্যে এটা একটা যন্ত্রণা। এ সেই কাজ, যার কাছ থেকে আমি সব সময়ই দূরে থাকতে চেষ্টা করেছি।

রেজা সাহেব আমার চোখের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে বললেন, 'কাজটা কি তা এর মধ্যে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, রাসেল? ভালো ভালো। আমি ধরে নিচ্ছি, তুমি রাজী। এখন থেকে লেলী অ্যাকাউন্টের সব দায়িত্ব তোমার ওপর থাকছে।'

জনাব কমিশনার, স্থানীয় কোটিপতি সালাম চৌধুরী সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়ই সব জানেন। লোহা নিয়ে যে

লোকটা ব্যবসা শুরু করেছিল, সে-লোকটা কিভাবে অন্যান্য ব্যবসায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে সাদা কালো টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছিল তা পুলিশের অজানা নয়। কিন্তু ছ'বছর আগে মৃত্যুর সময় সালাম চৌধুরী তার বিপুল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সাথে যে নগদ সাত কোটি টাকা তার একমাত্র মেয়ে শেলী চৌধুরীর জন্যে রেখে যায় তা আপনারা অনেকেই জানেন না বলে আমার ধারণা।

ভদ্রলোক মরার আগে তার যত্র-তত্র ছড়ানো বিরাট সম্পত্তি এবং ঐ টাকা দেখাশোনার জন্যে সুন্দর ব্যবস্থা করে গিয়েছে। কারণ সে চায়নি যে তার অর্জিত এই সম্পদ সাত-ভূতে লুটেপুটে খাক। তাই সব কিছুর দায়িত্ব দিয়েছিলো ওভারসিজ ব্যাঙ্কিং লিমিটেডের ওপর। উইলে এও শর্ত আছে যে, ব্যাঙ্কের দেখাশোনার কাজ যদি শেলী চৌধুরীর মনঃপুত না হয়, তবে ওভারসিজ থেকে তা অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যাবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ওভারসিজ ব্যাঙ্কিং লিমিটেডের জন্যে শেলী অ্যাকাউন্ট কত মূল্যবান এবং লাভজনক। সে-অ্যাকাউন্ট কিছুতে হাতছাড়া হোক, তা ভাবা যায় না।

অগাধ অর্থ-সম্পদের অধিকারিণী শেলী চৌধুরী সম্পর্কে কোনরকম ভুল ধারণা করবেন না। বাপের আয় করা টাকা যে সে সুযোগ পেয়ে দু'হাতে বেহিসেবী খরচ করবে সে-রকম মেয়ে সে নয়। বুড়ো চৌধুরী মেয়েকে সেভাবেই তৈরি করে দিয়ে গেছে। একদম গভীর জলের মাছ। বুড়ো যে

কি প্রকৃতির লোক ছিল তা তো সবারই জানা। তারই কড়া শাসনে শেলীকে দিনের পর দিন জেলখানার জীবন যাপন করতে হয়েছে। বাপের কাছ থেকে একটা পয়সা পেতো না। কারো সাথে মিশতে পারতো না। বাইরের লোক ডেকে কোন অনুষ্ঠান বা আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে আসা যাওয়া বুড়ো কখনো করেনি, বাইরের পৃথিবী থেকে একদম আলাদা করে নানা নিয়ম কানুনের বেড়াজালে বুড়ো শেলীর ওপর নির্মম অত্যাচার করতো।

কঠোর নিরানন্দ জীবনযাপন করতে গিয়ে শেলী চৌধুরীও তার বাবার সব ক'টি গুণই পেয়ে গেছে। সহজ স্বাভাবিক সুন্দর জীবনের ছোঁয়া যে মেয়ে পায়নি, তার কাছে এর বেশি কিছু আশা করাও যায় না। ফলে মেয়েটির জন্যে কারো দুঃখ হতো না। শেলীর মন যেমন নীচ, আচরণও তেমনি নিষ্ঠুর প্রকৃতির। প্রকট তার আত্মচেতনা। সবকিছু নিজের ছাড়া আর কিছু সে ভাবতে পারতো না। বুড়ো চৌধুরী ঠিক হিসেব করে মেয়েকে গড়েছে। আর তাই, বুড়ো সাত কোটি টাকার থলেটা রেখে মারা যাওয়ার পর, শেলী চৌধুরী দীর্ঘ ত্রিশ বছরের নির্জন বন্দীশালা থেকে যখন বেরিয়ে এলো, দেখা গেলো, ঠিক যেন একটা হিংস্র, ক্রুদ্ধ পশু আলোর জগতে পা দিয়েছে।

এর মধ্যে ওভারসিজের সবচেয়ে ভালো প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও কর্মতৎপর কুড়ি জন অফিসার, কেরানী শেলী অ্যাকাউন্ট নিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু কেউ বেশি দিন টিকতে পারেনি।

কেউ যদি চরম বিরক্তি সত্ত্বেও কাজটা না ছেড়েছে, তবে শেলী নিজেই তাকে অকর্মণ্যতার অভিযোগে তাড়িয়েছে, শুধু আবদুর রশিদই অন্যদের চেয়ে বেশি দিন টিকেছে। প্রায় ছয়মাস। শেলীর কেনা চাকরের মতো মুখ বুঁজে কাজ চালিয়ে গেছে রশিদ। এ নিয়ে ব্যাঙ্কের অনেকেই হাসতো। কিন্তু একবার যার ওপর এর ভার আসতো, সে সত্যিই হাসতে ভুলে যেতো।

আবদুর রশিদকে গিয়ে খবরটা দিতেই সে লাফিয়ে উঠলো। 'সত্যি বলছেন?'

'কপালের দুর্গতি বোধ হয় একেই বলে। আজই সব বুঝে নিতে হবে। চাকরীটা আর রইল না।'

'তাহলে চলুন, শেলী অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম সব বুঝিয়ে দেই। চলুন, ওঁর জন্যে আলাদা একটা ঘরই আছে আমাদের।'

সে-ঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত নানা রকমের র‍্যাকে ঠাসা। র‍্যাকগুলো আবার ছোট বড় নানা খুপরিতে ভাগ করা। সেসব খুপরিতে শেলী অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত সবরকম কাগজ-পত্র বিষয়-অনুযায়ী সাজানো। এমন কি একটা রশিদ বা এক টুকরো ছেঁড়া কাগজও এখানে আছে।

এ ঘরের নামই শেলী-ঘর। এ ঘরে অভিজ্ঞ সব লোকজন কাজ করে গেছে। তারা এমন উপায় বের করে সবকিছু সাজিয়েছে যাতে কোন বিষয়েই বোকা বনতে না হয়। মিস শেলী চৌধুরীর

সময়ে অসময়ে যে-কোন উদ্ভট প্রশ্নের চট্‌পট্‌ উত্তর দেয়া যায় তার সব ব্যবস্থাই তারা করেছে।

আন্তরিকতার সাথে আমাকে সব বুঝাতে শুরু করলো রশিদ। আমি তার কথা কিছু শুনলাম, কিছু শুনলাম না। ফাইল কিছু দেখলাম, কিছু দেখলাম না। এভাবে এক সময় আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো।

'প্লিজ থামুন। বন্ধ করুন ওসব।' আমি টেবিলের ওপর বসে পড়লাম। 'এত কিছু আমি জানতে চাই না।'

সে আমার দিকে এমন ভাবে তাকালো, আমি যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছি। তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, 'এগুলো জানতেই হবে। এ যে অ্যাকাউন্টের ভিত্তি। এ কাজের দায়িত্ব আপনার, অথচ আপনি বলছেন আপনি কিছু জানতে চান না?'

আমি তার কথার ধরন দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমি কি সত্যি কোন অন্যায় করে ফেলেছি?

'এ কাজ করতে হলে, কখন কোথায় হাত দিতে হবে, তা আপনাকে জানতেই হবে। শেলী ব্যাঙ্কের কাছে সব সময় কর্মদক্ষতা আশা করে। কারণ তার ইচ্ছার ওপরই এই অ্যাকাউন্টের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এটা হাতছাড়া হোক, কেউ তা চায় না।'

আমি সিগারেট ধরালাম। বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধ্যে হতে চলেছে। ক্লান্তি আর অবসাদ দূর করে নিজেকে একটু হালকা করতে চাইলাম। বললাম, 'কাউকে বলবেন না। এই অ্যাকাউন্ট যদি ব্যাঙ্কের হাত ছাড়া হয়ে যায়, তাতে

আমার কিছুই এসে যায় না। আমার কি হবে? বড়জোর চাকরীটাই যাবে। এম.ডি যদি ভেবে থাকে এর জন্যে আমি ঐ বেজন্মা মেয়েটার কেনা গোলামের মত রাত ভর কাজ করবো, তবে তিনি ভুল করেছেন।'

কথা ক'টা বলে আমি বেশ হাল্‌কা বোধ করলাম। চাকরী যাবে—কথাটা যাই হোক, মনে যেন স্বস্তি এলো। কিন্তু আমার কথা শুনে রশিদ যেন কাঠ হয়ে গেল। একটা র‍্যাক ধরে সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে মুখ তুলে যখন চাইল, দেখলাম, সে কাঁপছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাকে ধরে ফেললাম।

'কি হলো, রশিদ সাহেব? শরীর খারাপ লাগছে? বসুন এখানটায়।' চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। নিষ্পলক চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি মেলে ধরে সে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে দু'হাতে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে শুরু করলো।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। আমার কথায় কি রশিদ কোন ব্যথা পেয়েছে? সে কি এর মধ্যে কোন পরাজয় বোধ করছে? তার এই করুণ কান্নাকে অবহেলা করতে পারলাম না। বললাম, 'আপনি সহজ হোন। আমার কথায় যদি ব্যথা পেয়ে থাকেন, তবে তার জন্যে আমি দুঃখিত।'

রুমালে চোখ মুছলো রশিদ। নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করলো। বললো, 'আপনি জানেন না ও কি ধরনের মেয়ে! ওর সন্তুষ্টির জন্যে কী না করেছি! অমানুষিক পরিশ্রম করেছি। ক্রীতদাসের মতো কাজ করেছি।' রশিদের চোখ ফেটে আবার

জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো। 'চেয়েছিলাম কাজটা আমার হাতে থাক। এম.ডি বলেছিলেন, কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেবেন। শহরে বাসা করে গ্রাম থেকে অসুস্থ স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্যে নিয়ে এসেছি। ভেবেছিলাম বাড়তি টাকাটায় সংসার খরচ কোনমতে টেনে নেবো। কিন্তু হলো না। শহরে বাসার পাট চুকিয়ে ফেলতে হবে। শেলী হয়তো মাইনে বাড়ার কথাটা জানতে পেরেছে।'

'মাইনে বাড়বে আপনার, তাতে শেলীর মাথা ব্যথা কেন?'

'কেউ সুখে থাকুক ওটা শেলী সহ্য করতে পারে না। ভাবছেন চালাতে পারবেন? পারবেন না। প্রথম থেকেই দেখবেন, আপনার ওপর ডাণ্ডা ঘুরাতে শুরু করবে। একদণ্ডও শান্তিতে থাকতে দেবে না। অযথা রাত্রিবেলা ঘুম থেকে তুলে কিছু একটা জানতে চাইবে। অথবা খুব ভোরে ডেকে পাঠাবে। অজস্র কাজ ফেলে বসে থেকেছি দেখা করার জন্যে, ঘণ্টা কয়েক পরে হয়তো জানালো, দেখা হবে না। কাজ আছে বলেও অকারণে অনেক রাত পর্যন্ত আটকে রেখেছে। কি মেয়েরে বাবা—হাড়ে হাড়ে টের পাবেন, আমি এখন যেমন পাচ্ছি।'

রশিদের কথা শুনে আমার মনের সেই হালকা ভাবটা যেন আমাকে আরো হালকা করে ফেললো। বললাম, 'আপনি তা নিয়ে ভাববেন না। মেয়েদের কেমন করে ভজাতে হয় তা আমি জানি। ওই বজ্জাতটা আমার ঘাড়ে চাপার আগেই দেখবেন…।'

তিন

সকাল এগারটা। ১৪ই এপ্রিল। শেলী চৌধুরীর সাথে আমার দেখা করার প্রথম দিন।

এর আগে এক সপ্তাহ সময় পেয়েছি। এ সময়ে শেলী সংক্রান্ত ফাইলগুলো শুধু নাড়াচাড়া করেছি। তেমন মনোযোগ দেইনি। মনের সে হালকা ভাবটা এক দিনে আরও বেপরোয়া হয়েছে। কখনো ভেবেছি, চিন্তাটা খুবই বেহিসেবী। কিন্তু হিসেবী রশিদের কথা মনে হতেই আমার মনটা আবার পাগলা ঘোড়া হয়েছে। রশিদ শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমাকে শেলীর সাম্প্রতিক তিনটে দাবীর প্রতি মনোযোগ দিতে বলেছে। দাবীগুলোর যৌক্তিকতা নিয়ে রশিদ শেলীর সাথে একমত হতে পারেনি। রশিদ ছিল অবিচল। তাই রশিদকে সরাবার জন্যে শেলী এম. ডির ওপর চাপ দিয়েছে।

প্রথম দাবী: পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে শেলী দামী সব পাথর বসানো একটা নেকলেস করেছে। এ টাকা ইন্‌কাম

ট্যাক্সকে ন্যায্য খরচ হিসেবে গণ্য করে তার খরচের দাবীর সাথে যোগ করতে হবে।

দ্বিতীয় দাবীঃ সুজন টিলার বিরাট এলাকা জুড়ে শেলী ফাউণ্ডেশনের যে ফ্ল্যাট বাড়িগুলো রয়েছে, সেগুলোর ভাড়া শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ বাড়াতে হবে।

তৃতীয় দাবীঃ পাঁচলাইশে তার বাবার কেনা বিরাট জমিদার বাড়িটা ব্যাঙ্ককে বিক্রি করে দিতে হবে।

প্রথম দাবী ইন্‌কাম ট্যাক্স অবাস্তব হেতু গ্রহণ করবে না বলে রশিদ জানিয়েছে।

দ্বিতীয় দাবী সম্পর্কে রশিদের মত ছিল, মাত্র গত বছরই ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে নতুন করে তা সম্ভব নয়। ব্যাঙ্ক কমিশন এজেন্ট রোজ এণ্ড শাহ্‌ লিমিটেড এর মাধ্যমে বাড়িগুলোর ভাড়া আদায় করে। সে এজেন্টের বক্তব্য, ভাড়া বর্তমান সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তার ওপর ভাড়াটেদের কাছ থেকে বাড়তি ভাড়া আদায় অসম্ভব।

তৃতীয় দাবীর অবস্থাটা ভিন্নতর। পুরানো জমিদার বাড়ির দালানটি তেমন আকর্ষণীয় নয়। তবে দালানটির চারদিকে খালি জায়গা রয়েছে প্রচুর। বর্তমানে সে-জায়গার দাম অনেক বেড়েছে। কেনার ভাল প্রস্তাবও আসছে। কিন্তু ব্যাঙ্কের জন্যে মুশকিল হচ্ছে কয়েক ঘর ভাড়াটে নিয়ে। এরা বাড়িটি কেনার সময় থেকেই ওখানে আছে।

অর্থাৎ তিনটে জ্বলন্ত সমস্যা। অন্য কিছু যেমন তেমন, ঐ বজ্জাত মেয়েটার কাছে ক'দিন টিকতে হলে এ সমস্যাগুলো

নিয়েই কিছু একটা করতে হবে।

সকাল দশটায় ব্যাঙ্ক থেকে বাসায় এলাম। অফিসের পোশাক ছাড়লাম। স্মিতার পছন্দে কেনা লেভির গাঢ় নীল জীন্সের প্যান্ট পরলাম। সামনে, পিছে, পাশে পকেট। প্রত্যেক পকেটের কোণায় পিতলের পেরেক আঁটা। গায়ে চাপালাম জীন্সের শার্ট। তার ওপর হলুদ স্পোর্টস জ্যাকেট। লম্বা চেন লাগানো কোণাকোণি পকেট। স্টেইনলেস চিকণ ফ্রেমের হাল্কা সানগ্লাস। পায়ে বাছুরের চামড়ার জুতো। ব্যাঙ্কের নিয়মমত অফিসের পোশাক কালো স্যুট পরেই এতদিন সবাই যেতো, আমি চলেছি সম্পূর্ণ ভিন্ন সাজে। ঘর থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিলাম।

চৌধুরী ভবন শহর থেকে কিছু বাইরে উঁচু পাহাড়ের টিলার ওপর। রাঙামাটি যাওয়ার সড়ক থেকে পাহাড় কেটে তৈরি নিজস্ব রাস্তা এঁকে-বেঁকে অনেক মোড় ঘুরে চলে গেছে চৌধুরী ভবনের প্রধান ফটক পর্যন্ত। সেখানে অনেক উঁচু লোহার গেট।

বাড়ি নয়তো যেন প্রাসাদ। ফটকের কাছ থেকে বাঁধানো সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে, চত্বর পর্যন্ত।

কাউকে ডাকতে হলো না। দরজা খুলে গেল। সামনে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে শেলীর চাকর, তারা মিয়া।

লম্বা। পেটান শরীর। গম্ভীর, বড় লোকের বাড়ির চাকরের আভিজাত্য। ধূসর চোখে অবজ্ঞার ঝিলিক।

'আমি ওভারসিজ ব্যাঙ্কিং লিমিটেডের রাসেল। মিস্ শেলী চৌধুরী আছেন ?'

নিশ্চল লোকটি কোন কথা বললো না। একটু নড়লো শুধু। আমি তার পাশ দিয়ে হেঁটে বিরাট এক হলঘরে পৌঁছলাম।

'এখানে বসুন।' লোকটি আর দাঁড়ালো না।

বসলাম না। ঘুরে ঘুরে দেখলাম। দেয়ালে প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রের কিছু নমুনা সাজানো। লম্বা ক্যানভাসে দু'টি তৈলচিত্র। এতবড় হলঘরের নির্জনতা দূর করতে সেগুলো অক্ষম। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। শুধু স্তব্ধতা। সে-স্তব্ধতা যেন এ দেয়াল থেকে সে-দেয়াল, সে-দেয়াল থেকে ঘরের বাইরে এবং সেখান থেকে পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে। আমার মনে উল্টো হাওয়া বইলো। এমন বিশ্রী রকম গম্ভীর পরিবেশে আমার খেলোয়ারি পোশাক যেন একেবারে বেমানান। অস্বস্তি লাগলো, সেই সাথে একটু ভয় ভয়।

অফিসের কালো পোশাক। কপালে ঘাম। হাতে ব্রীফকেস। এ হলঘরে দাঁড়িয়ে আছে রশিদ। ছবিটা ভেসে উঠতেই কেউ যেন মনের জোর কেড়ে নিলো। একটা যুদ্ধের জন্য অপেক্ষমান্‌ আমার মনে সংকট জাগালো। নিশ্চিত পরাজয়। চাকরীটা রইলো না।

তারা মিয়া ফিরে এলো। 'আসুন।'

চললাম। বিরাট চওড়া বারান্দা। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগলো নাকে মুখে। সতেজ অনুভব করলাম। থামলাম একটা ভারী কাঠের দরজার সামনে।

তারা মিয়া দরজায় ছোট্ট করে টোকা দিলো। তারপর দরজাটা ভেতর দিকে ঠেলে একপাশে দাঁড়ালো। একটু উঁচু

গলায় বললো, 'ওভারসিজ ব্যাঙ্কিং লিমিটেডের মিস্টার রাসেল।'

সতেজ ভাবটা বুকে ধরে ঢুকে পড়লাম।

ছোট ঘর। কিন্তু খোলামেলা। তাজা ফুল সাজানো। জানালা পথে দূরে পাহাড়ের সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ে। সে-খোলা জানালার ধারে বিরাট ডেস্ক। একটি মেয়ে বসে। তার মাথায় কালো চুল। কিন্তু অবিন্যস্ত। চোখে চশমা। চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে দু'টি চোখ আমাকে নিরীক্ষণ করছে।

'আপনি মিঃ রাসেল?'

'আমিই রাসেল।'

পেছন দিকে টেনে জড়ো করা টানা চুল আর চোখের চশমায় মেয়েটিকে খুব সতী-সতী দেখাচ্ছিল। তেমন সতীদের প্রতি আমার দারুণ বিতৃষ্ণা।

'আমি মিস্ পারভীন, মিস্ শেলী চৌধুরীর সেক্রেটারী। আপনি বসুন। মিস্ শেলীর একটু দেরি হবে।'

রুমালে কপালের ঘাম মুছছে রশিদ। বসে আছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একসময় বলা হতো চলে যেতে। স্বচ্ছ দৃশ্য পট। কিন্তু আমি তা হতে দিচ্ছি না।

'মিস্ শেলীর সময় হলে বলবেন। আমি বাগানে আছি।' ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বেরিয়ে এলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা বাগানে। সিগারেট ধরালাম। ভাবলাম পনেরো মিনিট দেখবো।

মনে বেশ অসহিষ্ণু ভাব নিয়ে মালিদের কাজ দেখছি। চোখ বুলিয়ে দেখলাম, সুন্দর সুন্দর নানা জাতের ফুলে ভরা

বাগান। এক সময় চাতালে বসলাম। আরেকটা সিগারেট শেষ করলাম।

পনেরো মিনিট যেতেই সোজা গিয়ে মিস্ পারভীনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'মিস্ শেলী কি এখনও তৈরি হননি?'

'আমার মনে হয় আরও কিছুটা সময় লাগবে, মিঃ রাসেল।'

'দয়া করে একটা কাগজ আর একটা খাম দেবেন?'

মিস্ পারভীন চমকে উঠে আমার দিকে তাকালো। কিছুটা ইতস্ততঃ করলো। তারপর ড্রয়ার থেকে কাগজ আর খাম বের করে দিলো।

'ধন্যবাদ। কিছু মনে করবেন না...' বলতে বলতে ওর সামনের পোর্টেবল টাইপ রাইটারটা হাত বাড়িয়ে তুলে নিলাম। আমার সামনে মেশিনটা রেখে চেয়ার টেনে বসলাম।

এক সময় টাইপিং শেখাটা কাজে লাগলো। ধীরে অথচ পরিচ্ছন্ন ভাবে একটা চিঠি টাইপ করে ফেললাম:

প্রিয় মিস্ শেলী,

আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে পনের মিনিট ধরে বসে আছি। মিস্ পারভীন বলছেন, আপনার আরো দেরি হতে পারে।

আপনাকে মনে করিয়ে দেয়া আমার কর্তব্য যে, এই মূল্যবান সময়ের প্রতিটি মিনিট আমি আপনার সময় ও অর্থের অপচয় করছি। প্রবাদ আছে বিনিয়োগকারী ঘুমিয়ে থাকলে শেয়ার বাজার তার জন্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে না।

এছাড়া গয়নার ব্যাপারে কিছু আলোচনা ছিল এবং তা একটু জরুরী।

চিঠিটা সই করে খামে পুরে মিস্‌ পারভীনের দিকে তাকাতেই সে কলিং বেলের বোতাম টিপলো। দরজা ঠেলে জোয়ান একজন লোক এগিয়ে এলো। তাকে চিঠিটা দিয়ে বললাম, 'এটা এখনই মিস্‌ শেলীর হাতে পৌঁছে দাও।'

অপেক্ষা করছি। দীর্ঘ নীরবতা আমার মনে আবার প্রতি-ক্রিয়া শুরু করলো। সিগারেট ধরালাম। স্নায়ুকে চাংগা রাখতে হবে। ঘড়ি দেখছি। সময় চলছে। আমার অস্থিরতাও বাড়ছে।

খুট্‌ করে দরজায় শব্দ হতেই ফিরে তাকালাম। সেই জোয়ান লোকটা। বিনয়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বললো, 'তিনি এখনই দেখা করবেন, স্যার। দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।'

সামনে পা বাড়াবার আগে মিস্‌ পারভীনকে একবার দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। ঘাড় ফেরালাম। দেখলাম, অপলক তাকিয়ে আছে। চোখে দারুণ বিস্ময়। আর—একটু প্রশংসাও যেন।

লোকটার পিছু নিলাম।

আমি তখন হালকা হাওয়ায় ভাসছি।

মিস শেলী চৌধুরী দেখতে কেমন তা আমার জানা ছিল না। তাই যখন দেখলাম, চমকে উঠলাম।

মস্ত বড় বিছানায় একটা ক্ষুদ্র জীব। আধশোয়া হয়ে আছে। এক মাথা শুকনো এলোমেলো চুল। রোগা। লাবণ্য-হীন। কালো গর্তে বড় বড় জলজলে দু'টো চোখ। গভীর ভাবে ডুবে আছে। হাড়সর্বস্ব নাকটা খাড়া। দেখলে কষ্ট হয়।

আমি দেখছি। সেও আমাকে দেখছে। তার তাকানোতেই মনে হয় সে খিটখিটে মেজাজের। অস্থির।

'আপনিই রাসেল?'

লিকলিকে চেহারা, অথচ গম্ভীর গলার স্বর।

'হ্যাঁ, মিস শেলী। আমিই মিঃ রশিদের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিয়েছি। আমাদের এম.ডি···' থেমে গেলাম। মনে হলো কিছু বলবে।

'এটা আপনি লিখেছেন?' আমার চিঠিটা দেখালো।

'হ্যাঁ।'

ওর ঐ গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমার আপাদ-মস্তক যাচাই করলো। ভীষণ অস্বস্তিকর।

'দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে আপনাকে, মিঃ রাসেল। তা ওই পোশাক আমার কোনও উপকারের জন্য পরেছেন বোধ হয়?'

'নিশ্চয়ই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বৈচিত্র্যহীন ব্যাঙ্কের ঐ লোকগুলো আপনাকে দ্রুত ক্লান্ত করে তুলতো। আমার ধারণা, একটু অন্যরকম আপনার ভালো লাগবে।'

'বেশ চতুর ধারণা আপনার!' আমার লেখা চিঠিটা দোলাতে দোলাতে বললো, 'এটাও আপনার চতুরতার প্রকাশ। আপনাকে আরো কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখার ইচ্ছে ছিল আমার।'

'তেমনটা ভেবেই আমি এটা লিখেছি।'

ঘাড় কাত করে আমাকে আরো কিছুক্ষণ দেখলো। বিছানার পায়ের দিকটা একটু খালি করে বললো, 'ইচ্ছে করলে বসতে পারেন।'

পায়ের দিকে বসলাম।

'আমার নেকলেসটা সম্বন্ধে কি যেন বলতে চাইছেন?' শেলীর চোখে সন্ধানী দৃষ্টি।

ওই তিনটে বিষয়ের একটি। যা নিয়ে বিস্তর নাকানি চোবানি খেয়েছে রশিদ। ফাইলগুলো দেখেছি, তাই রক্ষে। তাছাড়া ওগুলোর ভাল বন্দোবস্তের চিন্তাও করেছি। কিন্তু এখনই তা বলা ঠিক হবে কিনা ভাবছি।

'আলোচনা করার আগে আপনার একটা আশ্বাস চাইবো। আমার যুক্তিগুলো আপনার গ্রহণযোগ্য না হলে সেগুলো ভুলে যেতে হবে।'

'বেশ, বলে যান।'

'মিস শেলী, যতটুকু শুনেছি এবং আমার মনে হয়েছে, এ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক তার নিয়মানুযায়ী যে ভাবে আপনার বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করেছে ও পরামর্শ দিয়েছে, তা আপনার পছন্দ হয়নি। আপনি আর ব্যাঙ্কের মধ্যে ক্রমাগত নদীর মতো একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। আমি নদী পার হয়ে আপনার দিকে এসে কাজ করতে চাই।'

বিস্ময় ভরা চোখে দেখলো আমাকে। বললো, 'আপনি আমাকে বেশ আগ্রহী করে তুলছেন। নেকলেস সম্পর্কে বলুন।'

'নেকলেস কেনার খরচটা নিয়ে যে দাবী আপনি করছেন তা ব্যাঙ্ক ও ইন্‌কাম ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের কাছে অযৌক্তিক পাগলামী বলে মনে হয়েছে।'

শেলীর দিকে একবার ভাল করে তাকালাম। তার আগ্রহে

কোন ভাটা দেখলাম না। বললাম, 'এমনই হয়। কোন কাজ থেকে রেহাই পেতে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো সহজ পন্থা। ব্যাঙ্কের মনোভাব অবশ্য ঠিক তা নয়।'

'ব্যাঙ্কের জন্য না ভাবলেও চলবে। বলুন।'

'তা হয় না। ব্যাঙ্কের কথা ভাবতেই হবে। এ ব্যাপারে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে যাওয়াই আমাদের জন্যে নিরাপদ। কেননা, ব্যাঙ্কের হিসেব ইন্‌কাম ট্যাক্স সহজেই গ্রহণ করে। তবে ব্যাঙ্ককে এর স্বপক্ষে সব রকম রশিদ পত্র মজুত রাখতে হয়। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা, ঐ রশিদগুলো তারা খুব কম সময়ই দেখে থাকে।' ওর দিকে চাইলাম।

'আমি শুনছি।'

'খরচ হিসেবে নেকলেসের দাম আদায় করতে হলে একটা ধাপ্পার পথ বেছে নিতে হবে। যাকে অন্য কথায় বলা যায় জালিয়াতি।'

আমি থেমে গেলাম। ওর চোখে চোখ রেখে প্রতিক্রিয়া বুঝতে চাইলাম। কিছুই বুঝলাম না।

'ব্যাপারটা আর একবার বলবেন কি, মিঃ রাসেল ?'

নাহ্, ওর গলার স্বরেও কিছু বুঝা গেল না। সাংঘাতিক মেয়েরে বাবা। এখনই তো এম. ডি-কে টেলিফোন করবে না ? গলাটা ছুরির নিচে বাড়িয়ে দিলাম না তো ? দেখা যাক, এখন তো আর পিছিয়ে আসা যায় না।

'মিস শেলী, এ জালিয়াতির অর্থ হচ্ছে কর ফাঁকি দেয়া। এ জন্যে আপনার জরিমানা হতে পারে। জেলও হতে পারে।'

'ফাঁকিটা ধরা পড়বে কি ?'

বাঁচা গেল। আমি ওটুকুই বুঝতে চেয়েছিলাম। জালিয়াতির পরামর্শে খুব ঝুঁকি ছিল। বেঁকে বসলেই হয়ে যেত, ডুবে যেতাম। কিন্তু না, আমার জালে সে পা দিয়েছে। ভাবছে ধরা পড়বে কিনা। এর পরের কাজ খুব সহজ।

'কাজটায় যে ভাবে খোলস পরাবো ভাবছি, তাতে ঝুঁকি সামান্তই। পাঁচশো ভাগের এক ভাগ।'

'কি ভাবে সামাল দেবেন ?'

'আপনার বাবা বহুদিন আগে ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর মেরামত ও কিছু পরিবর্তন করে খরচটা ন্যায্য খরচ হিসেবে পেয়েছিলেন। কাজটা হয়েছে, ব্যাঙ্কের কথাই ইন্‌কাম-ট্যাক্স মেনে নিয়েছিল। তারা কোন রশিদ দেখতে চায়নি। সেই রশিদগুলো আছে এবং সন-তারিখ উঠিয়ে নতুন করে বসিয়ে নিলেই সেগুলো আবার নতুন রশিদ হয়ে যাবে। রশিদগুলো যে টাকা খরচের প্রমাণ দেবে, সে-টাকা আপনার নেকলেসের দামের চেয়েও বেশি।

'নতুন করে কি কাজ হয়েছে তা যদি ওরা খোঁজ নেয় ?'

'তাহলে আমরা ডুববো। তবে তা করবে না। তাদের করার মতো আরও অনেক কাজ আছে। ওভারসিজ ব্যাঙ্কিং লিমিটেডের কথার তারা মূল্য দেয়।'

আস্তে মাথা নেড়ে শেলী হাসলো। ছোট ছোট দাঁত। সাদা ধবধবে।

'এর ওপর আমাদের গলাটা ভিজিয়ে নেয়া উচিত, কি বলেন,

মিঃ রাসেল ?' হাত বাড়িয়ে একটা বোতামে চাপ দিলো, 'খুব চতুর লোক আপনি।'

সহজেই সব মিটে গেল। তাই আশা করেছিলাম। যে কথা এতদিন শুধু ভেবেছি, এখন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, টাকা—টাকার দরজাটা আমার সামনে খোলা। জীবনে সুযোগ পাইনি, এখন আসছে। আমি তা হারাতে চাই না। আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রত্যয় নিয়ে। শুধু ধৈর্য আর অপেক্ষা।

রূপালী ট্রেতে দু'গ্লাস কোল্ড ড্রিংক নিয়ে তারা মিয়া ঘরে ঢুকলো। টেবিলে রাখলো। গ্লাসে ছোট ছোট সাদা বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে।

দু'জনেই গ্লাসে চুমুক দিলাম।

'নেকলেসের সুরাহা তো হলো। এবার বাড়ি ভাড়া বাড়ানোর ব্যাপারে আপনার মতামত বলুন।'

আমি এ প্রশ্নের জন্যে তৈরিই ছিলাম। আমি জানি, যতই কোল্ড ড্রিংক খাওয়াক আর সদয় ব্যবহার করুক, তা সবই রশিদের আপত্তিকৃত কাজ করে দিচ্ছি বলে। যতক্ষণ কাজে লাগবো, ততক্ষণই আমি টিকে আছি।

'বাড়ি ভাড়া বাড়ানো ?' আমি মনে মনে একটা তুড়ি বাজালাম। 'তা হয়ে যাবে।'

'কি করে ?'

'ভাড়া আদায়ের এজেন্ট বদলাতে হবে। এমন কাউকে এ কাজ দিতে হবে যারা অনায়াসে ভাড়া বাড়াতে পারবে।'

'তাহলে আর অপেক্ষা কেন?'

'একটা চিঠি। চিঠিতে আপনি জানিয়ে দেবেন যে, রোজ এণ্ড শাহ্ লিমিটেড পহেলা তারিখ থেকে আর আপনার প্রতিনিধি থাকছে না।'

'কিন্তু ওরা যে অনেকদিন থেকে, বাবার আমল থেকেই ভাড়া আদায় করে আসছে!'

'কোন লোক অকর্মণ্য হয়ে গেলে তার থেকে রেহাই পাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

কেমন যেন সন্ত্রস্ত চোখে তাকালো সে। চুপ করে রইলো।

এক সময় আমিই বললাম, 'তাহলে রোজ এণ্ড শাহ্ এর চিঠিটা লিখে যাবো, সই করে রাখবেন।'

শুয়ে পড়লো শেলী। তাকে মনে হচ্ছিল সাজানো গোছানো ছোট্ট এক নিষ্প্রাণ পুতুল।

'আজ সময়টা চমৎকার কাটলো, মিঃ রাসেল। আগে আর কোন লোকের কাছ থেকে এত সহযোগিতা পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না।'

'আমাদের আলোচনা শেষ হবার আগে এটা কি ধরে নিতে পারি যে, আপনি এখনও পাঁচলাইশের বাড়িটা বিক্রি করতে ইচ্ছুক?'

'সব দায়িত্ব আজই শেষ করে ফেলবেন দেখছি! তা কিছু ভেবেছেন নাকি?'

'এর সবটাই আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে।'

'কিন্তু ভাড়াটেদের নিয়ে যে সমস্যা··· ?'

'এটা কোন সমস্যাই নয়।'

'তার মানে?'

'এ সব সামান্য বিষয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না, মিস শেলী। ওটা আমাকেই করতে দিন।'

'বেশ, আমি বিক্রি করতেই চাই!'

'তাহলে আজই পার্টির সাথে যোগাযোগ করি।'

'আপনি সত্যি একটা আগুনের গোলা।'

মৃদু হাসলাম আমি। বিছানার পাশে ঘড়িটার দিকে তাকালো ও। 'আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, এখনও পোশাকই বদলানো হয়নি।'

বুঝলাম, কি বলতে চাইছে শেলী। আমার যা জানার হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়ালাম।

'আপনার সাথে আলাপে সন্তুষ্ট হলাম, মিঃ রাসেল। আপনার মতো বুদ্ধিমান মানুষকে এ কাজে পাঠানোয় খুব খুশি হয়েছি। রেজা সাহেবকে বলবো।'

'ধন্যবাদ, মিস শেলী।' একটু থেমে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম আমি। 'একটা কথা, আমার জন্যে আপনাকে দু'টো কাজ করতে হবে।'

'তাই নাকি? কি করতে পারি বলুন?'

'কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। তাই আপনার একটা গাড়ি যদি ধার দেন···'

'আপনাকে কাজের জন্যে গাড়ি দেয়া নিশ্চয় ব্যাঙ্কের কাজ?'

'তা বটে। তবে ব্যাঙ্কের গাড়ি পেতে দেরি হবে। তাই বলছিলাম, অবশ্য আপনার কোন বাড়তি গাড়ি না থাকলে—'

'বাড়তি ছ'—ছ'টা গাড়ি আমার।' একটা ঝাপটা মেরে থামিয়ে দিলো আমাকে।

'তাহলে একটা অন্ততঃ ধার দিতে পারেন।'

রাগে শিরশির করে উঠলো শেলী। ঠোঁট কামড়ে ধরলো। গাড়ি দিতে সে প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করছে। আসলে কাউকে কোন জিনিসের ভাগ দিতেই তাঁর ঘোর আপত্তি।

'ঠিক আছে, কিন্তু একদিন বা বড়জোর দু'দিনের জন্যে। গ্যারেজে যান, গোমেজ একটা গাড়ি দিয়ে দেবে।'

'কষ্ট করে ফোন করে দিন, গাড়িটা খারাপ হোক, তা আমি চাই না।'

তাকালো, যেন ফেটে পড়বে। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ হেসে ফেললো। 'সাংঘাতিক লোক আপনি! যা হোক, আমার মনে হচ্ছে আপনাকে পছন্দ করতে শুরু করেছি। যা করছেন, জেনেশুনে করছেন বলেই বিশ্বাস করি।'

'আপনার বিশ্বাস বেঠিক নয় বলেই মনে হয়। আরেকটা, খুবই সামান্য। আমার মতে আপনার যে সব কাজ করছি সেগুলো খুবই গোপনীয়। আমার কাজে অন্য কেউ উঁকি দিক তা আমি চাইব না। অর্থাৎ আপনারই স্বার্থে আমার একটা আলাদা অফিস ঘর থাকা বাঞ্ছনীয়।'

আমার কথাগুলো শেলীর মাঝে এমন ক্রিয়া করবে ভাবতে পারিনি। সে আমার দিকে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে কিছু সময়

তাকিয়ে থেকে হেসে উঠলো।

'রেজা সাহেব কি জানতেন যে তার একটি ধুরন্ধর কর্মচারী আছে? বোধ হয় না। যাই হোক, মিঃ রাসেল, আপনিই বলবেন আলাদা ঘরের ব্যবস্থার কথা আমি বলেছি।'

একটা গাড়ি। নিজস্ব অফিস ঘর। আর আমার এতদিনের সাধের পৃথিবীর দরজা—

এই তো সবে শুরু।

চার

পুরানো একটা বড় টেবিল। ওপরের রেক্সিনটা কয়েক জায়গাতেই ছিঁড়ে গেছে। বিবর্ণ। খান কয়েক চেয়ার। ওপাশে বসে আছে গোলগাল মুখওয়ালা এক বৃদ্ধ। দরজার পাশে একটা ছোট টেবিলে এক ছোকরা বসে টাইপ করছে। মেশিনটির জীর্ণ দশা দেখার মতো। সদর ঘাট রোডের এত পরিবর্তন হলো, কিন্তু বাড়ি বিকি-কিনির দালাল মোসলেউদ্দিনের কোন পরিবর্তন হলো না।

টাইপিস্টের সপ্রশ্ন দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সোজা গিয়ে বসলাম মোসলেউদ্দিনের সামনে। 'আমি রাসেল। ওভারসিজ ব্যাঙ্কিং লিমিটেডের পক্ষ থেকে। মিস্ শেলী চৌধুরীর কাজের ভার এখন আমার ওপর।'

মোসলেউদ্দিন তার দীর্ঘ দিনের দালালী দৃষ্টিতে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। জ্যাকেটের বড় বড় পকেট থেকে জুতো পর্যন্ত। সব।

'মাপ করবেন, মিঃ রাসেল। আপনাকে ঠিক ব্যাঙ্কের লোক বলে মনে হচ্ছে না।'

'ও কথা থাক। পাঁচলাইশের বাড়িটা কেনার ব্যাপারে আপনার মক্কেল কি এখনও আগ্রহী?'

'কিন্তু রশিদ সাহেব যে বলেছিল, বাড়িটা বিক্রি হবে না।'

'হবে। তবে শর্ত আছে।' আমি টাইপিস্ট ছোকরাটার দিকে তাকালাম।

মোসলেউদ্দিন ঐদিকে তাকিয়ে ইশারা করলো। টাইপিস্ট বের হয়ে গেল।

'শর্তটা কি?'

'ভাড়াটেদের দায়িত্ব নিতে হবে। তাহলে, যে দামের প্রস্তাব দিয়েছেন তাতেই হবে।'

'ভাড়াটেদের—'

'মিস্ শেলী তাড়াতে চান না। তিনি এ বিষয়ে একটু স্পর্শকাতর, অনেক পুরানো ভাড়াটে বলে। যিনি বাড়ি নেবেন, তিনি তা হবেন কেন? বাড়ি হাতে পেলে ভাড়াটে তাড়াতে কতক্ষণ?'

কি যেন ভাবলো মোসলেউদ্দিন। তারপর সামনে একটু ঝুঁকে বললো, 'ঠিক আছে। আমার পার্টির পক্ষে প্রাথমিক কাগজ পত্র আমিই সই করবো।'

'ভালো কথা।' সিগারেট ধরালাম। ঐ বুড়ো দালালটাকে বুঝতে চাইলাম। 'তার আগে, আমার সাথে কথাটা শেষ করে নিলে কি ঠিক হতো না?'

চোখ দু'টো কুঁচ্‌কে আমার দিকে তাকালো সে। 'খুব দেখাচ্ছেন বটে! তা বলুন আপনার কথা।'

'আমাকে পাঁচ হাজার দিতে হবে।'

'ঐ তো ঐ একই চাল, কি বলেন—অ্যাঁ?' হ্যা হ্যা করে ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হেসে উঠলো মোসলেউদ্দিন।

'গুণী লোক, ঠিকই ধরেছেন। না পোষালে বলে দিন, আমি অন্যত্র দেখবো।'

'আমার পার্টিকে আমি বাড়িটা পাইয়ে দিতে চাই।' সোজা হয়ে বসলো মোসলেউদ্দিন। ড্রয়ার খুললো। 'আপনাকে অসন্তুষ্ট করে আমি তা করব না।'

মনে হলো, কম চেয়ে ফেলেছি।

'মিঃ রাসেল, এই নিন। আপনি একটু দেখবেন যাতে তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করা যায়।'

আমার তখন আর কোন কথাই কানে ঢুকলো না। নতুন এক থোকা নোটের গন্ধ আমাকে মাতাল করে ফেললো।

দিনের শুরুটা আজ ভালই।

আগ্রাবাদে যে কয়েকটা জায়গা-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ এজেন্সি রয়েছে তার মধ্যে রোজ এণ্ড শাহ্‌ লিমিটেডই সবচেয়ে নামী এবং বনেদী। সাম্প্রতিক কালে নতুন যারা এ ব্যবসা শুরু করেছে তার মধ্যে ওরিয়েন্ট সিণ্ডিকেট হচ্ছে একটি। তারা ব্যবসায় সুনাম অর্জন করার বদলে বাজারে এর মধ্যেই কিছু কিছু বদনাম কুড়িয়েছে। শেলীর কাজটা পেলে তারা হাতে স্বর্গ পাবে।

তাছাড়া ভাড়া আদায় ও দেখাশোনার জন্যে তাদের নিয়োজিত লোকগুলো ডাণ্ডাবাজীতে ওস্তাদ। সুতরাং বাড়তি ভাড়া আদায় কষ্টকর হবে না।

স্টেশন রোড দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছি। স্টিয়ারিং হাতে নিজেকে খুব ভারিক্কি বোধ হচ্ছে। গাড়ি চালানোটাও শিখেছিলাম রিতার জন্যেই। ওর খুব সখ, আমি ড্রাইভ করি, ও পাশে বসে থাকুক। মাঝে মাঝে শনিবারে বা ছুটির দিনে রিতা তার অফিসের গাড়ি নিতো। আমরা চলে যেতাম কক্সবাজার বা রাঙামাটি-কাপ্তাই। ঘুরতাম। হাসতাম। বেড়াতাম। রাত কাটাতাম। রিতার উচ্ছলতা বুকে লেগে থাকতো। দু'তিন দিন আর অফিসের কাজে মন বসতো না। আজ যদি রিতা, …নাহ্, এখনও ঢাকা থেকে ফেরেনি।

আজগর আলীকে ঠিকমত বাগে আনতে পারবো তো? লোকটা খুব সুবিধের নয় বলেই শুনেছি। শেলীর কাজটা ওর জন্যে কি লোভনীয় হবে না? ওরিয়েন্ট সিণ্ডিকেটের মালিক আজগর আলী এ প্রস্তাব লুফে নেবে না?

তাকে অফিসেই পেলাম। গাঢ় লাল লিপষ্টিকের রঙে রাঙানো ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে মেয়েটি আমাকে আজগর আলীর ঘরে নিয়ে গেল।

মোটা-সোটা আজগর আলী তাকালো আমার দিকে। ঝুলে পড়া গোঁফের ওপরে এক জোড়া নীল চোখ। চিক্ চিক্ করছে। উঠে দাঁড়িয়ে তার মোটা হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'আসুন, মিঃ রাসেল। খুব আনন্দিত হলাম। বসুন।'

বসলাম। 'জানেন নিশ্চয়ই, ওভারসিজ ব্যাঙ্কিং লিমিটেড মিস্ শেলী চৌধুরীর বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করে।'

আজগর আলী মাথা কাত করলো।

'ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসেবে সে-কাজের দায়িত্ব আমার। কাজের ধারায় কিছু পরিবর্তন আনা হবে। ভাড়া আদায়ের কাজটার ব্যাপারে কি আপনারা আগ্রহী?'

আজগর আলীর মুখে কোন ভাবান্তর দেখতে পেলাম না। টোপটা কি সে গিলবে না?

'রোজ এণ্ড শাহ্ লিমিটেড কি কাজটা আর করবে না?'

'মিস শেলীই আর তাদের দিয়ে কাজটা করাতে চান না।' ব্যাগ থেকে গত মাসের ভাড়ার হিসাব বের করে ওর সামনে দিলাম। 'এর ওপর আরও পঁয়ত্রিশ ভাগ ভাড়া তিনি বাড়াতে চান।'

হিসেবটা দেখলো আজগর আলী। মনে মনে হয়তো অঙ্ক কষলো। কমিশন কত আসবে।

'ভাড়া বাড়াতে কোন অসুবিধে হবে না। আমার মক্কেল-দের পছন্দ মত ভাড়া আদায়ের সুনাম এ প্রতিষ্ঠানের আছে। আর আমার লোকজনও এ কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ।'

'অর্থাৎ কাজটা করতে পারবেন?'

'তবে আর বলছি কি!'

যাক বাঁচা গেল। পথে এসেছে বেটা। আলোচনা হলো আরো কিছুক্ষণ। আশ্চর্য, রোজ এণ্ড শাহ্ লিমিটেডের চেয়ে আজগর আলী কমিশন কমই চাইল।

'বাড়ির কাজ তো সামান্য। তাঁর যে আরো কত সম্পত্তি তাতো জানেনই। চেষ্টা করে দেখতে পারি, যদি তিনি সব-গুলোর দায়িত্ব আপনাকে দেন, পারবেন চালাতে?'

'আমার তো এই-ই কাজ।'

কথার স্বরে একটা নির্লিপ্ত ভাব। বুঝলাম এটা তার চাল। ইচ্ছে করেই ভান করছে।

আমিও কথার সুর পাল্টালাম। 'মিস্ শেলী যে রাজী হবেন এমন কথা নেই। তবে আমি চেষ্টা করবো।'

মনে হলো বাধাটা নড়লো না। সোজা পথেই যেতে হবে। বললাম, 'দুজনেই উঁচুতে বসে কথা না বলে, আসুন, নিচে নেমে কথা বলি। কথা হলো, শেলীর সম্পত্তির ভার নেবার জন্যে অন্য সব এজেন্সিও ঝাঁপিয়ে পড়বে। তেমন ব্যাপারটাই আমি আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। এতে আমার কি স্বার্থ?'

ধূসর চোখ জোড়া মেলে আজগর আলী আমাকে দেখলো। মোটা মোটা আঙুলগুলো দিয়ে নাক চুলকালো।

'এতে আপনার কি স্বার্থ? ভুল করছেন, মিঃ রাসেল, আমি আপনার পিছু পিছু ছুটবো না। আপনি তো বললেনই যে আপনি ওভারসিজের একজন চাকুরে।'

রাগে গা রি-রি করে উঠলো। 'এখন অবশ্য ব্যাঙ্কের হয়েই কাজ করছি। কিন্তু তা আর বেশি দিন নয়। যা হোক আপনি হয়তো জানেন না, ব্যাঙ্ক রোজ এণ্ড শাহ্ এর সাথেই কাজ চালিয়ে যেতে উৎসুক। সুতরাং বাস্তবে আসুন, মিঃ আলী। এ শহরে আপনার প্রতিষ্ঠানের যে ধরনের সুনাম

তাতে ব্যাঙ্ক কাজের দায়িত্ব আপনাকে দিতে কিছুতেই রাজী হবে না। কিন্তু কলটা আমি নাড়াতে পারি।...একেবারে অকারণেই কাজটা তুলে দেবো, এমন কথা ভাবছেন কি করে?'

চুপ করে রইলো আজগর আলী। বুঝেছে সে আগেই। এখন আমাকে মোকাবেলার কথা ভাবছে।

'বুঝলাম। আপনার দাবী, মিঃ রাসেল?'

'দশ হাজার টাকা, মিঃ আলী। বিনিময়ে মিস্ শেলীর সই করা চিঠি আপনাকে দেবো, যাতে সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব আপনার থাকবে।'

'মিস্ শেলী চৌধুরীর নিজ হাতে সই দেয়া চিঠি আমাকে দিতে হবে। টাকা আপনি পাবেন।'

'আগামীকাল দুপুরে তিনি ওটা দেবেন।'

'উত্তম। আপনার সঙ্গে কাজ করতে পেরে খুশি হলাম, মিঃ রাসেল।'

'কিন্তু নগদ চাই, মিঃ আলী।'

'নিশ্চয়ই।'

রাস্তায় এসে একটু দাঁড়ালাম। কপালের ঘাম মুছলাম। আলী বেটা বড্ড কঠিন বটে। কিন্তু চালে ভুল হলো না তো? ব্যাঙ্ককে সে জানালে আমি ফেঁসে যাবো। তবে এত কাঁচা সে নয়। আমার সঙ্গে না থাকলে কাজটা যে পাবে না— এটা সে বোঝে নিশ্চয়ই।

ঝুঁকি নিতেই হবে। ভালোয় ভালোয় এটা হলে পনের হাজার টাকা—আমার মুঠোয়। টাকা—এমন মোটা দাগের জন্যে

ঝুঁকি না নেয়াই যে বোকামী।

ব্যাঙ্কে পৌঁছে সোজা চলে এলাম নিজের টেবিলে। সামনে পেপার-ওয়েটে চাপা একটা স্লিপ। এম ডি-র জরুরী তলব। ডাঙায় উঠানো মাছের মতো বুকটা লাফিয়ে উঠলো। মোসলে-উদ্দিন বা আজগর আলী, কেউ এলো না তো?

হঠাৎ করেই যেন ঘামে ভিজে গেলাম। ঘাম ঝরছে সমস্ত লোমকূপ থেকে।

আমাকে ঢুকতে দেখেই রেজা সাহেব মুচকি হাসলেন। বুঝলাম, এখন পর্যন্ত ঠিক আছে।

'এসো, বসো, রাসেল।'

আঃ। কত যেন ভারমুক্ত আমি।

'তোমার, মিস্ শেলী খুব খুশি হে। ফোন করেছিলেন। তোমার কথা বলতে গিয়ে বললেন, এর আগে এমন আর হয়নি।'

'তিনি যেমন, এতটা না ভাবাই ভাল।'

'না-না, তেমন মনে হলো না। তাছাড়া নিজেই তোমার একটা অফিস ঘরের কথা বললেন। মনে হয়, তিনি হয়তো মাঝে মধ্যে এখানে এসে পায়ের ধুলো দেবেন।'

আহা, রেজা সাহেব যেন একেবারে গদগদ।

'ভাল পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই আমি হুকুম দিয়ে দিয়েছি—এতক্ষণে হয়তো তোমার ঘর ঠিক হয়ে গেছে। তিনি একটু উৎসাহিত হোন, তাই চাই।'

আমার জন্যে শেলী এতটা করবে ভাবিনি। বললাম,

,আমিও তাই কামনা করি, স্যার।'

'শেলীর ঘরের পাশেই তোমার ঘর। আর বুঝতেই পারছো —ঘরটা একটু বিশেষ ভাবে সাজানো হয়েছে। আর শোন, মিস্ সাইদাকে এখন থেকে তোমার স্টেনো হিসেবে কাজ করার নির্দেশ আমি দিয়ে দিয়েছি।'

নিজেকে সতর্ক ভাবে গুটিয়ে রাখলাম। সব মিলিয়ে আমার মনের অবস্থাটা আমি বুঝতে দিতে চাই না।

'ঐ তিনটে ঝামেলা কিভাবে কি করলে, বলো শুনি ?'

আমি তৈরি ছিলাম। অবধারিত প্রশ্ন—আসবেই। তাই ব্যাঙ্কে আসার পথে মনে মনে উপযুক্ত উত্তর ঠিক করেই রেখেছি।

'নেকলেসের ব্যাপারটা অনেক করে ছেড়ে দিতে বললাম, রাজী হলেন না। বলেছি, ব্যাঙ্ক এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করবে না। তাঁকে বোঝালাম, কাজটা ট্যাক্স ফাঁকির পর্যায়ে চলে যায় —এ নিয়ে তাকে তারা আদালতেও নিয়ে যেতে পারে। তাতেই তিনি যা ভয় পেয়েছেন। আমি কি খুব বোকামী করেছি, স্যার ?'

'না, না, ভাল করেছ। মেজাজ তাঁর তো বারুদের মতো— এ ভাবে বোঝাতে আমরা বেশ বেগ পেয়েছি। বাকী দুটোর কি করলে—?'

'আমি দুঃখিত, স্যার। আমার পৌঁছার আগেই সে-ব্যাপারে তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। তাঁর মনে একটা ধারণা হয়তো কাজ করেছে যে, তাঁকে সব সময়ই রাশ টেনে ধরে রাখা হচ্ছে। সুতরাং তিনি তাঁর স্বাধীনতাটা কাজে লাগিয়েছেন। সেই দালাল, মোসলেউদ্দিনকে বাড়ি বিক্রির কথা দিয়ে দিয়েছেন।

ভাড়া আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছেন ওরিয়েন্ট সিণ্ডিকেটকে। আজগর আলী তাঁকে বলেছে, তারা বাড়তি ভাড়া আদায় করে দেবে।'

হায় হায় করে উঠলেন রেজা সাহেব। 'বলছো কি হে? আজগর আলী তো নম্বরী জোচ্চোর। ডাকাত!'

'আমিও মিস্ শেলীকে একই কথা বলেছি। কিন্তু তিনি আমার কথায় আমল দিলেন না। তবে আপনি যদি বলেন, চেষ্টা করে দেখবো আবার, আমার সামান্য প্রভাবটুকু কাজে লাগে কিনা।'

আপন চেতনায় ফিরে এলেন এম. ডি মাসুদুল হক রেজা। 'তোমার প্রভাব মিস্ শেলীর ওপর?'

খুব বেশি দেখানো হয়ে যাচ্ছে। খেয়াল রাখা উচিত ছিল, কার সাথে কথা বলছি। ঠেলা সামলাও এখন! 'আপনি কেমন ভাবে নেবেন জানি না, স্যার, তবে আলাপ আলোচনায় যতটুকু বোঝা গেলো, তিনি হয়তো আমার পরামর্শ শুনবেন।'

'তাহলে শোন, আমি ঐ ঠক্‌বাজ লোকটার হাত থেকে নিস্তার পেতে চাই।' কি যেন চিন্তা করলেন এম. ডি। কপালের রেখাগুলো ফুটে উঠলো টান্ টান্ হয়ে। 'থাক, আমিই বরং মিস্ শেলীর সাথে কথা বলি।'

বিপদ! এ যে দেখছি আমারই দফারফা! টেলিফোনের দিকে হাত বাড়িয়েছেন এম. ডি মাসুদুল হক রেজা।

'জাস্ট এ মিনিট, স্যার। আপনি বলতে গেলেই তিনি ভাবতে পারেন যে, তাঁর রাশ টেনে ধরা হচ্ছে।'

'কিন্তু ঐ লোকটা সম্পর্কে তাঁকে সতর্ক করা দরকার।'

এম ডি-র হাত তখনো টেলিফোনে। আমার দিকে তিনি

অপলক চেয়ে আছেন। আমাকে ভীত দেখাচ্ছে না তো ?

'আমি সব শুনে আজগর আলীর সাথে দেখা করেছিলাম। সে কথা জেনে মিস্ শেলী তো আমার ওপর রেগে আগুন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য—আমরা যদি সে-লোক সম্বন্ধে কিছু বলি, তবে ব্যাঙ্কের সঙ্গে তিনি ব্যবসা বন্ধ করে দেবেন।'

টেলিফোনের ওপর থেকে রেজা সাহেবের হাতটা আপনা আপনি সরে গেল। আমার বুকের ধুক-ধুকুনিও কমে এলো। 'ভাড়ার হিসেব আমাকে প্রথমে দেখাতে হবে, এ ব্যবস্থায় যদি তাঁকে রাজী করানো যায়, তবে আজগর আলী বেশি কিছু ক্ষতি করতে পারবে না, স্যার।'

'তুমি কি সে-ভরসা করতে পারো ?'

'পারি, স্যার।'

'না হয় আমিই বরং একবার···'

'প্রথম সুযোগটা আমাকেই নিতে দিন, স্যার।'

'ঠিক আছে, তোমার যোগ্যতা যাচাই করো।' এম. ডি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। 'কালই তাঁর সঙ্গে কথা বলো। তুমি ব্যর্থ হলে আমি বলবো।'

একটু হাসলেন রেজা সাহেব। 'নেকলেসটা নিয়ে সে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল। যা হোক, ব্যাপারটা তুমি মিটিয়েছো, ভালো কাজ করেছ।'

'অনেক ধন্যবাদ, স্যার।'

আমি আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি এম. ডি-র ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

পাঁচ

পরদিন। ব্যাঙ্কে পৌঁছেই আমার নতুন অফিস ঘরে হাজির হলাম। সামনে অনেক কাজ। এ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

এর মধ্যে ভেবে চিন্তে কিছু টাকা বাগানোর পথ বের করেছি। টাকার বাজারে মিস্ শেলী চৌধুরীর নামের যে কি বিস্তর প্রভাব তা বুঝে ফেলেছি। এখন শুধু হাতের তাস ঠিক মতো খেলে যাওয়া।

ওরিয়েন্ট সিণ্ডিকেটের নামে চিঠি তৈরি করে ফেললাম। শেলীকে সই করাবার জন্যে রাখলাম।

আমার একজন পরিচিত মুহুরিকে বলেছিলাম অফিসে আসতে। সে এলো প্রায় সাড়ে দশটায়। বাড়ি বিক্রির কাগজ পত্রও ঠিক করে ফেললাম।

তারপর শেলীর বিভিন্ন বিনিয়োগ সংক্রান্ত ফাইল ও খাতাপত্র দেখলাম। আমি ঠিকই ভেবেছিলাম। সরকারী বণ্ড আর পাকা স্টকে সমস্ত টাকা লগ্নি করা। পাকা কাজ।

আরও কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে বেরিয়ে পড়লাম।

আগ্রাবাদ দিয়ে চলেছি। ইন্‌শিউরেন্স বিল্ডিংটা ছাড়িয়ে আরেকটু সামনে গিয়ে গাড়ি থামালাম। তাকালাম দালানটার দিকে। তিন তালা এ দালানে অগুণতি সব অফিস। হরেক রকম তাদের ব্যবসা। সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় সোজা গিয়ে ঢুকলাম মুন্সী ফজলুর রহমানের অফিসে।

মুন্সী ফজলুর রহমানের সাথে আমার বেশ ক'বছর থেকেই পরিচয়। আমার বয়সী। সদালাপী ও হাসিখুশি। স্টক আর বণ্ডের ব্যবসা গড়ে তুলেছিল তার বাবা। সে এটাকে আরও ফাঁপিয়ে তুলেছে।

'আরে, রাসেল! তুমি এখানে? বসো, বসো। তা হঠাৎ কি মনে করে?'

বসলাম। নিজেকে গুছিয়ে তৈরি করে নিলাম। এমন একটা কাজের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এসেছে, যা শুনলে তুমি চমকে উঠতে পারো।'

'বলে ফেল তাহলে।'

'মিস্‌ শেলীর অ্যাকাউন্টের সামান্য কিছুটা পেতে কি তোমার ইচ্ছে হয়?'

'পেলে নিশ্চয়ই খুশি হতাম।'

'দাম বাড়ছে এমন কিছুর খবর আছে?'

'দাম তো অনেক কিছুরই বাড়ছে। তবে কোনটার ব্যাপারেই তেমন নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যায় না।'

'ধরো, দশ লাখ টাকা। বাজারে ছাড়লে কি দাম বাড়তে

সাহায্য করবে না ?'

গায়ে বাতাস লাগলো মুন্সীর। 'জায়গা মতো লাগাতে পারলে, বাড়বে নিশ্চয়ই।'

'আমি তাই চাই। এমন একটা স্টক ধরতে হবে, যার দাম ইতিমধ্যেই বাড়তে শুরু করেছে। সে-স্টকে দশ লাখ টাকা রাখলে, সবাই ভাববে, এর দাম হু হু করে বাড়বে। তেমন কিছু আছে ?'

'আছে। নুন। দাম বাড়ছে। কিন্তু রাসেল, ঝুঁকিও আছে।'

'ঝুঁকি ? এতেই লাগাও টাকাটা। লোকসান গেলেও হাজারের বেশি তো যাবে না ? তার সম্ভাবনাই বা কতটুকু ?'

'পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। আচ্ছা রাসেল, এভাবে টাকা খাটাবার অধিকার ব্যাঙ্ক তোমাকে দিয়েছে কি ?'

'ব্যাঙ্কের এ ক্ষেত্রে কিছু করার নেই। মিস্ শেলীই আমাকে এ কাজ করার অধিকার দিয়েছেন। তাঁকে বলেছি, একজন দক্ষ দালাল খুঁজে দেবো। সময়ে হাজার টাকা পর্যন্ত লোকসান যাবার ব্যাপারেও তাকে রাজী করিয়েছি।'

মুন্সী, ঝানু স্টক দালাল, কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। 'ঐ পরিমাণ টাকা খাটাবার লিখিত অনুমতি পেলেই কাজে হাত দিতে পারি।'

'তা তুমি পাবে।'

কাগজ নিলাম ওর কাছ থেকে। যেমন বললো, লিখলাম।

'এখানে তোমার সই থাকবে,' হাত দিয়ে দেখাল মুন্সী।

'সই, হ্যাঁ—'কলমটা টেবিলের ওপর রেখে সোজা চাইলাম

ওর দিকে। 'তার আগে কথাটা ঠিক করে নিতে হবে।'

'তার মানে?'

'মানে খুব সোজা। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় অ্যাকাউন্টটা তোমার কাছে আসছে—নিজেই চিন্তা করো। যা কখনো কল্পনাও করতে পারনি, সে-সুযোগ তুমি পাচ্ছ। তাছাড়া শেলীর দালাল হিসেবে অন্যদের দৃষ্টিও তোমার ওপর পড়বে। পাবে আরো সুযোগ। এতকিছুর পেছনে এই যে আমি, আমার জন্যে থাকছেটা কি?'

'এ আবার কেমন কথা? ব্যাঙ্কের লোক হয়ে তুমি তা বলতে পারো না, রাসেল।'

'কি বললে? পারি না? আচ্ছা, উঠি তাহলে। শেখর দেওয়ানের সাথে কথা বলে দেখি। ব্যাঙ্কে কাজ করি, এ অজুহাতে এতবড় একটা সুযোগ সে হাতছাড়া হয়তো করবে না।'

'দাঁড়াও'—চকিতে আমার দিকে তাকালো। বললো, 'ব্যাঙ্ক কি···'

'গুলি মার ব্যাঙ্কের কথা। এখন কথা হচ্ছে তোমার আমার মধ্যে। পছন্দ না হয়, অন্যদিকে যাবো।'

অলস ভঙ্গিতে চেয়ারে গা এলিয়ে মুন্সী বললো, 'তোমার কথা মেনে নিলাম। তবে আশা করবো যা করছো, সব বুঝে শুনেই করছো।'

'তা তো বটেই। আমাকে অর্ধেক দিতে হবে।'

ভীষণ চমক খেলো মুন্সী। 'বলছো কি তুমি?'

'শেলীর সব রকম লেন-দেনে অর্ধেক বখ্‌রা। রাজী হলে বলো। না হলে পথ দেখবো।'

'একেবারে ডাকাত তুমি। কি আর করা। তা নুনের ব্যাপারে তুমি কি সত্যিই আগ্রহী?'

'অবশ্যই।' চিঠিটা সই করে ওর দিকে এগিয়ে দিলাম, 'দশ লাখ টাকার স্টক বুক করে ফেল। দাম তিন চার পয়েন্ট বাড়লেই ছেড়ে দেবে। আজই শুরু হোক।'

'দাম বাড়তে থাকলে কি ধরে রাখবো?'

'না। সম্ভব হলে আজই বিক্রি করে দেবে। শেলীকে, লোভী মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি লাভ দেখাতে পারলে খুশি হবে। দেখবে, ব্যবসার অনেক দায়িত্ব আমাদের এসে যাবে।'

মুন্সীর সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আরও কিছু শলা পরামর্শ করে উঠে পড়লাম। সোজা লালদিঘী। পুবালী ব্যাঙ্কে। মোসলে-উদ্দিনের কাছ থেকে পাওয়া টাকাটা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুললাম। তারপর ফিরলাম নিজের ব্যাঙ্কে।

আমার গায়ে তখন অন্য হাওয়া। গাড়ি। আলাদা অফিস। স্টেনো। ব্যাঙ্কে টাকা। আরও অনেক টাকা—সামনে টাকা আসার সহজ মসৃণ পথ। বেশ ঘটা করে লাঞ্চ খেলে কেমন হয়? টেলিফোন বেজে উঠলো। বিরক্তি ভরে রিসিভার তুললাম।

'মিঃ রাসেল? পারভীন বলছি।'

'মিস পারভীন? আপনি···ও হ্যাঁ হ্যাঁ, মিস শেলীর ডান হাত। তা বলুন, মিস পারভীন।'

'মিস শেলী এখুনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

আঙ্গুল নাড়লেই আমি লাফিয়ে যাবো, শেলীর তেমন আশা করা বৃথা। তাছাড়া এখন ক্ষিদেয় পেট···

'মিস পারভীন, আমি তুটোর দিকে আসছি। বেশ কিছু কাগজ সই করাতে হবে।'

'তিনি এক্ষুণি চাইছেন আপনাকে।'

'আমার হয়ে তাঁকে একটু বলে দিন, হু'টো পর্যন্ত কাজে আটকা আছি।'

পারভীন কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'মিঃ আলীর ব্যাপারে হয়তো কিছু করতে হবে।'

মাথাটা চক্কর খেয়ে গেল। 'আলী, মানে, আজগর আলী? কি হয়েছে?'

'বলতে পারবো না। তবে সে এইমাত্র চলে যেতেই মিস শেলী আপনাকে ডাকতে বললেন। ভীষণ চটে গেছেন। এত রাগ আগে কখনো দেখিনি।'

শয়তানের বাচ্চা, আজগর আলী। আমার সঙ্গে কি শেষ পর্যন্ত বেঈমানি করলো? একটা আতঙ্ক যেন হঠাৎ করে আমার মুখের কথা সব কেড়ে নিলো। বেটা যে রেজা সাহেবের কাজে আসার কথা ভাববে না, সোজা চলে যাবে শেলীর কাছে, তা চিন্তায় আসেনি। আমার স্বপ্ন, টাকার রাস্তার মাঝামাঝি যখন এসেছি, ঠিক তখনই—যেখানে আমার কপাল পুড়বে, তার কাছেই যাবে।

'আপনি কথা বলছেন না কেন, মিঃ রাসেল?'

'অ্যা...,' নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলাম।

'শুনুন, মিঃ রাসেল, আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। মিস শেলী রেগে গেলে, খেয়াল রাখবেন, তার কাছে ক্ষমা চাইবেন না। কোনরকম অজুহাত দেখাবেন না। সে চিৎকার করলে আপনিও উল্টো চিৎকার করবেন। ধমক দিলে ভড়কে যাবেন না। আপনি আরও জোর ধমক লাগাবেন। আমি যা বললাম বুঝলেন? মিস শেলীর চেয়ে বেশি, উঁচু গলার জোর যে দেখাতে পারবে, সেই তাকে কাত করতে পারবে। এর জন্যে চাই আপনার মনের জোর। শুধু রাগ আর চিৎকারই করতে পারে সে, মনে একটুও সাহস নেই। আমি তাকে ভাল করেই চিনি। আপনার যেহেতু হারাবার কিছু নেই, সুতরাং...কি বলছি, শুনছেন?'

'ফাঁদে ফেলছেন না তো, মিস পারভীন?'

'না! তবে এতে যে ভাল কিছু ফল হবে তা বলছি না, এ শুধু মাত্র আশা। আর মনে রাখবেন, যাই করুন না কেন, কোন অজুহাত দেখাবেন না। তাহলে আসছেন?'

'আসছি। মিস পারভীন, না চাইতেও আপনি কেন যে এ পরামর্শগুলো দিলেন,...এর জন্যে আমি...'

বুঝতে পারলাম পারভীন ফোন ছেড়ে দিয়েছে। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে উঠে পড়লাম।

নিজেকে আর উল্টো বুঝিয়ে কি লাভ? আমি যতই চিৎকার করার সাহস দেখাই না কেন, শেলী তার শেষ কথা আমায় বলে দিতে পারে।

তারপর গাড়ি, আলাদা অফিস ঘর, সুন্দরী স্টেনো, আজগর

আলীর দশ হাজার, মুন্সীর অর্ধেক বখ্‌রা, এবং আমার চাকরী—শুধু ফুঁ মাত্র। সব উড়ে যাবে।

শরীরটা যেন মনের আর ধকল সইতে পারছে না। দুর্বল বোধ হচ্ছে। সমস্ত স্নায়ুগুলো থেমে যেতে চাইছে। নিজের ডেকে আনা মরণ বুঝি পিছু নিয়েছে। আর নিস্তার নেই। গাড়ির হুইলে বসে অবাক হলাম, আমার হাত আর পায়ের শক্তি লোপ পেতে বসেছে।

শেলীর বাড়ি যাবার পথে একটা বারে ঢুকলাম। এখানে আমি আগেও এসেছি। কিন্তু অসময়ে আমাকে দেখে ওরা একটু অবাক হলো। ওদের সপ্রশ্ন দৃষ্টির মুখে স্কচের অর্ডার দিলাম। এক। দুই। তিন পেগ। শরীর ও মন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটালাম। লোহার গেটটার সামনে যখন পৌঁছেছি, তখনও আমি মনে মনে আজগর আলীর মুণ্ডপাত করে চলেছি।

এগিয়ে এলো তারা মিয়া। নির্বিকার ভঙ্গিতে আমার হাত থেকে ব্রিফকেসটা নিলো। আমাকে কেন ডাকা হয়েছে তারা মিয়া নিশ্চয় জানে। আমি যখন ফিরে যাবো, হয়তো তখনো এসে সে এভাবে দাঁড়াবে। তখন যদি সে কোন ব্যঙ্গ করে বা তার চেহারায় কোন বিদ্রূপাত্মক অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে, মনে মনে শপথ নিলাম, এক ঘুষিতে তার চেহারা আমি পাল্টে দেবো।

'আপনার জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।' চওড়া বারান্দার শেষে চত্বরের দিকে তারা মিয়া হাত তুলে দেখালো।

লম্বা দম নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালাম।

হাল্কা নীল রং এর শাড়ী পরে ইজি চেয়ারে শুয়ে আছে শেলী চৌধুরী। নজর আকাশের দিকে। আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরালো। লাবণ্যহীন ফ্যাকাশে মুখটা রাগে আরো বিদঘুটে হয়ে আছে। আরেকটা চেয়ারের পাশে ব্রীফকেসটা রেখে তারা মিয়া চলে গেল। আমি বসলাম।

'এই যে চতুর, মিঃ রাসেল।' এক ঝটকায় শোয়া থেকে উঠে বসলো। জ্বলন্ত চোখ। 'তারপর, আপনার কি কিছু বলার আছে?'

'কি উত্তর আশা করছেন?'

'কোন ভান করবেন না। মিথ্যেও যেন না বলেন।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট, না অন্য কিছু?'

ছোট্ট শিশুর মতো শেলী রাগে থরথর কাঁপছে। হাড্ডিসার আঙ্গুলগুলো বারেবারে খুলছে আর মুঠো করছে। আমাকে ছিঁড়ে ফেলার একটা প্রচণ্ড আক্রোশ ওর চোখে মুখে। 'আজগর আলীকে চেনেন?'

'চিনবো না কেন? তার কথাই আপনার সাথে আলাপ করবো ভাবছিলাম, বেশি বাড়ি ভাড়া আদায়ের সেই উপযুক্ত লোক।'

'ওসব আপনাকে ভাবতে হবে না।' ছোবল তুললো যেন। 'দশ হাজার টাকা নিয়ে কাজটা তাকে দিয়েছেন কি না, সে কথা বলুন।'

'না দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দিয়েছি। কারণ, আলীর মতো জোচ্চোরের সঙ্গে কারবারের ওটাই রীতি। কাজ পাবার প্রস্তাব সে পেয়েছে, সুতরাং কিছু টাকা দিতে সে ইচ্ছুক। মিস শেলী, শুধু আজগর আলীর ব্যাপারেই আপনি উত্তেজিত, না অন্য কিছু ?'

চেয়ার থেকে ছিটকে নেমে গেলো শেলী। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। এগিয়ে এলো শেলী। দেখলাম, ওর মাথাটা আমার কাঁধের বেশ নিচে।

'আর সে-টাকাটা ভালো মানুষের মতো চুপচাপ মেরে দিতে চাও ?' একটু চুপ করে থেকে মাথা নেড়ে আবার বললো, 'কি হলো, জবাব দাও !'

আমার জন্যে এই একটা সুযোগ। যদি বলি টাকাটা ওর জন্যই নেওয়া, তবে নিশ্চয় লোভ সামলাতে পারবে না। লোভী মেয়েটা এখুনি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু টাকা দিয়ে দেবো ! আবদার ! স্কচ এখনো আমার চেতনায় ভর করে আছে। আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি।

মুখে একটু হাসি হাসি ভাব নিয়ে বললাম, 'আপনি কি মনে করছেন ও টাকা বিলিয়ে দেবো ?'

'তাহলে ঘুষ নেওয়া ?'

'ঘুষ শব্দটা একটু অন্য রকম শোনায়, মিস শেলী। এই কিছু খরচ আদায় আর কি।'

'খরচ আদায়—তাই ? কেন ? নম্বরী জোচ্চোর কোথাকার !' রাগে তেড়ে উঠলো। 'নিজের পকেট ভরাবার সাহস কোথায়

পেলে তুমি ?'

ঝট করে আমার রাগও সপ্তমে চড়ে গেলো। এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। ডান হাতের মুঠি বাম হাতের তালুতে ঘষতে ঘষতে বললাম, 'আমাকে··· মানে, আমাকে জোচ্চোর বললেন ?'

'বলেছি, আবারও বলছি। শুধু তাই নও, তুমি ডাকাত !' গলার স্বর তার আরও বেড়েই চললো। 'তোমার ঐ চটকদার পোশাক দেখে আর চটপট সমস্যার সমাধান শুনেই আমার বুঝ হয়েছে, তুমি একটা আস্ত জোচ্চোর।'

'আপনি নিজেকে জাহির করতে, মিস শেলী, নাকি কান্নার কোন প্রয়োজন আছে কি ?'

মুহূর্তে চুপসে গেলো শেলী চৌধুরী। মুখের দাগগুলো আরো ফুটে উঠলো। এক পা পিছিয়ে গিয়ে ফিস ফিস করে বললো, 'কি বললে আমাকে ?'

আমিও গলা নামালাম। 'বলেছি, টাইফয়েডের রুগীর মত কান্নাকাটি বন্ধ করুন।'

'এর জন্যে তোমাকেও কাঁদতে হবে। ব্যাঙ্ক থেকে তাড়িয়ে শহর ছাড়া করবো আমি তোমাকে। তুমি চেনো না আমাকে— বেঁচে থাকতে আর চাকরী পেতে হবে না তোমার।'

'যথেষ্ট হয়েছে, আর নাটক করতে হবে না। আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ? ভুলে যাবেন না, আমি আবদুর রশিদের মত মেরুদণ্ডহীন নই।' এক পা ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে সামনে ঝুঁকে বললাম, 'কি, তাই ভাবেন নাকি ? শুনুন, আপনাকে আমি থোড়াই কেয়ার করি।'

মনে হলো, ও যেন কিছুটা থমকে গেলো।

'ঠিক আছে, দেখা যাক। সরে দাঁড়াও। মিঃ রেজাকে জিজ্ঞেস করি, তার কি বলার আছে?'

আমি নড়ার আগেই আমাকে পাশ কেটে ঝড়ের বেগে ও লাউঞ্জে চলে গেলো।

তাহলে, রেজা সাহেবের সাথে কথা বলা মানে—তরী আমার ডুবলো। আর কি রইল আমার? কপাল নির্ঘাৎ পুড়লো। ব্যর্থতার জ্বালায় নিজেই যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলাম। ছুটে গেলাম ওর পেছনে। সবই যখন যেতে বসেছে, তখন একবার শেষ চেষ্টা করি না কেন? সব হারিয়ে ডুবছি ভয় করে আর কি হবে?

টেলিফোনটা তুলতে যাবে, সবেগে গিয়ে ওর হাতটা চেপে ধরলাম। 'থামুন।'

ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়ালো শেলী। আমি কিছু অনুমান করার আগেই ওর বাঁ হাতটা ঝেড়ে বসিয়ে দিলো আমার গালে। ওর নখ লেগে ছড়ে গেল আমার গালের কিছুটা চামড়া।

আমি ঘটনার আকস্মিকতায় সেই মুহূর্তে চোখ বুঁজে ফেলে-ছিলাম। মাথাটা ঝিম্ খেয়ে গেলো। বোধ হয় কয়েক সেকেণ্ড, কিন্তু তারপর যে কি হলো মনে করতে পারছিলাম না। সম্বিৎ ফিরতেই বুঝলাম, আমি ওর কাঁধ ধরে সজোরে ঝাঁকাচ্ছি। ওর মাথাটা শুধু সামনে পেছনে আসছে, যাচ্ছে। সমস্ত শরীরের শক্তি যেন হাত দু'টোতে এসে ওকে ওপরে তুলে আছড়ে ফেলতে চাইছিল। চোখের দৃষ্টিতে তখন খুনের মাতন।

ভয়ে চিৎকারও করতে পারলো না শেলী। মুখটা হাঁ করে থেমে গেছে। চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে।

চেপে বসিয়ে দিলাম চেয়ারে। কাঁধ তখনো ছাড়িনি। ওর বিবর্ণ মুখের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বললাম, 'আমার কথা শুনুন। আপনার ঐ নেকলেস কেনার খরচ, বাড়িভাড়া বাড়ানো আর বাড়ি বিক্রির জন্যে দিনের পর দিন আবদুর রশিদকে বিরক্ত করে মেরেছেন। কিন্তু সে কিছুই করতে পারেনি। অথচ আমি একদিনে সব সমস্যার সুরাহা করে দিয়েছি। ভাল করে শুনুন,—মাত্র একদিনে। তার অর্থ হচ্ছে আপনি এখন এ ব্যবস্থায় প্রচুর টাকা পেতে চলেছেন। এবং তা কেবল আমারই জন্যে।' আবার ওকে জোরে নাড়া দিলাম। 'কী হলো, কানে যাচ্ছে? বলছি যে, শুধু আমারই জন্যে। আমিই করেছি কাজগুলো। কেন করেছি? সবটা আমার পাতে নেবো বলে? আপনাকে আমার বিছানায় নিতে চাই বলে? জাহান্নামে যাবার জন্যে? না,—আপনার লাভ হবে বলেই কাজগুলো করেছি আমি। হ্যাঁ, আপনার জন্যে মোটা টাকার ব্যবস্থা করেছি। আর যে সব রক্তচোষাদের কাছ থেকে আপনি টাকা পেতে যাচ্ছেন, তাদের কাছ থেকে আমি নিজের জন্যে সামান্য আদায় করেছি মাত্র। তাতেই আপনার গায়ে জ্বালা? আপনার কিছুতো চুরি করিনি? আপনার কিছু লোকসান হচ্ছে?'

ছেড়ে দিলাম ওকে। আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিল।

'ঠিক আছে, বলুন মিঃ রেজাকে। আমি না হয় চাকরী হারাবো। কিন্তু আপনি—কী হারাবেন ভেবেছেন? আমাকে বাদ দিয়ে ট্যাক্স ফাঁকির চাকা ঘুরবে না। যান না, চেষ্টা করে দেখুন, খুব শীঘ্রিই জেলখানায় পৌঁছে যাবেন। তখন ত্রিশ হাজার টাকার স্বপ্ন উবে যাবে। করুন, হিম্মত থাকে তো ফোন করুন। ভাবছেন আমি কারো তোয়াক্কা করি?'

একটা তাচ্ছিল্য ভাব ছুঁড়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চত্বরে ফিরে এলাম। চেয়ারে বসে দম নিলাম। এ যেন যুদ্ধ করে ফেরা।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো শেলী। আমার চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ালো। ওর ওই বিশ্রী জীর্ণ চেহারায় একটা ব্যথাতুর ছাপ ফুটে আছে।

'মিঃ রাসেল, আপনি আমাকে আঘাত দিলেন', ওর গলায় অভিযোগের সুর, 'শেষ পর্যন্ত আমাকে কাঁদালেন।'

'আর আপনি আমাকে কি করেছেন?' রুমালটা আবার নাকের পাশে চেপে ধরলাম। ছড়ে যাওয়া জায়গা থেকে অল্প রক্ত পড়ছে। 'আপনাকে যে ওপরে তুলে আছড়ে দিইনি, সেটাই আপনার সৌভাগ্য।'

পাশের চেয়ারটায় বসলো শেলী। 'এরপর এক কাপ কফি হলে শরীরটা চাঙ্গা হতো নিশ্চয়। আপনি কি বলেন, মিঃ রাসেল?'

'উত্তম প্রস্তাব।'

'তাহলে আপনাকে যে একটু কষ্ট করতে হবে।'

উঠে এসে লাউঞ্জে বেল বাজালাম।

আমি তখন তুঙ্গে। লড়াই করেছি, জিতেছি। শেলী নিজেও একথা জানে। আমি এখন সাফল্যের দরজায়—আমাকে আর কিছুই থামাতে পারবে না। আমার জন্যে এটা একটা বিরাট জয়।

তারা মিয়া এসে সামনে দাঁড়ালো। তার দিকে তাকিয়ে সহজেই বোঝা যায়, সে আমাকে ঘুঁষা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবার হুকুমের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু আমার আঙুল ঘণ্টার বোতামে দেখে পাথর বনে গেল।

'কফি।'

আমার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে তারা মিয়া বাইরে চত্বরের দিকে তাকালো। সেখানে শেলী তখন আপন মনে কাঁধের শাড়ী ঠিক করছে।

'আচ্ছা, স্যার।' ওর মুখের কোন পরিবর্তন হলো না।

ভালো করে আবার তারা মিয়া আমাকে দেখলো। ওর দৃষ্টিতে প্রচণ্ড ঘৃণা।

তারা মিয়া চলে যেতেই মুন্সীকে ফোন করলাম।

'খুনের কোন খবর আছে নাকি?'

'তুমি যাওয়ার সাথে সাথেই একটা স্টক ধরেছিলাম। বাজারে ভীষণ প্রতিক্রিয়া হলো। এইমাত্র স্টক আবার বিক্রি করে দিলাম। মিস শেলীর পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। আর তোমার ন'শো টাকা বখ্‌রা জমা রইল। ঠিক আছে?'

বাইরের দিকে চোখ গেলো। শেলী তখন ওর ডান কাঁধটা বাঁ হাত দিয়ে টিপে টিপে ব্যথাটা পরখ করছে। শরীরে তার কিচ্ছু নেই। বুকটাও অপরিণত। শুকনো, অসুন্দর।

'চমৎকার!' মুন্সীকে বললাম। 'মিস শেলীর চেকটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।'

'কিন্তু রাসেল...'

'তুমি আমার হয়ে কাজ করছো, তার নয়। বুঝলে?'

'তাই হবে। তবে, এটা ঠিক নয়, রাসেল।'

রিসিভার রেখে দিলাম। পঁয়ত্রিশ হাজারের মধ্যে মিস শেলী পাবে কুড়ি হাজার। বাকীটা থাপ্পর মারার খেসারত, আমার অ্যাকাউন্টে থেকে যাবে।

আমি আবার চত্বরে ফিরে এলাম। আমার আসা টের পেয়েই শেলী তাড়াতাড়ি বুকের আঁচল ঠিক করে নিলো। তারপর ওর কাছ থেকে যা কখনো আশা করিনি তাই সে করলো। বিশ্বাস করুন, আমি সহজে চমকাই না, অথচ সেই আমিও চমকে উঠলাম।

আমার দিকে লাজুক চোখে চেয়ে মুচকি হাসলো শেলী। বললো, 'ওভাবে তাকানো, মানে অমন করে কি দেখছিলেন?'

কি দেখছিলাম! ঐ কুৎসিত মেয়েটা কি ভাবছে? ওর আঁচলহীন বুকটা আমি দেখছিলাম? কোনরকমে মুখে হাসি টানলাম।

'লজ্জায় ফেলছেন, মিস শেলী। আমার মাথায় অন্য চিন্তা। এইতো, এইমাত্র আপনাকে বিশ হাজার টাকা পাইয়ে দেবার

ব্যবস্থা করলাম।'

লজ্জা লজ্জা ভাবটা তৎক্ষণাত কেটে গেলো। চোখ দু'টো বড় করে আমার দিকে তাকালো।

'আপনার হয়ে আমি আড়াই লাখ টাকা খাটিয়েছি। দালাল জানালো, তা থেকে বিশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে।'

'আপনি আমার অনুমতি ছাড়াই···'

'আপনার টাকা ব্যবহার করিনি। শুধু নামটা, বলতে পারেন, আপনার সুনাম বন্ধক রেখেছি।'

'এমন তো শুনিনি কখনো।' চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলো। আবার বললো, 'তবে ভাববেন না যেন, স্টকের দাম পড়ে গেলে সে-দায় আমি ঘাড়ে নিতাম।'

আমি হাসলাম। 'কোন স্টকের ওপর আড়াই লাখ রাখলে সে-স্টকের দাম কখনো পড়তে পারে না।'

'কিন্তু আমাকে একবার জিজ্ঞেসও করলেন না?' চোখের ধারালো দৃষ্টিতে আমাকে আবার দেখলো। বললো, 'কত লাভ বললেন যেন?'

'বিশ হাজার।'

ওর চোখে-মুখে এবার একটা খুশির ঝিলিক খেলে গেল। 'মিঃ রাসেল, সত্যিই আপনি দেখছি কাজের লোক।'

'একজন জোচ্চোর ডাকাত হওয়া সত্ত্বেও।'

'তখন খুব রেগে গিয়েছিলাম।' শেলী হাসলো।

'সুন্দর কৈফিয়ত বটে।' সোজাসুজি ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, 'এখনও কি সে রকমই ভাবছেন?'

না। আমি ক্ষমা চাইছি।' নিজের কাঁধ ছুটো নেড়ে আবার বললো, 'আপনারও ক্ষমা চাওয়া উচিত, আমাকে আহত করেছেন।'

'তা হবে না।'

একটু শব্দ হতেই ফিরে তাকালাম। দেখলাম, তারা মিয়া ট্রেতে ছুধ, চিনি, গরম পানির পট, কাপ ও কফির সুদৃশ্য শিশি সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। আমাদের সামনের টেবিলে ট্রে-সমেত ওগুলো রাখলো।

সে চলে যাচ্ছিল। বললাম, 'এক মিনিট, একটু দেখে নেই।' হাত বাড়িয়ে সব কিছু ঠিক আছে কিনা দেখে নিলাম। তারপর মাথা নেড়ে বললাম, 'ঠিক আছে, তুমি কেটে পড়ো।'

তারা মিয়া নীরবে চলে গেল।

শেলী হেসে বললো, 'ওকে এভাবে না বললেই কিন্তু পারতেন।'

'নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার এটাই নিয়ম। চুলোয় যাক তারা মিয়া। ব্যবসার আলোচনা করা যাক। আজগর আলীর সঙ্গে কি ব্যবস্থা করলেন?'

'কিছুই হয়নি। ওর কথা শুনে এতো রেগে গিয়েছিলাম যে, কিছুই শোনা হয়নি। পরে আসতে বলেছি।'

'ওকে আমিই দেখবো। আলী কাজের লোক, বাড়তি ভাড়া সে আদায় করতে পারবে। তবে তাকে বাগে রাখতে আমার দরকার হবে।'

'মিঃ রাসেল, আপনি আছেন বলে আমি খুব খুশি। আমার

৫—

পাশে আছেন তো ?'

'এর মধ্যে প্রমাণ নিশ্চয় পেয়েছেন। আপনার পাশেও যেমন আছি, আমি আমার নিজের পাশেও আছি। অর্থাৎ আমরা দু'জন একই দিকে আছি। ভালো কথা, মিস শেলী, বেশ কতদিন ধরে ব্যাঙ্ক আপনার বাড়তি টাকাটা খাটাচ্ছে না। আমি বলছি, আমাকে আড়াই লাখ টাকা ফাট্‌কায় লাগাবার অনুমতি দিন। ধরুন, কোন মাসে যদি বিশ হাজারের বেশি লোকসান দেই, তাহলে টাকাটা ফেরত নিয়ে নেবেন। আপনাকে অবশ্য পাক্ষিক হিসেব দেবো। সে সাথে দেবো প্রতিমাসে কম পক্ষে পাঁচ হাজার টাকা ট্যাক্স-মুক্ত লাভ।'

'বিশ হাজার টাকা আমি পানিতে ফেলতে রাজী নই।'

'এই মাত্র আমি আপনাকে বিশ হাজার পাইয়ে দিলাম। আসলে ফাট্‌কায় ধরার টাকাটা আমিই এনে দিয়েছি। আর ট্যাক্স-মুক্ত টাকা যদি আপনি না চান তাহলে এ নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কোন দরকারই নেই।'

কিছুটা দ্বিধা তখনো ওর মনে। বললো, 'ঠিক আছে। তবে একটা শর্ত, হিসেব আমি সাপ্তাহিক চাই।'

'কোন অসুবিধে নেই, সাপ্তাহিকই পাবেন।'

'ট্যাক্স-মুক্ত পাঁচ হাজার সত্যিই লাভ পাবেন ?'

'নিশ্চয়ই পাবো।'

'টাকা আপনি পাবেন, মিঃ রাসেল। তবে মনে হয়, এর থেকে নিজের জন্যেও কিছু হাত করবেন।'

আমি হাসলাম। 'সে আর বলতে, দালালের সাথে ব্যবস্থা

করাই আছে। অবশ্য আপনার এক পয়সাও যাবে না।'

উঠে দাঁড়ালাম। 'চলি, মিস শেলী। অনেক কাজ, তাড়াতাড়ি সেগুলো শেষ করে ফেলতে চাই।'

'আসুন। তবে আজ আমার এখানে আপনার ডিনারের নিমন্ত্রণ রইল। সন্ধ্যের মধ্যে চলে এলে খুশি হবো।' ওর চোখে মুগ্ধ সপ্রশংস দৃষ্টি।

'দুঃখিত, মিস শেলী। আজ সন্ধ্যের পর কোরিয়ার সাংস্কৃতিক দলের অনুষ্ঠান দেখতে যাবো।'

'ওহ্, কাগজে পড়েছি। খুব সুন্দর ওদের অনুষ্ঠান। আমার জীবনে আর ওসব দেখা হলো না। আমাকে,—আমাকে নিয়ে যাবেন?' অবোধ বালিকার আবদারের মতো শোনালো ওর গলার স্বর।

জনাব কমিশনার সাহেব, বিশ্বাস করবেন না, আমি ওর আবদার শুনে থমকে গেলাম। এ অনুনয় ফিরিয়ে দেবো? সাত কোটি টাকার উচ্চাসন থেকে নেমে, সমাজের গণ্যমান্যা, মিস শেলী চৌধুরী শুধু একটা কথার অপেক্ষায় আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আমি হ্যাঁ করলে যেন হাতে স্বর্গ পায়। কিন্তু ওকে সঙ্গে নেবার কোন ইচ্ছেই আমার জাগছে না।

'অবশ্য আপনার যদি কোন অসুবিধে না থাকে। আপনার সঙ্গে অন্য কারো যাবার কথাও থাকতে পারে।' স্পষ্ট দেখতে পেলাম, সে আবার তার নিজের খোলসে ঢুকে যাচ্ছে।

কিন্তু ওকে নিরাশ করাটা কি আমার ঠিক হচ্ছে? আমার জন্যে এটা একটা সুযোগও বটে। ওকে ফিরিয়ে দিয়ে এ

সুযোগের অবহেলা করা ঠিক হবে না। তবু নিজের আগ্রহকে রাশ টেনে বললাম, 'আপনি কি সত্যি যেতে চান?'

'নিশ্চয়ই।' দাগে ভর্তি মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'ঠিক আছে। আপনি তৈরি থাকবেন। আমি ঠিক দু'টায় আসবো। চলি তাহলে।' চলে আসার জন্যে পা বাড়িয়ে আবার ফিরে তাকালাম ওর দিকে। 'আপনার গাড়িটা আরো কয়েকদিন রাখতে পারি?'

'আলবৎ পারেন।' ওর আনন্দের নমুনা দেখে অবাক হলাম। একটা শিশুর মতো আনন্দে টগ্‌বগ্‌ করছে। বললো, 'যতদিন খুশি রেখে দিন।'

আমি একটু হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে পা বাড়ালাম।

টিলা থেকে ধীরে ধীরে নিচে নামছি, আর মনে মনে দু'দিনের হিসেব মিলাচ্ছি। প্রায় ছাব্বিশ হাজার হাতে এলো। মুন্সী ফজলুর রহমানের কাছ থেকে আধা বখরা, মাসে অন্ততঃ হাজার দু'য়েক আসবে। টাকা, টাকা এবার আমার আসবে। আসছে। পুরো ব্যাপারটা ঠিক মত চালাতে পারলে আর ভাবনা নেই—টাকাই আমি চাই।

ব্যাঙ্কের দিকে গাড়ি ছুটালাম। অনুষ্ঠানের দু'টো টিকেট নিতে হবে।

ছয়

আমরা গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখনও অনুষ্ঠান শুরু হতে মিনিট দশেক বাকী। স্টেডিয়ামের গেট লোকে লোকারণ্য। কোরিয়া সাংস্কৃতিক দলের অনুষ্ঠান দেখার জন্যে যেন শহরের সব লোক ভেঙে পড়েছে। বেশি দামের টিকেট বলেই আমাদের প্রবেশ পথে ভিড় ছিল না। স্টেডিয়ামের ভেতরে ঢুকে আমরা সামনের সারির নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলাম।

বেশ সেজেছে মিস শেলী। সুন্দর ছাপানো সিল্কের শাড়ী। আঁচল দিয়ে গা ঢেকে রেখেছে, কাঁধের হাড়গুলো যেন না দেখা যায়। গলায়, কানে ও হাতে হীরে খচিত অলংকার। হীরের জ্বলজ্বলে প্রভা চারদিকে ছিটিয়ে পড়ছে। আর সে ছটায় আমি বুঝে ফেলেছি যে, তাকে নিয়ে আসাটা একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিরাট মার্সিডিজ টু টুয়েন্টি যখন এসে স্টেডিয়ামের গেটে থেমেছে, তখনই দেখেছি উদ্যোক্তাদের কয়েকজনকে সসম্ভ্রমে

আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে। আন্তরিকতার সাথে অভ্যর্থনা জানিয়ে তারা প্রবেশ পথ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।

সবার মনোযোগ আমাদের ওপর। আমার খুব মজা লাগছে। শেলী মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছে আর মিটি মিটি হাসছে। অন্যদের দৃষ্টির প্রতি ওর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। জীবনের এই প্রথম বাড়ি থেকে এ ধরনের অনুষ্ঠানে বেরিয়ে আসার আগ্রহ —শুধুই কি আমার সঙ্গ পাবার ইচ্ছে? আর আমার সঙ্গই কি এখন ওকে এত উচ্ছ্বসিত করে তুলছে?

'নিশ্চয়ই এটা একটা রেকর্ড, মিস শেলী—এই অনুষ্ঠান দেখতে আসা।' ছাই রঙের স্যুট পরা এক ভদ্রলোক শেলীকে অভিবাদন জানিয়ে মাপা হাসি হাসলো।

হাসলো শেলীও। মনে হলো লোকটাকে দেখে খুশি হয়েছে।

'মিঃ রাসেল নিয়ে এলেন। যাই বলুন, বাইরের জগতটা আমার দেখা দরকার।' আমার দিকে তাকিয়ে ও আবার বললো, 'ইনি পুলিশের বিখ্যাত ডিটেকটিভ মিঃ কবীর হোসেন। মিঃ হোসেন, ইনি মিঃ রাসেল—ব্যাঙ্কার।'

এই প্রথম দেখলাম গোয়েন্দা কবীর হোসেনকে। সে-ও আমাকে দেখলেন। কিন্তু আমরা কেউ যেন কাউকে পছন্দ করতে পারলাম না। তাঁর দৃষ্টি যেন বলছিল—তুমি ব্যাঙ্কার, মানে বড়জোর একজন অফিসার, তোমার মালিক বা শেলী যে কোন সময়ই তোমার দফারফা করে দিতে পারে।

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিঃ রাসেল।'

কবীর সাহেবের গলার ভারিক্কি স্বর সৌজন্যমূলক মনে হল না। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে শেলীকে বললো, 'আমার লোক নজর রাখছে, নিশ্চিন্তে অনুষ্ঠান দেখুন।' আবার তেমনি মাপা হাসি শেলীকে উপহার দিয়ে সে ভিড়ের মাঝে চলে গেলো।

আমার হাসি পেলো। 'যাক, আপনার পাহারার ব্যবস্থাও হয়ে গেলো।'

'মিঃ কবীর হোসেন আমাদের পারিবারিক বন্ধু। মাঝে মাঝে আসেন। গল্প করেন। বিভিন্ন কেসের গল্প শোনান।'

সেই মুহূর্তেই ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল। ঘোষক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত পরিচিতি জানালো। মঞ্চের পর্দা সরে গেল। মৃদু আলোয় ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠলো মঞ্চ। দর্শকদের মাথার ওপরের আলোগুলো নিভে গেল।

অনুষ্ঠান শুরু হলো। যন্ত্র সংগীতের সুর মূর্ছনা সমস্ত দর্শকদের মাঝে একটা মায়াজাল বিস্তার করে ফেললো। তারপর গান। নাচ। একের পর এক আইটেম···তন্ময় হয়ে দেখছে শেলী। একটা সমবেত নাচের সময় বলে উঠলো, 'বাহ্, বাহ্, কি চমৎকার, আমার খুব ভাল লাগছে।' একটা শিশু যেমন হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে, শেলীর অবস্থাও তেমনি। আমার দিকে তাকিয়ে ভালো লাগার সমর্থন চাইল। আমি ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালাম।

অ্যাক্রোবেটদের কসরৎ দেখে শেলী নিজের উত্তেজনা আর ধরে রাখতে পারলো না। উত্তেজনায় আমার হাত চেপে

ধরলো। একটা খেলা শেষে দম নিয়ে বললো, 'এত উত্তেজিত আমি কখনো বোধ করিনি।'

একটি লোক বেশ উঁচুতে খেলা দেখাতে দেখাতে শূন্যে ঝাঁপ দিতেই শেলী প্রায় আর্তনাদ করে 'উহ্' বলে দু'হাতে নিজের চোখ দু'টো ঢেকে ফেললো।

চকিতে ওর দিকে চোখ ফেরালাম। 'কি হলো, মিস শেলী?'

'লোকটা ওভাবে'...চোখ থেকে হাত সরিয়ে আবার আমার হাত চেপে ধরলো। খেলোয়াড় সে লোকটা তখন স্টেজে দর্শকদের প্রশংসিত অজস্র হাততালির মাঝে মাথা নুয়িয়ে নুয়িয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে। তাই দেখে শেলী আবার বললো, 'উঃ! আমার দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা, মিঃ রাসেল।'

'আপনার কি খারাপ লাগছে?'

'ওঃ, না না। আমার ভীষণ আনন্দ লাগছে। আপনার সঙ্গে এসে এমন আনন্দ উপভোগ, মনে থাকবে বটে।'

অ্যাক্রোবেটদের প্রচণ্ড উত্তেজনাময় খেলার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হলো। দর্শকরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ করে চারিদিকে যেন ভিড় হয়ে গেল। খেলার উত্তেজনা শেষে শেলীকে যেন অবসাদে পেয়েছে। কিছুক্ষণ সে চুপ করে বসে রইলো। তারপর আমার গায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে শক্তি করে আমার এক হাত চেপে ধরলো শেলী যেন এখনই ভেঙে পড়বে।

লোকজনের ভিড়ের মাঝ থেকে হঠাৎ কবীর হোসেন বেরিয়ে এলো। 'কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে?'

'তাড়াতাড়ি বাইরে যেতে চাই।'

'আসুন।'

স্টেডিয়ামের বাইরে যাওয়ার জন্যে জনতার ঢেউ ঠেলে কবীর হোসেন আমাদের কোন। ক্রমে এনে গেটের বাইরে দাঁড় করালো। 'আপনারা এখানে দাঁড়ান, গাড়িটা নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি।'

গাড়ি যে কোন্ দিকে আছে ঠিক বুঝতে পারলাম না। জনতার ধাক্কা সামলে শেলীকে আমার প্রায় বুকের কাছে আগলে রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম। জনতার ঢেউয়ের সাথে সাথে স্টেডিয়ামের গরম বাতাসের ঝাপটা এসে গায় লাগছে।

'এখন কেমন লাগছে?' ওর হাতটা একটু নাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'ভালো। উত্তেজনা আর গুমোট গরম থেকে অমন হয়েছিল। ওরকম উত্তেজনা আমি কখনো বোধ করিনি।'

মুখ তুলে আমার চোখে চোখ রাখলো শেলী। কি সর্বনাশ! ওর চোখে যে সেই দৃষ্টি,—এ তো আমার অজানা নয়! মেয়েদের সাথে মেলামেশা আমার আছে। আমি বুঝি; দুর্দম আসক্তিতে নারী চিরকালই পুরুষকে ওই দৃষ্টিতে কামনা করে। ওর কোমল মুখের ভাব, চোখের চাহনী, গালের রক্তিম আভা —সেই আসক্তির আভাস।

ও আমাকে সত্যি চমকে দিলো। কুৎসিত ওই মেয়েটার এই দিকটা আমি চিন্তাই করিনি। বিশ্বাস করুন, এক চিলতে চামড়া দিয়ে জড়ানো হাড়ের এই বাণ্ডিলের মধ্যে যে কোন

কামনা-বাসনা থাকতে পারে তা আমার চিন্তার বাইরে ছিল। হয়ত তাই ব্যাপারটা আমার কাছে অশোভন বলেও মনে হলো।

এক পা পিছিয়ে এলাম। ওর হাতটা তখনো আমার হাতে। দু'জনের মাঝে একটু ব্যবধান সৃষ্টি করলাম। ঘাড় উঁচু করে দেখতে থাকলাম, গাড়ি আসছে কিনা। আমার মনের অবস্থাটা ওর না বোঝাই ভালো।

ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিলো সে। 'আমি এখন সুস্থ আছি।' কাঁপা কাঁপা ধরা গলার স্বর। আমার থেকে আরও কিছুটা সরে গিয়ে সে বললো, 'উহ্, যা বিশ্রী গরম!'

'আমরা বরং একটু এগিয়ে যাই, চলুন।'

আমি হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরতে চাইলাম। সে এড়িয়ে গেল।

'আপনি এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা নিয়ে আসুন।'

হঠাৎ করেই ওর গলার স্বরটা কর্কশ হয়ে গেলো, ওর দিকে তাকালাম। কোমল ভাবটা উবে গিয়ে মুখটা চুপ্সে গেছে। সেখানে দুঃখ আর হতাশা যেন থম্থম্ করছে। সে-ও মুখটা ঘুরিয়ে নিলো।

'দয়া করে আপনি যান,' চেঁচিয়ে উঠলো শেলী, হয়তো কেঁদে ফেলবে।

আমি ইতস্ততঃ করে শেষ পর্যন্ত ওকে একা ফেলে গাড়ির খোঁজে এগিয়ে গেলাম। অদ্ভুত মেয়ে বটে। এই আনন্দ, এই বেদনা। এই বেদনা কি নিরাশা থেকে? ও কি ভেবে-

ছিলো, আমি ওখানেই ওর আসক্তিতে সাড়া দেই। ওর সাথে প্রেম শুরু করি। যত্তোসব! আমার চিন্তাও যেমন। প্রভূত অর্থ আর প্রতিপত্তির অধিকারী ঐ মেয়ে আমার প্রেমে পড়বে, অত বোকা সে নিশ্চয় নয়।

গাড়ির লাইনে অনেক খুঁজেও শেলীর গাড়ি পেলাম না। দ্রুত আবার ফিরে এলাম সে-জায়গায়। কিন্তু শেলী নেই। ডানে-বামে তাকালাম। নেই। পেছন ফিরে স্টেডিয়ামের গেটের দিকে দেখছি, এমন সময় কবীর হোসেন এগিয়ে এলো।

'মিস চৌধুরী বাড়ি চলে গেছেন।' কবীর হোসেন বাঁকা চোখে তাকালো আমার দিকে—যেন তদন্ত করছে। 'ওঁকে বেশ বিপর্যস্ত লাগছিল।'

'হয়ত গরম আর উত্তেজনার জন্যে।'

'অনুষ্ঠানের উত্তেজনা?'

তবে কি ও আমার প্রেমে পড়েছে? পুলিশি গোয়েন্দা চোখেও কি তা ধরা পড়েছে? আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম। নাকি ক্ষণিকের নিছক কামনা?

'সম্ভবতঃ।' কবীর হোসেনকে বেশি পাত্তা না দিয়ে আমি চলে এলাম।

বাসায় ফিরে দেখলাম দরজার তালায় এক টুকরো কাগজ। রিতা এসেছিল। তালা না খুলে আবার পথে নামলাম। রিতা কি আজই ফিরলো ঢাকা থেকে?

কলিং বেলের বোতামে হাত দিতেই সুরেলা শব্দ তরঙ্গ

বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো। রিতা নিজেই এসে দরজা খুললো।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে রিতা। অনেকদিন পর ওকে দেখছি। বিলোল হাসি। টানা চোখ। মাংসল গণ্ডদেশ। ঈষৎ মোটা গোলাপী ঠোঁট। সেই রিতা, যাকে দেখেছিলাম বছর পাঁচেক আগে, আজও একই রকম আকর্ষণীয়া।

'কি হলো? ভেতরে এসো?'

লাল ছাপা ফুল-বয়েলের শাড়ী পরেছে রিতা। উজ্জ্বল শ্যামলা রিতা যেন আরও ফুটে উঠেছে। আঁটো ব্লাউজের ভেতর থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে উদ্বেল বুক। বুকের ঐ নমনীয় ভাঁজটার একটু নিচে, ডান দিকে, ছোট্ট লাল তিল আছে একটা। ঐ তিলটার জন্যে হঠাৎ মনটা কেমন যেন উস্‌খু-খুস্‌কু করে উঠলো।

'কি হয়েছে, রাসেল? অমন করে কি দেখছো?'

'তোমাকে। তুমি আরও সুন্দর হয়েছ।' আমি জানি, ওতেই হয়ে যাবে। আর বেশি কিছু লাগবে না। রিতা অন্য সব কিছুতে আধুনিকা বা কখনো কখনো অত্যাধুনিকা হলেও ওর মনটা একদম কাঁচা। কচি-সবুজ।

'তোমারও যেমন কথা! আমাকে যেন আজ নতুন দেখছো।' খুশির ঝলকে রক্তিম হয়ে উঠলো ওর মুখ। আড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'বসো। চায়ের কেট্‌লিটা চাপিয়ে দিয়ে আসি।'

আমি টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলাম।

'আমি রাসেল বলছি। মিস শেলীর সঙ্গে কথা বলবো।'

'লাইনে থাকুন, স্যার।'

রিতা ঘরে এলো। কি যেন নিয়ে আবার চলে গেলো।

টেলিফোনে শেলীর সেক্রেটারী মিস পারভীনের গলা ভেসে এলো। 'বলুন, মিঃ রাসেল।'

'মিস শেলীর সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

'দুঃখিত, তিনি শুয়ে পড়েছেন।'

'সামান্য কিছু কথাও বলা যাবে না?'

'অসম্ভব, মিঃ রাসেল।'

'তাহলে আর কি করা যায়! ঠিক আছে, তাঁকে বলবেন, আমি ফোন করেছিলাম। অনুষ্ঠান দেখার ধকলটা সামলে উঠেছেন কিনা জানতে চাইছিলাম।'

'আমি জানিয়ে দেবো।'

'মিস পারভীন, আপনাকে কিন্তু এখনও ধন্যবাদ জানানো...'

রিসিভার রেখে দেবার শব্দ শুনলাম।

এই নিয়ে দু'বার হলো। লাইন কেটে দেয়া। আচ্ছা। মিস পারভীন—আমাকে তুমি টানছো! রিসিভারটা রেখে দিলাম। একটা চাপা আক্রোশ শিরশির করে সারা শরীর বেয়ে মাথায় এলো। কপালটা ঘেমে গেলো।

'যাকে ফোন করলে সে কি ঐ শেলী চৌধুরী, টাকার কুমীর?'

রিতা যে কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে টেরই পাইনি। বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তাকে নিয়েই অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলে?'

মুন্সী ফজলুর রহমানকে ডায়াল করতে করতে বললাম, 'হ্যাঁ।'

অপর প্রান্তে রিং হতেই রিসিভার তোলার শব্দ হলো। মুন্সীর গলা, 'হ্যালো ?'

'আমি রাসেল। মুন্সী, আর ভাবনা নেই। কালই আড়াই লাখ টাকার বণ্ড ভাঙানো হবে। টাকাটা এমন ভাবে কাজে লাগাবে, যাতে মাসে মাসে ওকে কিছু লাভ দেখানো যায়। আর শোন, লোকসান বিশ হাজারের বেশি দেয়া যাবে না।'

'লোকসান পাঁচ হাজারের বেশি কখনো যাবে না।'

'চমৎকার। বাকীটা তোমার ওপর। আর টাকাটা কি কাজে লাগছে না লাগছে, একটা হিসেব প্রতি সপ্তাহে আমাকে দিতে হবে। প্রতি সোমবারেই ওটা আমি চাই।'

'ঠিক সোমবারেই পেয়ে যাবে।'

'তাহলে আমাদের কাজ শুরু হোক। টাকার দরকার হলেই আমাকে বলবে।'

'তোমাকে এ নিয়ে আর ভাবতে হবে না।'

রিসিভারটা জায়গামতো রাখতেই রিতা এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। বললো, 'আড়াই লাখ টাকা নিয়ে কথা—নাটকের কোন সংলাপ বলছিলে না তো ?'

আমি রিতার চোখে চোখ রেখে হাসলাম। 'বাদ দাও ওসব।'

'তার মানে, এ নিছক অভিনয় নয়।'

'একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি। আমি এখন শেলী অ্যাকাউন্টে কাজ করছি। আর সে-সুযোগে নিজের জন্যেও কিছু আমদানীর ব্যবস্থা করেছি।'

'শেলী অ্যাকাউন্ট! শেলী চৌধুরীর টাকার পাহাড়ের হিসেব। এতদিন তো শুনে এসেছি, সে এক আতঙ্কের ব্যাপার!'

দু'জনেই গিয়ে বিছানায় বসলাম।

'আতঙ্কই বটে। একদম জীবন্ত বিভীষিকা। তবে আমার মতো মানুষের হাতে পড়েছে তো, বেশ কাবু হয়ে এসেছে। আজ তো আমার চরিত্রই প্রায় নষ্ট করতে বসেছিল।'

'যাঃ, একটা কথা হলো?'

'বিশ্বাস করো। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে রেখেছি।'

'তোমার স্বভাবের বাইরে কাজ করেছো বলতে হয়।'

'ওকে দেখতে বাঁদরমুখো না হলে হয়তো পারতাম না।' রিতার দিকে চেয়ে হাসলাম।

'আর ওকেই আবার একটু আগে ফোন করেছিলে? কেন? চাকরী বাঁচাতে?' রিতার গলার স্বরে হঠাৎ শ্লেষ শোনা গেল।

'কথা বলতে আর পারলাম কৈ! ওর সেক্রেটারীটা এগুতে দিল না।'

'চেষ্টাটা মনে হয় জোর করোনি।'

'অবশ্য খবর দিতে বলেছি। ওই যথেষ্ট।'

'এই তো তোমার বুদ্ধি—মেয়েদের ব্যাপারে নিজেকে আবার খুব হামবড়া ভাবো। যে মেয়ে তোমার চরিত্র নষ্ট করতে চায়, সে মেয়ে কখনই শুধু একটা খবর আশা করে না। খবরের চেয়ে আরো বেশি কিছু—ধরা-ছোঁয়া যায়, এমন কিছুই চায়। জীবনে তো কম কিছু আর করলে না?'

'কি যা তা বলছো, রিতা। ওই মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট

হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

'থাক থাক, হয়েছে। ক'দিন পর হয়তো শুনবো, চাকরী বাঁচাতে বা আড়াই লাখ রক্ষা করতে তোমাকে প্রেমও বিলাতে হচ্ছে।' বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো রিতা। 'বসো, চা নিয়ে আসছি।'

বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। রিতা ঠিকই বলেছে। শেলী হয়তো আরো বেশি কিছু চায়। ধরা-ছোঁয়ার মতোন। অনুভব করার মতোন। এ মেয়ে তো জীবনে স্নেহ-মায়া-মমতা, প্রেম ভালবাসা, এমন কি কোন পুরুষের বলিষ্ঠ হাতের সামান্য ছোঁয়া—কিছুই পায়নি। আমি যদি এ সবই দিতে চাই, নিশ্চয়ই ও মেয়ে লোভাতুর হয়ে উঠবে। জীবনে যা কখনো পায়নি, তা পাবার আশায় আমাকে কাছে টানতে চাইবে। আর আমিও ওর অগাধ টাকার কাছাকাছি পৌঁছে যাবো।

টাকা। টাকাই তো আমার চাই। ছোট সময় থেকেই টাকার অভাবের মধ্যে দিন কাটিয়ে টাকার তৃষ্ণা আমার দিন দিন বৃদ্ধিই পেয়েছে। টাকার কাছে আমার অন্য সব কিছু তুচ্ছ। টাকাই আমার জীবনের কাম্য বস্তু—ইচ্ছে করলেই হয়তো এক পাহাড় টাকার মধ্যে নিজের স্থান করে নিতে পারি।

বিয়ে করলে কেমন হয়? শেলীকে? উঃ, কি সাংঘাতিক চিন্তা যে আমার মাথায় আসে! ওই হাড়সর্বস্ব মেয়েটাকে পাশে নিয়ে এক বিছানায় রাত কাটানো—রিতার বিছানায় শুয়ে এ কথা কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু টাকার কথাও যে কল্পনার কক্ষপথ থেকে বাদ দেয়া যায় না।

'অ্যাই, ওঠো, চা নাও।' দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে রিতা বিছানার সামনে দাঁড়ানো।

আমার হাতে এক কাপ চা দিয়ে রিতা গিয়ে চেয়ারে বসলো। নীরবে বসে বসে চা খেলাম। রিতা বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু কিছু বলছে না। চা শেষ করে কাপটা টেবিলে রেখে এসে আবার বিছানায় বসলাম।

'ভাবছি, শেলীকে বিয়ে করলে কেমন হয়!'

'হঠাৎ তোমার এমন ভাবনা?' রিতা সোজাসুজি আমার দিকে তাকালো। 'মাথা খারাপ হয়নি তো?'

'একটা সত্যি কথা ভেবে দেখলাম, রিতা। অন্ধকারে বিছানায় একটা মেয়ের সাথে আরেকটা মেয়ের কোন তেমন পার্থক্য নেই। কিন্তু কোটি কোটি টাকা, যেভাবেই যখন খুশি দেখো না কেন, তা কোটি কোটি টাকাই।'

'তোমার কাছে কি টাকাটাই সব?'

'জীবনটাই তো টেনে চলেছি টাকার আশায়। তুমি তো জান, টাকাই আমার একমাত্র স্বপ্ন, সাধ। শেলী যদি কোন কারণে বিগড়ে যায়, তবে প্রথম সুযোগেই আমাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে। আমার সব স্বপ্ন-সাধ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।'

আমি বিছানায় আবার গা এলিয়ে দিলাম। রিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো।

'ধেৎ, ওসব বাজে চিন্তা ছাড়ো, রাসেল। এখন বলো, আমাদের বিয়েটা কবে সারবে?'

'আমাদের বিয়ে?' ঝট্ করে আমি উঠে বসলাম। 'মানে,

তোমার আর আমার বিয়ে?'

'আকাশ থেকে পড়লে নাকি? ক'দিন আগে লিখে জানিয়েছিলাম, আমি অন্তঃসত্ত্বা। সে কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি?'

'সেটা কোন সমস্যাই নয়।'

'রাসেল?' অস্ফুট চিৎকার করে আমার সামনে বসে পড়লো রিতা। 'আমি জানতাম তুমি তা বলবে। তোমার নিষ্ঠুরতায় সত্যিই কোন সীমা নেই।'

'রিতা, শোন, আমার কথা শোন।' আমি রিতার একটা হাত চেপে ধরলাম। 'তুমি তো অমন মেয়ে নও, রিতা। একটা সস্তা সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করে তুমি আমার জীবনের একমাত্র সুযোগটাকে নষ্ট করে দিতে চাও? বলো, রিতা?'

'টাকা! টাকা!! টাকা!!! তুমি কি টাকা ছাড়া জীবনে আর কিছু ভাবতে পারো না, রাসেল? আমি কি তোমাকে এতদিন ধরে টাকা দিইনি?'

'তোমার সব টাকা আমি এবার শোধ করে দেবো।'

'রাসেল, তুমি···' হাতটা আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলো।

কিন্তু পারলো না। আমি আরও জোর করে ধরে নাড়া দিয়ে বললাম, 'শোন রিতা, আমি যে হারে টাকা পেতে চলেছি, তা দিয়ে খুব শীঘ্রই শহরের অভিজাত আবাসিক এলাকায় একটা সুন্দর বাড়ি তৈরি করে ফেলতে পারবো। সেখানে থাকবে তুমি। শেলীর বিছানায় ক্লান্ত হয়ে মাঝে মাঝে চলে আসবো সেখানে, তোমার কাছে। উপভোগ করবো তোমার

উষ্ণ সান্নিধ্য। তুমিও আমার রইলে।'

'তুমি একটা লম্পট। নীচ। আমার হাত ছাড়ো···' ঝট্‌কা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিলো। 'একটা মেয়েকে বিয়ে করে তার সর্বনাশের চিন্তা আমার সামনেই করছো। মেয়ে হয়ে আরেকটা মেয়ের সর্বনাশ,—উহ্‌, ভাবতেই পারছি না। তুমি আর মানুষ নেই রাসেল—তোমাকে, তোমাকে আমার ঘৃণা করতে ইচ্ছে করছে।'

আমি বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালাম।

'কোথায় যাচ্ছ? তোমার সন্তানের কি করবে বলে যাও?' রিতা আমার মুখোমুখী এসে দাঁড়ালো।

'সে তোমার মাথা ব্যথা। আমার করার কিছু নেই।' ওকে পাশ কাটিয়ে দরজা খুলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে চলে এলাম।

সাত

আপনি বিশ্বাস করুন, বিয়ের কথাটা মাথায় আসার পর কাজটা যে এত দ্রুত সমাধা হয়ে যাবে তা আমি কল্পনাও করিনি। রিতার সাথে সে-রাতে কথা কাটাকাটি করে চলে আসার পর এক মাস বা আরো কয়েকদিন বেশি হবে, শেলীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেলো।

রিতার বিছানায় শুয়ে আমি যেমন চিন্তা করেছিলাম ঠিক সেই ভাবেই এগিয়েছিলাম। শেলী সারা জীবন একাকী কাটিয়েছে। পিতার স্নেহ বলতে যা বোঝায়, তাও সে কোন দিন পায়নি। নানা কারণেই সে বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। নিয়ম মাফিক যাদের সঙ্গে সে পরিচিত হয়েছে বা সামাজিক কারণে যৎসামান্য মিশেছে, তাতে তার নিঃসঙ্গতা কাটার কথা নয়। কারো ভালোবাসাও সে পায়নি। সেক্ষেত্রে আমিই ওর জীবনে প্রথম একজন পুরুষ, যে ওর খুব কাছাকাছি এসেছি। ঘনিষ্ঠ সঙ্গ দিয়েছি। ওর সম্পর্কে একটা ভয়, বিতৃষ্ণা বা ঘৃণা

মূলতঃ সবাইকে ওর কাছ থেকে সবসময় দূরে সরিয়ে রেখেছে। আমি হয়তো সে অবস্থাটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম বলেই সে উল্টো আমার দিকে ঝুঁকেছিল। যাই হোক, নানা রকম চিন্তা ভাবনা করে, ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে দিনে একবার দেখা করার সুযোগ আমিও সৃষ্টি করে নিয়েছিলাম।

প্রথম কয়েকদিন শুধু ব্যবসা-সংক্রান্ত বিবিধ দিক নিয়েই আলোচনা হয়েছে। সামান্য সময় পেলে হয়তো বাগানে দু'জনে বেড়াতাম। তারপর জরুরী কাজের অজুহাতে এক সময় কেটে পড়তাম।

সন্ধ্যায় কথনো ওকে নিয়ে গেছি চায়নিজ রেস্তোরাঁয়। কখনো বা বিপনী বিতানে। এ দোকান সে দোকান ঘুরে ঘুরে আমরা এটা সেটা কিনেছি। খুবই সামান্য ব্যাপার। ওটাই ছিল আমার ধীর অথচ নিশ্চিত ভাবে লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া। বুঝতাম, এতেই ওর অনেক আনন্দ।

কোন কোন দিন শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে, এ পথ থেকে ও-পথে এলোমেলো ওকে নিয়ে গাড়ি করে ঘুরে বেড়িয়েছি। কখনো চলে গেছি শহর ছাড়িয়ে নির্জন কোন পথে, দূরে। দীর্ঘ সময় ওর একান্ত সান্নিধ্যে কাটিয়ে ওকে যখন চৌধুরী ভবনে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিতাম, তখন সে প্রগাঢ় প্রশান্তি ভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। মাঝের দেয়ালটাকে ইচ্ছে করলেই ভাঙতে পারতাম, কিন্তু নিজেকে সামলে রেখেছি।

এমনি প্রতি রাতে বেড়ানোর দিন দশেকের মধ্যেই ওর

কড়া তিরিক্ষি মেজাজ যেন কোন মন্ত্রবলে উবে গেল। বরং নিজের দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতাগুলো কাটাবার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করলো। সে সময় ওর দিকে চেয়ে সত্যিই খুব কষ্ট হতো। তখনো ও আমাকে মিঃ রাসেল আর আমি ওকে মিস শেলী বলে ডাকি।

আপনার কাছে এসব কথা নিরেট জলো বা অদরকারী বলে মনে হতে পারে। তবু বলে নিচ্ছি এজন্য যে, আমি বললাম, আর শেলী আমাকে বিয়ে করে ফেললো, এমনটা যেন ভেবে না বসেন।

এভাবে একুশ দিন কেটে গেলো। আমি শুধু অপেক্ষা করছি, ও জায়গা মতো নেমে আসুক। একবার যখন নামতে শুরু করেছে, আমি নিশ্চিত, সে শুধু নামবেই। অপ্রতিরোধ্য ভাবে নামতেই থাকবে।

বললাম, 'আমরা আজ পতেঙ্গা, সমুদ্রের ধারে যাবো।'

চপলা কিশোরীর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো শেলী।

সমুদ্রের ধারে যখন আমরা গাড়ি থেকে নামলাম তখন পুব আকাশে বিরাট থালার মতো ধবধবে চাঁদ উঠেছে। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। সমুদ্রের ওপর চাঁদের আলোর ছড়াছড়ি। ঝিলিমিলি খেলা।

আমরা পাশাপাশি হাঁটলাম। কথা বললাম। সমুদ্র, চাঁদ, ঢেউ, আকাশ নিয়ে। সাগর মিলনে তৃপ্ত কর্ণফুলীকে নিয়ে। আলো দেখে দেখে গুণলাম সমুদ্রের বুকে অপেক্ষমান সামুদ্রিক জাহাজগুলোকে। ওর মনের বন্ধ দুয়ার যেন আলগা হয়ে

গেছে।

আমরা তখন নির্জনে দাঁড়িয়ে। চাঁদের নরম আলোর আবেগে শেলী হালকা পালকের মতো আছড়ে পড়লো আমার গায়। আমি জড়িয়ে ধরলাম ওকে। ও মুখ তুলে তাকালো, আমি চুমো খেলাম।

আমার হাত ধরে অপার বিস্ময়ে ও আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'আজ রাতটা কি আমরা শুধু চাঁদের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিতে পারি না?'

'কাল সকালেই আমাকে আমার পেটের ধান্দায় ছুটতে হবে।'

'নাই বা ছুটলে?'

হৃদয়ে তার প্রলয় নাচন। কণ্ঠেও কি তারই মাতম?

'আমার তো অনেক টাকা। দু'জনের জন্যে তো ওই যথেষ্ট। রাসেল···' আমার হাতে একটু নাড়া দিলো, 'ব্যাঙ্কের কাজটা তুমি ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে, রাসেল, আরো বেশি সময়ের জন্যে কাছে পেতে চাই।'

আমি জানতাম, ঠিক এভাবেই শেলী নামবে। নামুক। আরো নামুক।

'শেলী, কি বলছো তা তুমি নিজেই জানো না। এ জন্যে পরে তোমাকে দুঃখ করতে হবে। তাই ওসব কথা থাক।' আমি একটু চুপ করে থেকে আবার বললাম, 'আমি বোধ হয় ভুল করলাম, তোমাকে চুমো খাওয়া ঠিক হয়নি।'

'না রাসেল, তোমার একটুও ভুল হয়নি। আমিও মনে মনে তাই চেয়েছিলাম।'

'এ চাওয়ার জন্যে তুমি পরে কষ্ট পাবে, শেলী।' আমার গলার স্বরে ছিল নিরাসক্ত ভাব।

'আমাকে তুমি কি একটু করুণা করতে পারো না, রাসেল? আমার দিকে তাকাও, রাসেল, আমি বড় একা।' আমার বুকের ওপর হাত দু'খানা রেখে ও মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

পিঠে হাত দিয়ে ওকে কাছে টানলাম।

'আমারও যে তোমায় নিয়ে কত সাধ, শেলী! কিন্তু হায়, অর্থ আর মর্যাদা যে আমার নেই!' বলেই ওকে একটু আলগা করে দিলাম। 'শেলী, এটা ভুলে যাওয়াই ভালো। চলো, ফেরা যাক।'

গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। শেলী বোধ হয় এমনটা আশা করেনি। সে-ও তাড়াতাড়ি এসে আমার পাশাপাশি চলতে শুরু করলো। কোন কথা নেই কারো মুখে। নীরবে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে গাড়িতে পৌঁছলাম দু'জনে। স্টার্ট দেবার জন্যে চাবীটা ঘুরাবো, আমার হাতটা চেপে ধরলো শেলী।

'সত্যি করে বল তো, রাসেল, তুমি আমাকে কি ভাবো?'

'সে আমি তোমাকে বলতে পারবো না, শেলী। তুমি, তুমি যে আমার চেতনায় কেমন ভাবে জড়িয়ে আছো, তোমাকে ঠিক বুঝাতে পারবো না। আমার সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত চিন্তা-ভাবনা শুধু তোমাকে ঘিরে, তোমাকে প্রতি মুহূর্তে

পাবার কামনায় আমি অস্থির।

তাকালাম শেলীর দিকে। আধো আলো, আধো অন্ধকারেও দেখলাম, শেলীর চোখে-মুখে কী আশ্চর্য আনন্দের ছটা। আমার কথা তার মাঝে খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া করেছে। ব্যথাতুর ভাবটা নেই। প্রেমের প্রভা যেন ওর কুৎসিত চেহারাটাকে অনেক উজ্জ্বল করে তুলেছে।

'সত্যি, তুমি আমাকে ভালোবাসো, রাসেল?' ওর হাড়-সর্বস্ব আঙ্গুলগুলো আমার হাতটাকে আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরলো।

'এ শুধু আমার কষ্টই পাওয়া। তোমাকে পাবো না তা আমি জানি। আকাশের চাঁদ ধরতে যাওয়া যে বোকামী।'

'তুমি আমাকে একান্ত করে পেতে চাও?' আমার হাত ছেড়ে পাশ ফিরে বসলো শেলী। আমার দিকে ঝুঁকে হুইলে হাত রেখে বললো, 'তার মানে, তুমি···রাসেল; তুমি··· আমাকে বিয়ে করতে চাও?' আবেগে সে যেন কাঁপছে।

চাবি ঘুরালাম। গাড়ির ইঞ্জিন চালু হলো।

বললাম, 'যা সম্ভব নয়, তা নিয়ে কথা বলে কি লাভ? তাছাড়া, আমার ভালবাসাকে অমলিন রাখার জন্যেও আমাদের মধ্যে বিয়ে না হওয়াই উচিত।'

'ও কথা কেন বলছো? তুমি কি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো না?'

'অবিশ্বাসের কথা নয়, শেলী। বিয়ের পর তোমার টাকার ওপর যদি আমাকে বাঁচতে হয় তবে আমি তা মানসিক ভাবে

মেনে নিতে পারবো না। আমার ভয়, পাছে তোমার প্রতি আমার এ সুন্দর ভালবাসার অমর্যাদা হয়।'

'ওহ্, আমার যে কি ভালো লাগছে, রাসেল! আমি তোমার কাছে এমনটাই আশা করেছিলাম। তুমি আমাকে চাও, অথচ আমার টাকা এর মাঝে এক বিরাট বাধা, রাসেল—'

'তোমার অগাধ অর্থ আর আমার একটুকরো সোনালী স্বপ্ন। আমার হৃদয় একরাশ বেদনায় কেঁপে ওঠে অহরহ —ও কথা থাক শেলী। আমি আর ব্যথার বোঝা বাড়াতে চাই না।'

হঠাৎ থেমে গেলাম। নিজের কানেই যেন কথাগুলো উল্টো এসে ঘা মারছে। পাগলের মত যা-তা কি সব বকছি?

কিন্তু আমার কথাগুলো শেলীর কাছে নিছক বক্‌বক্‌ ছিল না। আমি নিশ্চিত, শেলীকে গেঁথে ফেলতে ওই যথেষ্ট। আমার চোখে যথাসম্ভব মলিন ও ব্যথাহত ভাব ফুটিয়ে ওর দিকে তাকালাম।

গিয়ারে হাত রাখলাম। এক ঝটকায় আমার হাতটা সরিয়ে দিয়ে শেলী বললো, 'থামো।' আমার মুখের দিকে তাকালো অপলক দৃষ্টিতে। 'তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, রাসেল, আমার অর্থ দু'জনার সুখ-স্বপ্নকে নষ্ট করুক, তা হতে দেয়া যায় না। এর একটা বিহিত আমাদেরই খুঁজে পেতে হবে।'

চিন্তান্বিত মনে হলো শেলীকে। চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আবার বললো, 'তুমি কাল একবার আমার ওখানে

এসো। চিন্তাটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, উপায় একটা ঠিকই বের করে ফেলবো।'

ওর কথায় ভাবনা-মুক্ত হলাম। যা হোক, শেলী অন্ততঃ ভাবছে না যে, আমি ওর টাকার লোভেই ওকে প্রেম নিবেদন করছি।

নির্বিকার কণ্ঠে বললাম, 'আমাকে তো আসতেই হবে। তোমার কাছ থেকে যে আমি বেশিক্ষণ দূরে থাকতে পারি না। তবে আমার মনে হয়, এ সবকিছু আমাদের ভুলে যাওয়াই ভালো। আমাদের দেখা উচিত, অন্ততঃ বন্ধুভাবে দু'জনে কাছাকাছি থাকার সুযোগটা যেন আমরা নষ্ট করে না ফেলি।'

'বিষয়টা আমার ওপর ছেড়ে দিলে আমি খুশি হবো, রাসেল।'

আমার দিকে ঝুঁকে পড়লো শেলী। সে কি আমার কাছ থেকে এখন একটা চুমো আশা করছে? ওহ্, ধরণী দ্বিধা হও।

কোনরকম ঝুঁকি নেয়নি শেলী।

পরদিন দুপুরের দিকে টেলিফোন করেই ব্যাপারটা বুঝে ফেললাম। বিয়ের ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছে মেয়েটা।

সন্ধ্যের দিকে একবার নিজে গেলামও। খুব উচ্ছল উচ্ছল লাগছিল শেলীকে। একটু লজ্জা জড়ানো ভাব কি ছিল?

ওর মনে কোনরকম সন্দেহ না জাগিয়ে আমার পক্ষে এর বেশি কিছু করা সম্ভবও ছিল না। আমার দিক থেকে ওর মনের ওপর যে চাপটার সৃষ্টি করেছিলাম তা নিছক ভাবালুতা

ছিল বলেই হয়তো রক্ষা পাওয়া গেছে। তবু কি আমি হাতের তাসটা ঠিক মতো খেলতে পারলাম ?

আমাকে বিয়ের জন্যে শেলী উদগ্রীব। ওর নীচতা সম্পর্কে সবাই জানে। আমিও জানি। তবু ওর প্রস্তাব আমার কাছে লোভনীয়। একথা সত্য যে, ওর সাতকোটি টাকার ভাবনা যদি আমাকে তাড়া না করতো, তবে এ প্রস্তাব ভীষণ বিপদে ফেলতো।

আড়াই লাখ টাকা খাটাবার ব্যাপারেও এর মধ্যে শেলী তার নতুন সিদ্ধান্ত জানিয়েছে। টাকাটা দান হিসেবে নেবো না, জেনেই সে ওটা ধার হিসেবে দিতে চায়। লাভ হলে আমারই হবে। কোনরকম প্রশ্ন যাতে না দেখা দেয় এবং এ নিয়ে যাতে মনের দিক থেকে সহজ থাকা যায়, সেজন্যে সে শুধু ব্যাঙ্কের হারে সুদ নেবে। ভালই হলো। আমার মনে যে কোন লোভ নেই ও একদম এমনিতেই টাকা নিতে আমি রাজী হবো না, এটা সে বুঝলো।

আড়াই লাখ, আমার জন্যে মন্দ নয়।

অফিসের বাঁধাধরা কাজ করতে দিতেও শেলীর আপত্তি। তার ইচ্ছা, আমি নিজেই কয়েকটা অফিস খুলে সমস্ত সম্পত্তি দেখাশুনা করি। সুযোগ্য জনা কয়েক কর্মচারী নিয়োগ করে আমার কাজকে যেন হালকা করে নিই। দিনের মধ্যে ঘন্টা দু'য়েক কাজকর্মের তদারক করে বাকী সময়টা যেন শেলীর সঙ্গে কাটাই।

ওর সমস্ত জায়গা-সম্পত্তির দাড়িত্ব আমার হাতে এসে

যাওয়ার মানেই হলো আমার রোজগারের পথ খুলে যাওয়া। মুন্সী এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে সব সময়ই প্রস্তুত। সুতরাং এর মাঝেই আমি বেশ কিছু টাকা গুছিয়ে নিতে পারবো।

শুরুটা আমার জন্যে চমৎকার, সন্দেহ নেই।

এদিকে শেলী বিয়ের জন্যে খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। শুভ কাজে দেরি করতে নেই—অমন কোন ভাবনা তার মনে কাজ করছিল তা যেন ভাববেন না। ওর কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে বোঝা যাচ্ছিল, ওর ভয়, যদি কোন কারণে হঠাৎ আমার মত বদলে যায়। আমি নিজে কিছুটা প্রস্তুতি নেবার অজুহাত খাড়া করতে চেয়েছিলাম, কাজ হয়নি। সে সোজা জানিয়ে দিয়েছিল, বিয়েতে কোন খরচ-পত্র বা আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা যেন আমি না করি। শুধু যেটুকু না করলেই নয়, তাই যেন করি এবং সে-প্রসঙ্গে যাবতীয় খরচই সে বহন করবে। আমার আত্মীয় স্বজনকে জানানোর প্রশ্নটাও সে সযত্নে এড়িয়ে গেল। আমাকে দ্বিতীয় কোন চিন্তার সুযোগ না দিয়ে, যদিও তেমন কোন চিন্তা আমার থাকার কথা নয়, মাত্র দু'সপ্তাহের সময় হাতে নিয়ে শেলী বিয়ের দিন ঠিক করে ফেললো।

আপনি হয়তো ভেবে অবাক হচ্ছেন, শুধুমাত্র টাকার প্রয়োজনেই আমি শেলীকে কেন বিয়ে করতে রাজী হলাম। আপনার এটা সংগত ভাবনা। আপনি আমাকে যতটুকু জানেন,

চেনেন, তাতে এ ভাবনা অস্বাভাবিক নয়। আপনার চেনা-জানা রাসেলের বাইরেও আমার একটা রূপ ছিল যেখানে আমি শুধু একরাশ টাকা প্রাপ্তির তীব্র যন্ত্রণায় অহরহ ছট্‌ফট্‌ করতাম। আত্মসম্মানে বাধতো বলে সে রূপকে আমি সব সময় আড়াল করে রাখতাম।

আমার বড় বোনের বিয়ের পর থেকেই আমাদের সংসারে অভাবের শুরু। জমি বিক্রি করে বোনকে বিয়ে দিতে হয়েছিল। খোরাকীতে টান পড়লো। আমি তখন স্কুলের ছাত্র। লেখা-পড়া শিখে সংসারের ভাঙা হালটাকে আমি জোড়া লাগাতে পারবো, এমন একটা ভাবনা আমার বাবা-মাকে সবসময় অভাব অনটনের মাঝেও উজ্জ্বল আশায় বুক বেঁধে রাখতে সাহায্য করতো। তাই আমার পড়ার খরচ যোগাতে সময়ে সময়ে আরও জমি বিক্রি করতে তারা দ্বিধা করেনি।

লেখাপড়ার পাট চুকাবার পরই আমি বাস্তব অবস্থার মুখোমুখী হয়েছিলাম। গ্রামের বাড়ির সংসারের মতই আমাকেও তখন অভাব এসে চারদিক থেকে ছেঁকে ফেললো। আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। বাড়িতে ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে বাবা-মা অনেকদিন থেকেই আধ-পেটা খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, শুধু আমার দিকে চেয়ে। আর আমি, বেকারত্ব ঘুচাতে পারছিলাম না। কিছু টাকা, ক'টি নিরন্ন মুখে হাসি—আমি দিন দিন চিন্তায় চিন্তায় নিজের ওপরই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলাম।

সে-সময়েই পরিচিত হলাম রিতার সাথে। নতুন করে যেন আমি জীবনের অর্থ খুঁজে পেলাম। কিন্তু টাকার অভাব

আমার মিটলো না। উল্টো অনেক টাকার মালিক হওয়ার ইচ্ছাটা আরও তীব্রতর হলো। রিতার পরিচয়ের সূত্রে অনেকের সাথেই আমার পরিচয় হলো। তখন অবশ্য একটু চেষ্টাতেই তিন চার জায়গায় কেরানীর চাকরী জুটে গিয়েছিল। কিন্তু রিতা কেরানীর চাকরী আমাকে করতে দেয়নি। তার ভয়, পাছে আমার মানসিকতা নষ্ট হয়ে যায়।

ছোট বোনের বিয়ের জন্যে এর মধ্যেই দশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। দিন কয়েক পরে আরো দশ-পনের পাঠিয়ে দেবো। আমি যে টাকার গুহায় ঢুকতে চলেছি তা তাদের জানাইনি। কি হবে জানিয়ে? প্রচুর পরিমাণে টাকাই এখন তাদের কাম্য। বিয়ে করেছি সে-কথা পরে জানিয়ে দিলেই হবে।

না, শেলীও আমার বাবা-মা বা আত্মীয়-স্বজনের কোন প্রসঙ্গ তোলেনি। সযত্নে এড়িয়ে গেছে। ওর জন্যে এমনটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ—আগেও বলেছি, শেলী বিয়ের ব্যাপারে কোনরকম ঝুঁকি নিতে চায়নি। আমিও সে-প্রসঙ্গ টানিনি। কি দরকার ঝামেলা বাড়িয়ে!

বিয়ে বাড়িতে আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছিল। আপনার মুখের স্নেহময় হাসিটি অত্যন্ত আপন বলে মনে হয়েছিল আমার। বিয়েতে লোক ত আর কম হয়নি। হাজারের চেয়েও বেশি ছিল নিমন্ত্রিত অতিথি। শহরের মধ্যে নিমন্ত্রণ করার মতো এতো গণ্যমান্য লোক যে আছে তা তখনই জেনেছিলাম। ঘটা

করে এত বড় আয়োজনে আমি রাজী ছিলাম না। কিন্তু আমার কথার কাছ দিয়েও শেলী যায়নি। আর যাবেই বা কেন, এ তো তার জন্যে এক পরম পাওয়া। পারলে সে আরও লোক-কে নিমন্ত্রণ করতো। দেখাতো তার সুপুরুষ স্বামীকে। তাই হয়তো অনুষ্ঠান যথাসম্ভব জাঁকজমক করতে সে কার্পণ্য করেনি একটুও।

কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন। সব অতিথিরা আসছে। আমাকে দেখছে। মুচকী হাসছে। সেসব হাসির অর্থও আমি বুঝছি,—বেটা, টাকার সাথে বিয়ে বসার লোভটা বুঝি সামলাতে পারলে না। ক্রমাগত সেসব দৃষ্টি যখন আমাকে অসহায় করে তুলছিল, তখন আপনি এগিয়ে এসে কথা বলে-ছিলেন। আপনার সেই কথা আর হাসি আমাকে অনেক সাহস জুগিয়েছিল। অন্য সবার চিন্তার বিপরীতে আপনি ভাবছিলেন,—আমার খেয়ালী, প্রেমিক মন উদ্ভট একটা কিছু করার উৎসাহে বিয়ের সাজ পরেছে।

জনাব কমিশনার সাহেব, আপনার সাথে পরিচয়ের প্রথম থেকে, এ জন্যেই আপনাকে আমার খুব ভালো লাগে। শ্রদ্ধা করি। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আপনি কাউকে নীচ করে কখনো চিন্তা করেন না। ওখানেই আপনার মহত্ত্ব।

আট

এরপর মধুচন্দ্রিকা। ইউরোপে।

মধুচন্দ্রিকার ব্যাপারে শেলীর বেশ বাতিক ছিল। অনেক চেষ্টা করেছি ওর মত বদলাতে। কিন্তু পারিনি। যখনই মনে হয়েছে, বিদেশে গিয়ে ওর সঙ্গে অহোরাত্র সময় কাটাতে হবে, তখনই আমি যেন মুষড়ে পড়তাম। সময়ও কম নয়, দীর্ঘ ছয় সপ্তাহ। সত্যি বলতে কি, হানিমুন—যার বাংলা প্রতিশব্দ আমরা মধুচন্দ্রিকা করেছি, এ নিয়ে আমি বেশ বিব্রত বোধ করছিলাম। হয়তো নিম্নবিত্তের মানসিকতার উর্ধ্বে আমি উঠতে পারিনি।

কিন্তু আমার শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেলীর উৎসাহে ও উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়েনি। এ যেন তার জীবনের একটা চাহিদা। প্রাপ্য। বিদেশীদের তত্ত্বাবধানে বাড়িতে যা কিছু লেখাপড়া শিখেছে, তাতে আর যাই হোক, পশ্চিমা ধ্যান-ধারণাগুলো ওর মাঝে বেশ মজবুত আসন গেড়েছে। তাছাড়া বিদেশী গল্প কাহিনী

আর পত্র-পত্রিকা তো অহরহ গিলছেই।

বিয়ের আগেই শেলী মধুচন্দ্রিকার সমস্ত প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলেছিল। প্রথমে রোম। রোম থেকে নেপল্‌স্‌। নেপল্‌স্‌ এ অপেক্ষা করবে বিরাট এক বিলাসবহুল জাহাজ। এ জাহাজেই শেলী তার বাবার সাথে ইউরোপ ভ্রমণে একবার প্রমোদ বিহার করেছিল। সে-জাহাজই আমাদের নিয়ে যাবে ভেনিস।

বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠানই একদিনের মধ্যে সীমিত রেখেছিল। আমার পক্ষ থেকে বৌ-ভাত জাতীয় পার্টিতে তার ঘোরতর আপত্তি ছিল। কারণ হানিমুন। দেরি করতে সে রাজী নয়। বিয়ের রাতে অতিথিরা যেতে যেতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। সে-রাতে কিন্তু বাড়িতে দু'ধরনের পার্টি ছিল। বাঙালীয়ানা মতে যারা খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছিল তারা বারোটার মধ্যেই সবাই চলে গিয়েছিল। অন্য পার্টিটা ছিল পশ্চিমী কায়দার। পান পাত্র উজাড় করে তারা সারা রাত আমোদ করেছে। তারা যখন চলে গিয়েছিল, তখন প্রায় সকাল।

ভোরের রোদ গায় মেখে আমরাও চলে এলাম ঢাকায়।

আমাদের সাথে, আমার সাজ-পোশাক সুবিধা-অসুবিধা দেখার জন্যে একজন লোক, শেলীর জন্যে একজন আয়া এবং সমস্ত ভ্রমণের যাবতীয় ব্যবস্থাদি দেখাশোনার জন্যে মিস পারভীন।

ঢাকার ইন্টারকনে আমাদের ট্রাভেলিং এজেন্ট এসে জানালো, আমাদের যাত্রা পথ সামান্য বদল করা হয়েছে। প্যারিস

হয়ে যেতে হবে। আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল পর্যন্ত টিকেট ও হোটেল রিজারভেশন সহ সব কিছুই কনফার্মড্। সেদিন বিকেলেই প্যারিসের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করলাম আমরা।

পরদিন পৌঁছে গেলাম প্যারিস। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা রিজ হোটেল। হোটেলের সবচেয়ে ভাল স্যুইটটাই আমাদের জন্যে রিজার্ভ করা ছিল। রাতটা এখানে কাটিয়ে আমরা পরদিন রোম যাত্রা করবো।

মধুচন্দ্রিকার শুরু। কিন্তু আমি যেন শেষ হয়ে গেছি। শেলীর প্রতি আমি কোনরকম দৈহিক আকর্ষণ বোধ করছি না। এদিকে অনিবার্য ভাবে এসে যাচ্ছে রাত। মধুচন্দ্রিকার প্রথম যামিনী।

রাতটা কি এড়ানো যায় না?

বিকেলে বের হলাম শেলীকে নিয়ে। বেড়ালাম এদিক-সেদিক। শেলী খুব উচ্ছ্বসিত। সে আগেও একবার এসেছে প্যারিসে। সাথে ছিল ওর বাবা। এবার সাথে আমি। নানা বিষয়ে আগ্রহ আর উৎসাহের তুঙ্গে সে। সন্ধ্যা নামতেই প্যারিস যেন আরও মায়াবী হয়ে উঠলো। দু'জনে একান্তে বসে এক হোটেলে ডিনার খেলাম। ওঠার আগে বললাম, 'শুনেছি, প্যারিস নাইট ক্লাবের নগরী। এ সুযোগে তা একবার দেখলে হতো না?'

হাসলো শেলী। 'ঠিক আছে। চলো যাই। তবে একটা কথা, খুব বেশি দেরি করবো না কিন্তু।'

কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই দেরি করেছিলাম। ওর জন্যে

শ্যাম্পেন আর আমি হুইস্কি নিয়ে বসেছিলাম। স্টেজে চলছিল গান, নাচ। রাত বাড়ার সাথে সাথে নাচ আর নেশা চেপে বসছিলো খদ্দেরদের মধ্যে। বার দু'তিনেক তাগাদা দিয়েছিল শেলী। কানে তুলিনি। শেষ পর্যন্ত শেলীকেও যেন রাতের নেশায় পেয়েছিল। বললো, 'চলো নাচি।'

'চলো।'

হোটেলে যখন ফিরি তখন রাত প্রায় শেষ। আমরা দু'জনেই তখন ক্লান্ত। সরাসরি বিছানায় এলিয়ে পড়লাম। শেলী আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর কাপড় বদলে এসে আমার পাশে শুলো। আমি প্রায় দম বন্ধ করে চোখ বুঁজে আছি। কিছু হয়তো ভাবলো শেলী। তারপর আমার দিকে কাত হয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলো বুকের ওপর। একটা ঠাণ্ডা সাপ যেন আমাকে পেঁচিয়ে ধরলো। সারা শরীর শিরশির করে উঠলো।

'র‍্যাসেল!' অনুরাগ আর আসক্তিতে কাঁপছে ওর গলার স্বর।

'শেলী, আমার কথা শোন, লক্ষীটি।' ওর হাতটা এক পাশে নামিয়ে রাখলাম। 'ক'রাত ধরে জেগে জেগে তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। তোমার শরীর খারাপ করবে। রোম রওনা হওয়ার আগে অন্ততঃ তোমার কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।'

আমার নিরাসক্ত কথায় চমকে উঠলো শেলী। কিন্তু কোন প্রতিবাদ করলো না। নীরবে অন্যদিকে পাশ ফিরলো।

পরদিন বিকেলের ফ্লাইটে আমরা রোমের পথে প্যারিস

ছাড়লাম। সেখান থেকে নেপল্‌স্‌, মোটরে। মিস পারভীন রয়ে গেল সেখানে। আমরা গেলাম সোরেন্টো। ভিসুভিয়স, পম্পি-য়াই, ক্যাপ্রি—সব কিছুই দেখার প্রচণ্ড আগ্রহ শেলীর।

হোটেলটা পাহাড়ের চূড়ায়। জানালা পথে বাইরে তাকালে মনটা ভরে যায়। দূরে নেপল্‌স্‌ উপসাগর আর ভিসুভিয়স। আরো দূরে ক্যাপ্রি দ্বীপের মোহিনী রূপ। হাতছানিতে কাছে ডাকে। অনন্তকাল ধরে বুঝি ওই ডাকেই মানুষ নিজেকে হারিয়ে এসেছে। আমার পাশে এখন যদি রিতা থাকতো, আমিও হারিয়ে যেতাম। সে-হারানোয় বুঝি সুখ আছে।

সারাদিন অনেক উৎসাহ নিয়ে সব দেখে বেড়ালো শেলী। আমার উৎসাহ তেমন না থাকলেও ঘুরতে ফিরতে মন্দ লাগছিল না। সন্ধ্যায় সমুদ্রের ধারে দু'জনে বসলাম। অনবরত কথা বলছিল শেলী। আমি হয়তো সারাটা সময় ধরেই বেশ অন্য-মনস্ক ছিলাম। কারণ, শেলী কি বলছিল তা যদি আপনি জানতে চান, তবে নির্ঘাৎ বিপদে পড়বো।

সমুদ্রের হাওয়া শরীর ও মনে বেশ আবেশ ছড়িয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ শেলীর কথায় সে-আবেশ আমার ভেঙে গেল।

'রাসেল, আমরা কিন্তু আজ তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে যাবো।'

আমি বুঝতে পারলাম শেলীর মনের অবস্থাটা। তবু বললাম, 'কারণটা জানতে পারি ?'

আমার গায়ে শরীরের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে শেলী বললো, 'আমাদের বিয়ের আজ চতুর্থ রাত। কিন্তু তুমি—তুমি আমাকে একবারের জন্যেও কাছে টানলে না। আদর করলে না।'

খুবই সত্য কথা। মেয়ে হয়ে এর বেশি আর কি বলবে ও? তাছাড়া, বাস্তবকে এড়িয়ে আমিই বা ক'দিন থাকতে পারবো? রিতার বিছানায় শুয়ে সেদিনের ভাবনাটার কথা আমার মনে পড়লো। অন্ধকারে মেয়েতে মেয়েতে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? বিশ্বাসটা কি আমার ভুল হয়ে যাচ্ছে না? তবে কেন শেলীর প্রতি আমার এই প্রচণ্ড নিরুৎসাহ?

হোটেলে তাড়াতাড়িই ফিরে এলাম আমরা।

কিন্তু রাতটা,—রাতটা আমার কাছে এক করুণ অভিজ্ঞতা। মনে হচ্ছিল এ রাতের যেন শেষ নেই। কারোই ঘুম হয়নি। আমি শুধু বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করেছি। আমি কি হেরে গেলাম?

পরদিন শেলীকে বেশ বিষণ্ণ, বিধ্বস্ত লাগছিল। আমাকেও।

সোরেন্টোতে আমাদের তিন দিন থাকার কথা ছিলো। কিন্তু আমরা থাকলাম না।

'এখানকার দেখার জায়গাগুলো লোকজনে ঠাসাঠাসি। ভীষণ রকম একঘেয়ে লাগে। তুমি কি আরও কিছু দেখতে চাও? যদি আপত্তি না থাকে, তবে চলো, আমরা জাহাজে চলে যাই।'

'ঠিক আছে।' শেলী আমার দিকে চেয়ে হাসতে চেষ্টা করলো। 'তোমার ভালো না লাগলে থাক। আমার আপত্তি নেই।'

মনে হলো, আমার বিরক্তির ভাবটাকে শেলী যথেষ্ট আমল

দিল। আমাকে খুশি করার ওর প্রচেষ্টা সত্যি খুব করুণ।

বিকেলেই জাহাজে চলে এলাম। জাহাজের দোরগোড়ায় মিস্ পারভীনকে দেখে চমকে উঠলাম। ইউরোপীয় পোশাকে সে সত্যি এক চমক। শাড়ীতে জড়ানো সাদামাটা পারভীনকে এমনটা এর আগে মনে হয়নি। পরনে টিয়ে রং এর স্কার্ট। মাথায় হ্যাট। চোখে সানগ্লাস। বেশ ফিটফাট, সতেজ পরিচ্ছন্ন। কোথাও হয়তো বের হচ্ছিলো।

আমাদের দেখে থমকে গেলো পারভীন। চোখে মুখে একরাশ প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে এলো গাড়ির কাছে। দরজা খুললো। আমি হাসলাম ওর দিকে চেয়ে। মুখ ঘুরিয়ে নিলো পারভীন।

শেলীর পেছন পেছন সে জাহাজের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। হঠাৎ ওর লম্বা লম্বা পায়ের মসৃণ সৌন্দর্য দেখে আমি সচেতন হলাম। যাক বাঁচা গেল। জাহাজে অন্ততঃ সঙ্গ পাবার মতো একজন সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী মেয়ে থাকছে। আর যাই হোক, সারাক্ষণ শেলীর বকবকানীর দুর্ভোগ পোহাতে হবে না।

প্রমোদ জাহাজ নয়, যেন যুদ্ধ জাহাজ। বিরাট। আরো বিরাট এর বিলাস-উপকরণের ব্যবস্থা। ওপরের ডেকে আমাদের স্যুইট। বিরাট একটা শোবার ঘর। দু'টো বিছানা। দু'টো স্নানঘর। শোবার ঘরের লাগোয়া একটা সাজঘর। সাজঘরেও একটা সুন্দর বিছানা। পাশে আরেকটা বসার ঘর, বেশ বড় এবং সুসজ্জিত।

'তোমার পছন্দ হয়েছে ?' শেলী যেন কেমন দ্বিধাগ্রস্ত।

'সে আর বলতে!' আমি শেলীর দিকে চেয়ে সুন্দর করে

হাসলাম। 'তোমার পছন্দ আছে বটে।'

'আমি জানতাম, তোমারও পছন্দ হবে।'

সাজঘরে উঁকি দিলাম আমি। বললাম, 'এ ঘরটাও খুব চমৎকার। আমি বরং এখানেই শোব, শেলী। মাঝের দরজাটা খোলা থাকবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমরা কথা বলতে পারবো।'

'রাসেল—'শেলীর গলার স্বর যেন নিষ্প্রাণ।

'আমার শোয়া খুব খারাপ, শেলী। খামাকা তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কি লাভ বলো?'

আমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা শেলীর চেহারাটা ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় দেখলাম। আমার কথায় ততক্ষণে চুপসে গেছে শেলী। খুশি খুশি ভাবটা উবে গেছে। আর সেই সুযোগে ওর চেহারার কুৎসিত ছাপটা প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে।

'রাসেল, আমি চেয়েছিলাম, তুমি আমার পাশেই শোবে।'

যতই নির্মম হোক, ওর চাওয়াটাকে এখনই চিরদিনের জন্যে শেষ করে দিতে হবে। ঝট্ করে ওর দিকে চাইলাম।

'দেখ, শেলী, বিবাহিত জীবনে দেহের মাখামাখির চাইতে সাহচর্যটাই আমার বেশি পছন্দ। ঠিক তুমি যেমনটি চাও। সত্যিকারের প্রেম যেখানে, সেখানে দৈহিক সম্পর্ক একদম তুচ্ছ ব্যাপার। তুমিও যেমন, আমিও তেমন। আমাদের উভয়ের কাছে প্রেমটাই মুখ্য, ভাস্বর। সুতরাং নিছক শোয়া নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামানোই ভাল।'

শেলী যেন আর দাঁড়াতে পারছিল না। কাঁপছিল।

ডান হাতটা আমার দিকে একটু তুলে বললো, 'কিন্তু, রাসেল...'

'তুমি একটু বিশ্রাম করো, শেলী। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই পোশাকটা বদল করে আসছি।' আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম না সে-ঘরে। সাজঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

স্নান করতেই শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে গেলো। জামা-কাপড় পরে ডেকের রেলিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালাম। উপসাগরের বুকে ছোট ছোট ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ধীরে ধীরে একটা অস্বস্তিবোধ আমার মাঝে ছড়িয়ে পড়লো। ওর সঙ্গে অমন ব্যবহার করা ঠিক হয়নি। শত হোক, আমার বিবাহিতা স্ত্রী। এটা তার স্বাভাবিক ইচ্ছা। দাবী। একটা মেয়ের শাশ্বত কামনা। রোগা বা অসুন্দরের ব্যাপারটা এখানে অর্থহীন। খুবই গৌণ।

বুঝি সবই, কিন্তু আমার মন যে সায় দেয় না। দৈহিক সম্পর্কের কথা মনে হলেই এক অপ্রতিরোধ্য শীতলতা এসে আমাকে বরফ করে দেয়।

জাহাজের গায় ঢেউগুলোর আছড়ে পড়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পারভীনের কথা মনে ভেসে এলো। আর আশ্চর্য, একটু পরেই চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো পারভীন।

'এই যে, মিস পারভীন, আপনার জন্যে কি করতে পারি বলুন ?'

'সব কিছুই ঠিক আছে। আমরা কি তাহলে ভেনিস রওনা হতে পারি ?'

আমার সম্ভাষণকে সে সযত্নে এড়িয়ে গেল।

'কাল সকালে ভাবলে কি অমন কোন ক্ষতি হবে ?'

'ঠিক আছে।'

চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালো পারভীন।

'কি হলো, কোথায় যাচ্ছেন ? আসুন, একসঙ্গে বসে কফি খাওয়া যাক।'

পারভীন ঘাড় ঘুরিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালো।

'দুঃখিত, মিঃ রাসেল।'

ডেকের ওপাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো পারভীন।

ওর চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে এই প্রথম অনুভব করলাম, পারভীনের নিতম্বে এক অনুপম দোলানী রয়েছে। আমার শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলোতে খুব দ্রুত রক্ত চলাচল আরম্ভ হলো। আমার মাঝে কি এ কোন নতুন জাগরণ ?

-

রাতে ডিনার শেষে আমি আর শেলী ডেকে বসলাম। মাথার ওপর তারায় তারায় ছাওয়া আকাশ। অল্প অল্প বাতাস সাগর জলের গা ছুঁয়ে উঠে আসছে। একটা শীতল পরশ। মন কেড়ে নেয়া সুন্দর রাত। রোমান্টিক। তবে এমনি সময় মনের মতো মেয়ে থাকতে হয়। এমন পরিবেশে শেলী আমার মনে কোন চাঞ্চল্যই আনতে পারলো না।

হঠাৎ পারভীনের কথা মনে হলো। কি করছে বেচারী ? সে তো একা একা। ওকে একটু সঙ্গ দিলে কেমন হয় ?

দু'গ্লাস ব্র্যাণ্ডি দিয়ে গেলো বেয়ারা।

ক্রমেই একটা প্রবল ইচ্ছা পারভীনের কাছে যাবার জন্যে

আমাকে তাড়া দিতে লাগলো। শেলীকে বললাম, 'একটু হেঁটে আসি।' উঠে দাঁড়ালাম।

শেলীও উঠতে চাইল। কিন্তু হাত লেগে ব্র্যাণ্ডির একটা গ্লাস মেঝেতে পড়ে ঝনাৎ করে উঠলো।

আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে বললাম, 'আহা-হা, তুমি আবার উঠতে চাইছো কেন? এখানে বসেই তুমি বিশ্রাম নাও। তুমি খুব ক্লান্ত।'

ওকে বসিয়ে দিলাম চেয়ারে। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি মোটেও ক্লান্ত নই।'

'তুমি বললেই হলো। তোমার চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তোমাকে অসম্ভব ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

ক্লান্ত দেখাচ্ছে বলতেই শেলী আবার চুপসে গেল। মলিন মুখটা ঘুরিয়ে নিলো।

'ঠিক আছে, আমি না হয় বিছানাতেই চলে যাই।'

'সেই ভালো। তুমি যাও, আমি আসছি বলে।' ওর মাথায় বার দু'য়েক হাতটা বুলিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় পেছন ফিরে ওর দিকে একবার চাইলাম। তেমনি মাথা নিচু করে নিশ্চল বসে আছে শেলী। দূর থেকে ওকে খুব অসুখী লাগছে। ওসব কিছু না। দেশে ফিরে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার আর ওর কাজের জগতটা তখন আলাদা হয়ে যাবে। সামাজিক কাজ, বন্ধু-বান্ধব আর এখানে ওখানে নিমন্ত্রণ রক্ষার মাঝে ওর সময় কাটবে। আর আমার সময় কাটার জন্যে রয়েছে নিজের প্রচুর কাজ

আর রিতা। আসলে মধুচন্দ্রিকার নামে এমন লম্বা বেড়ানোর ব্যবস্থা না করলেই ভালো হতো। উহু, বছরের পর বছর যদি এভাবে আমাদের এক সাথে কাটাতে হয়, চিন্তাটা মাথায় দ্রুত খেলে গেল, আমি নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যাবো।

সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে নিচটা দেখলাম ভাল করে। ওপরের তুলনায় নিচটা বেশ অন্ধকার। জাহাজের বারে কিছুটা মৃদু গুঞ্জন। সিঁড়ির পাশেরই একটা কেবিনে দু'জন রামি খেলছে। আমার বেয়ারাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখছে। একটু দূরে লাউঞ্জের দিকে নজর পড়তেই দৃষ্টি আটকে গেল। পারভীন। হ্যাঁ, পারভীনই—অন্ধকার লাউঞ্জ দিয়ে হেঁটে গিয়ে আলোতে দাঁড়ালো। রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে আকাশ দেখলো। হালকা রংয়ের শাড়ী পরনে। চুলগুলো বেণী করা, পিঠের ওপর পড়ে আছে। বেচারী, একা। সিঁড়ি থেকে নেমে দু'পা এগিয়েছি, দেখি, একজন পুরুষ লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে ওর পাশে দাঁড়ালো। আমি সরে গেলাম একটু আড়ালে। লোকটি জাহাজের সেকেণ্ড অফিসার।

কথা বলতে বলতে সেকেণ্ড অফিসার ভদ্রলোক পারভীনের একদম গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। একথা সে-কথার পর সে পারভীনের হাতের ওপর হাত রেখে বললো, 'চলো, আমরা একটু নাচি।'

পারভীন নিজের হাতটা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, 'তোমাদের ওসব নাচ আমার ভালো লাগে না।'

ধেৎ, কোথায় এলাম ওকে একটু সঙ্গ দেবো বলে, আর আমিই এখন একা। ফিরে গেলাম স্যুইটে। আমি যেন ঈর্ষা

কাতর হয়ে পড়লাম।

খুব ধীরে ধীরে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। আলো জ্বাল-লাম না। মাঝের দরজাটা খোলা। ওপাশের অন্ধকার থেকে একটা ফোঁপানির শব্দ আসছে। বুঝলাম, কাঁদছে শেলী।

ঘুম যখন ভাঙলো, তখন দু'টো। উঠে জানালা খুলতেই এক ঝলক রোদ এসে আছড়ে পড়লো ঘরে। সাঁতারের পোশাক পরে ডেকে বেরিয়ে এলাম।

সাগরের নীল জল ডাকছে। দেরি করলাম না। রেলিং থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম নীলের কোলে। কিছুটা সাঁতার কেটে জাহাজের ও পাশটার কাছাকাছি যেতেই নজরে পড়লো সাদা টুপি আঁটা একজন সাঁতারুর মাথা। কে ঐ সাঁতারু? আরো কিছুটা কাছে যেতেই চিনলাম, পারভীন।

'সুপ্রভাত, মিস পারভীন। বেশ সকালেই সাঁতারে নেমেছেন দেখছি।'

'সুপ্রভাত। সাঁতার শেষ করে আমি ফিরে যাচ্ছি।'

'আসুন, একসাথে পাশাপাশি কিছুক্ষণ সাঁতার কাটি।'

'দুঃখিত, মিঃ রাসেল।'

আর কোন কথা না বলে সে জাহাজের দিকে এগিয়ে গেল। আমিও গেলাম ওর পাশাপাশি। পারভীন সাঁতারের গতি বাড়িয়ে দিয়ে জাহাজের গায়ে লাগানো দড়ির মই ধরলো। মই বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে গেল।

এক চিলতে সাঁতারের পোশাকে পারভীন যেন আমার

চোখে আটকে রইল। মই বেয়ে ওঠার সময় ওর শরীরের বাঁকগুলো যেন আমার চোখে ঢেউ দিয়ে উঠলো। ভেজা পারভীনের গা থেকে জল ঝরছিল। ভিজে আর আঁটো স াঁতারের পোশাকে ওকে আমার মনে হলো, ওর গায়ে এক টুকরো কাপড়ও নেই। বিবস্ত্র। সব মিলিয়ে আমার গলা শুকিয়ে উঠলো।

ওর পেছন পেছন মই বেয়ে উঠতে গিয়েও উঠলাম না। জলের ওপর চিত হয়ে শুয়ে তাকিয়ে রইলাম জাহাজের দিকে।

পারভীন জাহাজের ডেকে উঠে একবারও পেছন ফিরে চাইলো না। দ্রুত পায়ে লাউঞ্জের কাছাকাছি নিজের কেবিনে গিয়ে সে ঢুকে পড়লো।

আশ্চর্য, এমন আকর্ষণ অন্য কোন মেয়ের জন্যে এর আগে বোধ করেছি কিনা মনে পড়লো না।

দারুণ একটা যন্ত্রণা আমাকে দিনে দিনে অত্যন্ত দুর্বল করে দিচ্ছিল। দিনে, রাতে, কোন সময়ই আমি আর এ যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাচ্ছি না। আমার সমস্ত অনুভূতিগুলো শুধুই এক বিন্দুতে ঘুরছে—ওকে আমার চাই। কিন্তু পারভীন কি এর কিছু বুঝতে পারছে? তা নাহলে সে আমাকে চোখের পলকে এড়িয়ে যায় কেন? শেলীর উপস্থিতি ছাড়া আমার কাছে আসে না কেন?

এর মধ্যে তিনটে দিন আর রাত কেটে গেলো। শেলী ছায়ার মতো সারাক্ষণই লেগে আছে। নানাভাবে আমাকে

খুশি করতে চাইছে। আর ওর মাত্রাতিরিক্ত প্রচেষ্টায় আমার পাগল হবার অবস্থা। আমাকে ওর কাছে পাবার দুর্বার ব্যাকুলতায় অন্য কিছুই বুঝতে চায় না সে।

কখনো হয়তো একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচার জন্যে রেলিংয়ের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি, একটু পরেই শেলীও এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। আপন মনে একটু ভাববো তারো উপায় নেই, সে হয়তো পাশে এসে কাঁধে হাত রাখে। অসহ্য অবস্থা। এরই নাম কি মধুচন্দ্রিকা ? জানলে কিছুতেই আসতাম না।

সন্ধ্যার একটু পরে লুকিয়ে নিচের ডেকে এসেছিলাম। আশা, যদি পারভীনের দেখা পাই। তাকে যেমন করেই হোক, একা পেতে মন ভীষণ উতলা হচ্ছিল।

কিন্তু সে একা ছিল না। ডেকের আধা অন্ধকারে পারভীন বসা। ওকে ঘিরে জাহাজের ক'জন কর্মচারী গল্প করছে।

ঈর্ষা আর ক্ষোভ নিয়ে ওপরে চলে এলাম। বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পায়চারি করছি। শেলী এগিয়ে এলো। অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বললো,

'রাসেল, তোমাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না। কোথায় ছিলে ?'

'তুমি কি চাও, আমি সারাক্ষণ তোমার আঁচলের ছায়ায় বসে থাকি ?' খিঁচিয়ে উঠলো আমার মন।

'তুমি অমন করে কথা বলছো কেন ?' শেলী চমকে উঠলো। 'আমি কি কখনো তাই বলেছি নাকি ?'

'না বললেও বাকি আর থাকছে কি ?'

আর দাঁড়ালাম না সেখানে। দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে মনে হলো, কাজটা ভাল করলাম না।

বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

কিছুক্ষণ পর শেলীর গলা শুনলাম।

'রাসেল—'

দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছে শেলী।

আমি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করলাম। আর সময় পেলেন না, এখন আহ্লাদ দেখাতে এসেছেন।

'তোমার আবার এত রাতে কি হলো?'

'কিছু কথা ছিলো—'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুললাম। দেখলাম একটা চেয়ারে বসে আছে শেলী। স্থির। নিশ্চল।

'আমার কাছে এসে বসো, রাসেল।'

আমার গা'টা জ্বলে যাচ্ছিল। তবু ও ঘরে ঢুকে বিছানায় বসলাম। মনের বিরক্তি চেপে রেখে বললাম, 'বলো, কি কথা?'

'আমাকে একটা সত্যি কথা বলবে, রাসেল?' শেলী সোজা আমার চোখে চোখ রাখলো। 'আমাকে বিয়ে করে কি তোমার মনে কোন অনুতাপ এসেছে? তুমি কি সুখী হতে পারনি?'

একদম সরাসরি আক্রমণ। শেলীর দিক থেকে এ ধরনের আক্রমণ আসতে পারে তা আমি কখনো ভারিনি। তাই

আচমকা এ আক্রমণে তড়কে গেলাম। সাত কোটি টাকা আর আমি। আমি কি সে-টাকার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি না? উদ্দেশ্যটা কি গোড়াতেই ভেস্তে যেতে চললো? বিয়ে করেছি, অথচ সঙ্গে থাকছি না। আমার মাথাটা বেসামাল চক্কর খেলো। অবস্থা যেন এখন-তখন। এখুনি সামাল না দিলে বিপদ হবে।

'তুমি এসব কথা ভাবছো কেন, শেলী? আমার মতো সুখী ক'জনা আছে পৃথিবীতে?'

'কিন্তু তোমার আচার-আচরণ অন্য কথা বলে।' ও তখনো স্থির দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। 'মনে হয় তুমি অসুখী। আমাকে ঘৃণা করো।'

'কি যে বলো তুমি!'

অত্যন্ত সহজ গলায় শেলী আমাকে আমার মনের কথাটা শুনিয়ে দিলো। আমার ত্রাসটা যেন দেখে ফেলেছে। সাংঘাতিক বেগতিক অবস্থা। বিছানা থেকে উঠে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'আমার কাছে এসো না। যা বলেছি আমি ঠিকই বলেছি।' শেলী যেন আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর। 'তোমার ব্যবহারে মধুচন্দ্রিকা নষ্ট হয়ে গেলো। এবং তুমিই তা করেছো। আমি ফিরে যাচ্ছি। যে ব্যবহার করছো, তাই যদি তোমার ইচ্ছে হয়, তবে আমার সঙ্গে তুমি না এলেই খুশি হবো।'

'কি যা-তা বলছো? মধুচন্দ্রিকা নষ্ট করলাম আমি?' আমার গলায় দৃঢ়তা আনলাম। খুব শক্ত ভাবে এখন রুখে

না দাঁড়ালে ওকে দমানো যাবে না। 'ঘুরে বেড়ানোর এক-ঘেয়েমীতে বিরক্তি লাগাটা কি আমার দোষ? দু'জনের ভালো-বাসা যেখানে নিবিড়, সেখানে এটা-ওটা দেখে ঘুরে বেড়ানোর কোন মানে হয়?'

'অবস্থা দেখে মনে হয় না তুমি আমাকে ভালোবাসো।' চাপা রাগে শেলী গুমরে উঠলো। 'শুধু তাই নয়, আমার সঙ্গে তুমি ঘুমাবার প্রয়োজনও বোধ কর না।'

'কি সাংঘাতিক কথা দেখ দেখি। তোমার হাবভাবেই বরং উল্টো মনে হয়েছে, তুমি আমার সঙ্গে ঘুমোতে চাও না।'

'আমি চাই না? আশ্চর্য!' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো শেলী। 'মনে করে দেখো, তুমিই বলেছিলে, দৈহিক দিকটা তোমার কাছে অর্থহীন। আর এখন বেমালুম উল্টো বলে যাচ্ছো।'

'উঁহু, কথাটা ঠিক আমি ওভাবে বলতে চাইনি। আর তা নিয়েই শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে ভুল বুঝলে? সেদিন রাতের ব্যর্থতার কথাটা নিশ্চয় ভুলে যাওনি। ব্যর্থতার কারণ ছিল তোমার শীতল ব্যবহার। সে-রাতে আমার মনে হয়েছিল, তুমি আমাকে সহ্য করতে পারছো না। তা নাহলে, আমার মতো ছেলে, সে কি অন্য ঘরে শোবার কথা ভাবতে পারে?'

'ওহ্, তোমার মুখে কোন কথা আটকায় না, রাসেল। রাসেল, তুমি অমন কথা কি করে বলছো? তুমি যে আমার সাধ, সাধনা, আর তুমি বলছো তোমাকে সহ্য করতে

পারি না।'

'আমার তেমনই মনে হয়েছিল। ভুল বুঝেছিলাম। মনে করেছিলাম, তুমি যেন চাইছিলে আমি অন্য ঘরে শুই।' নির্বিকার আমার গলার স্বর।

'রাসেল, রাসেল আমি যে তোমাকে ভালবাসি!'

'তার মানে, তুমি চাও, আমরা এক ঘরে থাকি?'

সে-রাতে আমাকে কাছে রাখার ব্যাপারে শেলীর আকুলি-বিকুলির কথা মনে পড়ছে। ওর আন্তরিকতায় কোন ফাঁক ছিল না।

'আমি তাই চাই, রাসেল। তুমি?'

এখন, এখন কি বলি!

'আমার দিক থেকে আপত্তির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। যা হয়েছে ভুলে যাও, শেলী। আমাদের দুজনেরই বোকামী হয়ে গেছে। এ নিয়ে আর ভেবে কষ্ট পাওয়ার কোন মানে হয় না।'

'রাসেল...'

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো শেলী।

আমি শুধু ওর টাকার দিকটাই ভেবেছিলাম। আমাকে মাঝে মাঝে এমন সব বোকামীতে পেয়ে বসে যা বলার মতো নয়।

হাত বাড়িয়ে শেলীকে কাছে টানলাম। বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ও। কান্নার বেগ আরো বেড়ে গেলো।

ওকে বুকে চেপে ধরে কিছুক্ষণ পিঠ হাতিয়ে দিলাম।

তারপর কোলে করে বিছানায় নিয়ে গেলাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে দু'হাতে নিজের মুখটা ঢেকে ফেললো।

আমি হাত বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলাম।

নয়

সেই রাত থেকে শুরু।

সাত কোটি টাকার ওপর আমার অধিকার প্রতিষ্ঠার সফল সূচনা। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে তা জিয়িয়ে রাখতে হবে।

আমি সর্বদা সতর্ক থাকতাম। ওকে আর বিদ্রোহ করার সুযোগ দেয়া যাবে না। কোনরকম সন্দেহ আমাকে কক্ষচ্যুত করুক, তা আমি হতে দিতে পারি না।

বিশ্বাস করুন, এ ছিল আমার জন্যে এক কঠোর সাধনা। কারণ আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম, ওর এই ভয়ঙ্করী প্রেম শুকিয়ে গেলে আমার মহা বিপদ। ওর মাঝে সামান্যতম হতাশার জন্মও ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেবে আমার জন্যে।

কাছাকাছি পারভীন না থাকলে অবশ্য এটা আমার জন্যে আরও অনেক সহজ হতো। কিন্তু জাহাজে ওর উপস্থিতিটা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছিলাম না। তাকে কাছে পাবার কোন রকম উপায়ও ছিল না। কেননা শেলী সকাল

থেকে রাত অব্দি আদুরে বেড়ালের মতো সর্বদা আমার গায় লেপ্‌টে আছে।

আমাকে অসহায়ের মতো দেখতে হচ্ছে পারভীন জাহাজের অফিসারদের সাথে হেসে-খেলে গল্প করছে, সময় কাটাচ্ছে। জাহাজের কৃত্রিম পুকুরে সাঁতার কাটছে। দেখতে হচ্ছে, এক ঝলক এসে শেলীর সঙ্গে দু'চারটে কথা বললো, আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিতম্বে ঢেউ তুলে আবার নিচে চলে গেলো। দেখতে দেখতে আমার মন বাঁধন হারা হয়ে যেতে চাইতো। ওর সাঁতারের পোশাকে ফুটে ওঠা দেহ বল্লরীটা থেকে থেকে আমার চোখে দোলা খেতো। অথচ ওকে একান্ত-ভাবে কাছে পাবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু আমার মন এত উতলা হচ্ছে কেন? ও আমাকে উপেক্ষা করছে বলে?

আমরা ভেনিস পৌঁছে বিখ্যাত হোটেল ভিত্তিতে উঠলাম। সুন্দর ব্যবস্থা। আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট স্যুইটটায় দুটো শোবার ঘর, একটা বড় বসার ঘর, দুটো বাথ, অন্যান্যদের থাকার জন্যে আরও দু'টো ঘর।

স্নান সেরে পোশাক বদলে এসে শেলীর পাশে দাঁড়ালাম। শেলী তখন বারান্দা থেকে ক্যানাল দ্য সান্‌মারকোর দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। আমাকে পাশে দেখেই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

'রাসেল, দেখো, কি চমৎকার! ওই ছোট ছোট নৌকোগুলো দেখো, গণ্ডোলা আর দূরের ঐ প্রাসাদ। সত্যি অপূর্ব!'

'চলো, দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর একটা ছোট নৌকা নিয়ে ক্যানেলটায় বেড়িয়ে আসি।'

বিকেল আর সন্ধ্যে কাটলো ক্যানেলের বুকে, নৌ-বিহারে।

ডিনারের কিছু আগে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। শেলী চলে গেলো ওপরে পোশাক বদলাতে। আমি লাউঞ্জের এদিক ওদিক দেখছিলাম। হঠাৎ লাউঞ্জে পারভীনকে দেখে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম।

'শুভ সন্ধ্যা, মিস পারভীন!'

'শুভ সন্ধ্যা, মিঃ রাসেল।'

চশমার ফাঁকে কালো চোখ দু'টি তুলে পারভীন আমার দিকে তাকালো। মনে হলো, ওরকম কালো চোখ বুঝি আর কখনো কারো দেখিনি।

'কি করছিলেন?' আমি ওর আপাদমস্তক দেখলাম। সাধারণ একটা ছাপার শাড়ীতে নিজেকে ঢেকে রেখেছে। শাড়ী পরার মধ্যে যে একটা শিল্প আছে তা যেন সে জানে না। অথবা দেহের সুন্দর গড়নটা কাউকে সে বুঝতে দিতে চায় না।

'মুরানোয় কাঁচের কারখানা দেখতে যাওয়ার ব্যবস্থা করলাম।'

'সে আবার কবে?'

'পরশু বিকেলে।'

'আপনি যাচ্ছেন তো আমাদের সঙ্গে?'

'আমি...না,' বলেই যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

'কি হলো, দাঁড়ান একটু।' ওর বাম হাতের কব্জিটা

ধরে ফেললাম।

পারভীনের মাঝে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঝট্‌কা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিলো। তারপর আমার দিকে তাকালো।

তাকিয়ে রইলাম দু'জনে দু'জনের দিকে। অনেকক্ষণ। অপলক।

ওর তাকানোতেও যেন আমার মাঝে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। রক্তে বইলো দোলা। মুহূর্তের জন্যে ওর চোখে দেখেছিলাম সে-ঝিলিক। এ সেই দৃষ্টি, যে দৃষ্টিতে শুধু ব্যাকুল নগ্ন কামনা। নগ্ন আহ্বান। মেয়েদের এ দৃষ্টি পুরুষকে স্বাগত জানায়—এগিয়ে এসো, আমি লভ্য।

'আমার কাছ থেকে দূরে থাকুন।'

দৃষ্টিটা যেমন মুহূর্তের জন্যে এসেছিল, তেমনি মুহূর্তের জন্যে মিলিয়ে গেল।

দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে চলে যাওয়া পারভীনের দিকে চেয়ে আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এ যেন এক শানিত ছুরি। চক্ষের নিমেষে লংকাকাণ্ড বাধিয়ে বসতে পারে। আর তাইতেই যেন আমি আরও কামনায় কাতর হয়ে পড়ছি।

এ কাতরতা শুধুই কি একা আমার ?

মনে হয় না।

পরদিন বিকেলে কাফেতে বসে কফি খাচ্ছিলাম। আলাপ হচ্ছিল নৌকোয় চেপে লিডোয় বেড়াতে যাবার কথা নিয়ে। এ ব্যাপারে শেলীর বেশি উৎসাহ।

'রাসেল, আমি একটা কথা বলতে চাই, কিছু মনে করবে না তো?'

'বলো।'

'আজ আমাদের সাথে পারভীনকে নিয়ে যেতে চাই।'

'হঠাৎ ওকে টানছো কেন?'

'ভাবছি, ওর প্রতি আমরা খুব অবিচার করছি না তো? বেচারী একা একা থাকছে। অবশ্য তুমি যদি পছন্দ না করো, তবে থাক।'

'তুমি নিতে চাইলে আমার কোন আপত্তি নেই।' অন্য দিকে তাকিয়ে চোখ মুখের নিস্পৃহ ভাবটা বজায় রাখতে হলো। 'তুমি সত্যি বুদ্ধিমতী, ওর কথা তুমি ঠিকই ভেবেছো।'

আমার কোন রকম আগ্রহ প্রকাশ না হওয়াই ভালো।

'আরো আগেই ওর দিকটা আমার ভাবা উচিত ছিল। অবশ্য এমন আনন্দ বিহারে সে খুব সহজ-স্বাভাবিক হতে পারবে বলে মনে হয় না। ও একটা আস্ত হাঁদা। তবে আমার খুবই পছন্দ ওকে। একটু সাজগোজ করে থাকতে প্রায়ই বলি, কিন্তু তাতে ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। এই একটা ধরন আর কি।'

তাড়াতাড়ি ডিনার শেষ করে আমরা খেয়া ঘাটে এলাম।

পারভীনও এসেছে। সাজ-পোশাক সম্পর্কে ওর কোন রুচি নেই, সে কথা প্রমাণের জন্যেই মনে হলো একটা খাপ-ছাড়া পোশাক পরেছে। টান টান করে পেছনে বাঁধা চুল আর চশমা—সে যেন খুবই নগণ্য।

বেশ বড় একটা নৌকা নিলাম আমরা। ভেতরে চেয়ার টেবিল সাজানো সুন্দর কেবিন।

শেলী আর আমি পাশাপাশি। নৌকা মন্থর গতিতে দোল খেয়ে চলেছে। আমাদের থেকে একটু দূরের চেয়ারে পারভীন। আধো আধো অন্ধকার।

অনবরত কথা বলছে শেলী। আমি আর পারভীন নীরব।

সে নীরবতার মাঝেও আমি, আমি যেন প্রচণ্ড ভাবে অনুভব করছি পারভীনকে। মনের কামনার গোপন বেতার তরঙ্গ যেন ওর শরীরের মদির গন্ধ এনে আমার হৃদয় আকুল করে তুলছে।

আমার মনে কেবলই ঘুরছে···দড়ির মই, ভেজা সাঁতারের পোশাক, দেহের ধারালো ভাঁজ, নিতম্বের ঢেউ খেলানো দোল।

অপর তীরে পৌঁছে গাড়ি নিয়ে আমরা একটা হোটেলে উঠলাম।

কিছুক্ষণ পর আমাদের দু'জনকে নিয়ে শেলী বলরুমে ঢুকলো। শেলীর নাচের ভীষণ সখ। পারভীনকে একা একটা টেবিলে বসিয়ে আমরা নাচতে শুরু করলাম।

শেলীর সঙ্গে এই প্রথমবারের মতো নাচতে গিয়ে আমার বিরক্তি চরমে উঠলো। কিন্তু করার কোন কিছু ছিল না। কোন রকম ফন্দি ফিকিরও মাথায় এলো না। পারভীনের কথা একবার বলবো ভেবেছিলাম, কিন্তু এ সময়ে ওর কথা বলা সমীচীন হবে বলে মনে হলো না।

অসহায়ের মতো নাচলাম কুড়ি মিনিট। টেবিলে ফিরেই শেলী হঠাৎ আবার পারভীনের একাকীত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলো।

'রাসেল, তুমি যদি অন্য কিছু না ভাবো, তবে পারভীনকে একটু সঙ্গ দাও। যাও পারভীন, রাসেলের সাথে একটু নাচো।'

চকিতে পারভীন শেলীর দিকে তাকালো।

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি···নাচবো না। এই তো বেশ ভালো লাগছে।'

'নাচবে না তুমি?'

'নাচ আমার ঠিক আসে না।'

'নাচটা শেখা তোমার উচিত ছিল, পারভীন।' শেলী যেন নিজের অহমিকায় উচ্চকিত হয়ে উঠলো। 'অবশ্য তোমার কাছে অতটা আশা করা যায় না। চলো রাসেল, নতুন এ সুরটা আমি ছাড়তে চাই না। সুরটা আমার খুব পছন্দ।'

সুরের পর সুর। বিটের পর বিট। নাচের পর নাচ। শেলীর যেন ক্লান্তি নেই। নাচ যেন ওর সহজাত। আমি অবাক হলাম ওর নাচের নেশায়। ঘড়ির কাঁটা তখন মাঝ-রাত গড়িয়ে গেছে।

অবশেষে আমরা রওনা হলাম। সারাটা পথ শেলীর বক্‌বক্‌ শুনতে শুনতে হোটেলে পৌঁছলাম শেষ রাতের কিছু আগে।

হোটেলে পৌঁছে পারভীন সুন্দর সন্ধ্যাটির জন্যে শেলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের রুমে চলে গেল।

শেলী কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বললো, 'মেয়েটার জন্যে খুবই কষ্ট লাগে। সব সময় নিজেকে গুটিয়ে রাখার প্রবণতা মেয়েটার।'

'তোমার দেখছি ওকে নিয়ে অনেক ভাবনা। আসল কাজ

কর্ম কেমন করে ?'

'কাজ কর্মে পারভীন খুবই তুখোড়। টিপটপ। ওর আসার আগের লোকগুলো আমাকে প্রায় পাগল করে তুলেছিল।'

'কতদিন হলো এসেছে ?'

'তিন বছর হতে চললো। সাজ-গোজের প্রতি ওর অনীহা, কিন্তু এদিক থেকে ভালই হয়েছে। তা নাহলে এতদিনে ওর বিয়ে হয়ে যেতো, আর আমি তার মতো একটা কাজের মেয়েকে হারাতাম।'

'তা যাই বলো না কেন, দু'দিন আগে আর পরে, ওকে তোমার একদিন হারাতেই হবে।'

'তা হয়তো হবে না,' আমার মুখের দিকে তাকালো শেলী। 'পারভীনকে বলে রেখেছি, উইল করার সময় ওর প্রতি আমি সুবিচার করবো। এ ধরনের কাজের লোকদের সম্পত্তির কথা বললে তারা সারা জীবনের জন্যে টিকে যায়। তারা মিয়াকেও ওই উইলের কথাই এতদিন টিকিয়ে রেখেছে।'

'পারভীন তাহলে কতটুকু পাচ্ছে ?' প্রশ্নটা করেই নিজেকে বেশ বোকা মনে হলো। আমার আগ্রহটা যদি এতে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

কিছু না বলে শেলী আমার দিকে তাকালো। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা সে-চোখের দৃষ্টিতে।

'সামান্য কয়েক হাজার মাত্র।'

'সে ঐ সংখ্যাটা জানে ?'

এবার হেসে উঠলো শেলী।

'আরে না, জানবে কি করে? তবে যা পাবে তার অনেক বেশিই ওর কল্পনা। ওরা তাই করে।'

'যাকগে ওসব। এখন শুয়ে পড়ো।'

ক্লান্ত শেলী ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু আমার ঘুম এলো না। বিছানার এ পাশ ও পাশ করছি। মাথায় তখন একটাই চিন্তা।

শেলী তার সম্পত্তির উইল করেছে।

ভাবছিলাম আমার ভাগে কত আসছে।

ওকে তো এতদিন পর্যন্ত আমি নানা ভাবে বুঝাচ্ছি, বলছি নানান্ পরিকল্পনার কথা। এর পেছনে আমার একটাই উদ্দেশ্য, ওর পুরো সাত কোটি নিয়ে কাজ কারবার করা। এ প্রচেষ্টা সফল হবে কিনা জানি না, তবে আমি পিছ পা হচ্ছি না। কিন্তু এখন উইলের কথায় আমার মনে একটা নতুন দিক উন্মোচন হলো। এর সম্ভাবনা একদম উড়িয়ে দেয়া যায় না। উইল যখন শেলী করেছে, তখন হয়তো দেখা যাবে একদিন সমস্ত টাকাই আমার হাতের মুঠোয়। যা খুশি তা করাতে কোন বাধা নেই। আর তা দেখার জন্যে শেলীও থাকবে না।

না, এখনই সিদ্ধান্ত নেবেন না, কমিশনার সাহেব। উইলের কথায় ওর পাশে শুয়ে ওকে খুন করার কোন পরিকল্পনাই আমি করিনি। খুনের কথা মাথায়ও আসেনি। মাথায় শুধু তখন ঘুরছিল, শেলী অসুস্থ হতে পারে,···কোন দুর্ঘটনা,··· স্বাভাবিক মৃত্যুও হতে পারে।

এ হলে কোন ঝামেলাই হতো না। এত ভাবনা চিন্তা,

পরিকল্পনা, প্ররোচনা, হতাশা, অভিনয়—কোন কিছুরই দরকার হতো না। টাকার পাহাড়টার আমি মালিক হয়ে যেতাম।

শুধু,···শুধু মৃত্যু যদি ওকে নিয়ে যেতো!

সন্ধ্যের মধ্যেই কাঁচের কারখানা দেখে হোটেলে ফিরে এলাম। কারখানার প্রচণ্ড গরমে আমরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

'গোসল করলে ভালো লাগবে হয়তো। ওহ্, যা গরম!'

'একদম যাচ্ছে তাই!' ক্লান্ত দেহ সামাল দিতে চেয়ারে বসলো শেলী। চোখের দুপাশের রগ দুটো ডান হাতের আঙুলে চেপে বললো, 'গরমে আমার মাথা ধরে গেছে।'

'কাউকে ডাকবো? মাথাটা একটু টিপে দেবে?'

'না থাক। একটু বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। আজ রাতের প্রোগ্রাম কিছু ঠিক করলে, রাসেল?'

'তোমার যা ইচ্ছে! নৌকায় বেড়াবে তো যেতে পারো।'

গোসল শেষে জামা-কাপড় বদলে নিলাম। বসার ঘরে শেলীকে না দেখে শোয়ার ঘরে গেলাম। শেলী বিছানায় শোয়া। মুখটা ফ্যাকাশে।

'কি হলো তোমার, শেলী? খুব খারাপ লাগছে কি?'

'অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে, রাসেল।'

'গরম বেশ কাবু করেছে বুঝতে পারছি।' ওর মুখের ওপর ঝুঁকে কপালে একটু হাত বুলিয়ে দিলাম। 'একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো, ভাল লাগবে।'

'নোভালজিন খেয়েছি। এখনই যন্ত্রণা চলে যাবে।'

'আমিও তাহলে স্বস্তি পাবো।'

ওর দিকে তাকিয়েই আমার মনে হলো, কি নিখুঁত নাটকের সংলাপ বলে যাচ্ছি।

'এ ফাঁকে আমি একটু নিচ থেকে ঘুরে আসি। দেরি হবে না, এখনই ফিরবো।'

পারভীনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবলাম একটু। তারপর দরজায় নক্ করলাম। দরজা খুলে পারভীন আমাকে দেখে অবাক হলো। চশমা ছাড়া পারভীনকে দারুণ লাগছে।

বললাম, 'ওর খুব মাথা ব্যথা করছে। আপনি কিছু করতে পারেন কিনা দেখুন।'

'আমি এখনই যাচ্ছি।'

'শুনুন, ও হয়তো যন্ত্রণার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়বে। তাহলে আজ রাতে আপনি আমাকে সঙ্গ দেবেন?'

আশ্চর্য, আমার কথায় ওর কোন চাঞ্চল্যই প্রকাশ পেলো না। আমার প্রস্তাবটা যেন গায়ে মাখবার মত নয়।

'মিসেস শেলী আমাকে ওঁর কাছে থাকতে বলতে পারেন।'

'নাও বলতে পারেন। তাহলে ন'টার সময় সান্‌মারকোর বাইরে আমার সঙ্গে দেখা করলে খুশি হবো।'

'সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না।' আর দাঁড়ালো না পারভীন। দ্রুত পায়ে শেলীর রুমের দিকে চলে গেলো।

আমি যেন হঠাৎ করেই বেশ নার্ভাস হয়ে পড়লাম। এমন তো আমার কখনো হয়নি। একটা অজানা আশঙ্কায় আমার

বুকটা কাঁপছে। তাড়াতাড়ি বারে ঢুকলাম। দু'পেগ হুইস্কি নিলাম। হাতটাও যেন কাঁপছে। আস্তে আস্তে চুমুক দিলাম। এ মেয়েটা আমাকে যেমন করে ভাবাচ্ছে, তেমন আর কারো বেলায় হয়নি। তবে মনে হচ্ছিল, পারভীন ন'টায় সেখানে আসবে। আমার অন্তর বলছে···আজ রাত থেকেই শুরু হবে আমাদের যাত্রা।

বার থেকে বেরিয়ে ওপরে গেলাম। দরজার সামনেই শেলীর ঝিকে পেলাম। সেই জানালো যে শেলী এখন ঘুমোচ্ছে।

'ঠিক আছে, তুমি কাছাকাছি থেকো। ঘুম থেকে জেগে আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলো, আমি বাইরে গেছি।'

হোটেল ছেড়ে পথে নামলাম। হাঁটছি। এ ক'দিনে পথটা মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে। খালের ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছি। রাতের ভেনিস নগরী যেন মায়াবিনী। ডোগস্ প্রাসাদ পেছনে ফেলে পন্টি-ডিলা-প্যাগলিয়র হয়ে সানমারকো স্কোয়ারে পৌঁছলাম।

চারদিকে দারুণ ভিড়। সবাই হাঁটছে আর আলো শোভিত দোকান দেখছে। রেস্তোরাঁগুলোতে হট্টগোল। লোকজনের হৈ-চৈ-এর সাথে সাথে কানে আসছে যন্ত্র সংগীতের শব্দ।

আমি একটু নিরালা জায়গা, সানমারকোর ফটকটার সামনে দাঁড়ালাম। মনে যথেষ্ট উদ্বেগ। বারবার ডানে-বাঁয়ে দেখছি। টাওয়ার ক্লকে তখন প্রায় ন'টা বাজে বাজে।

আমার মন বলছে পারভীন আসবেই।

ন'টার ঘণ্টা পেটার শব্দ শুনলাম।

ঘড়িটা থেকে চোখ নামিয়ে বাঁ দিকে তাকাতেই বুকটা ধড়াস করে উঠলো। রহস্যময় হাসি মুখে পারভীন দাঁড়িয়ে। ঝলমলে পরিপাটি পোশাক। সুবিন্যস্ত চুল। কালো চোখ জোড়া মিটি মিটি জ্বলছে।

'মিস্ পারভীন! আপনাকে যে চেনাই যাচ্ছে না?' আমার চোখে অবাক চাহনি।

'এদিকে আসুন, মিঃ রাসেল।' বলেই সে চলতে শুরু করলো।

জলের ধারে সিঁড়ি বাঁধানো চত্বরে গিয়ে দাঁড়ালাম দু'জনে। সামনেই একটা কেবিনওয়ালা নৌকো বাঁধা ছিল। আমরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতেই গনডোলার মাঝি আমাদের স্বাগত জানালো। আমরা নৌকার ছোট্ট কেবিনটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। পর্দাটা টেনে দিলাম। আবছা অন্ধকার আমাদের চারদিকে ঘিরে ফেললো। এই অন্ধকারে আমি আর পারভীন। পারভীন আর আমি। নৌকোর গতিময় দোলার মাঝে আমরা দু'জন। আমার সামনে পারভীন ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা। ওর হাত আমার হাতের ওপর। কাছে টানলাম ওকে।

'সেই সাঁতার কাটার ভোর থেকে এ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তোমার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছি।' একটু চুপ থেকে বললাম, 'এ এক অসহ্য প্রতীক্ষা, পারভীন।'

'এখন ওকথা থাক, রাসেল।' ওর গলা যেন শুকিয়ে গেছে। 'কোন কথা নয়, আমাকে শুধু অনুভব করতে দাও।'

পাগল হয়ে গেলাম দুজন। সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করলাম

দুজন দুজনকে। এ যে কী তৃপ্তি ভাষায় বোঝানো যাবে না।

আমাদের নৌকোটা ধীরে ধীরে চলছে। ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে আপন লয়ে দুলছে। দুলছে আমাদের অনুভূতিগুলো। এক সময় আমার পিঠ খামচে ধরলো পারভীন, প্রাণপণে চেপে ধরলো বুকের সাথে।

সমস্ত নীরবতা ভেঙে দূর থেকে টাওয়ার ক্লকের সাড়ে ন'টা বাজার শব্দ এসে আমাদের একান্ত সান্নিধ্যের মাঝ-খানে আছড়ে পড়লো।

পারভীন নড়ে চড়ে উঠলো। 'সাড়ে ন'টা! আর থাকা যাবে না।' পর্দা তুলে মাঝিকে ঘাটে নৌকো ভিড়াবার জন্যে ইশারা করলো।

'ফেরার জন্য এত ব্যস্ত হলে কেন? রাতটা তো আমাদের জন্যে রয়েছেই। এত তাড়াতাড়ি আমি তোমাকে ফিরতে দিচ্ছি না।' ওর কোমরে হাত রাখলাম। টেনে আরো কাছে নিলাম। 'ভালো লাগছে না তোমার? এমন সুন্দর রাত…।'

'ভালো লাগলেও উপায় নেই। তুমি ইচ্ছে করলে থাকতে পারো, কিন্তু আমাকে ফিরতেই হবে। ঘুম ভাঙলেই ও আমাকে পাশে দেখতে চাইবে।'

'এত তাড়াতাড়িই কি ওর ঘুম ভাঙবে?'

'ওকে আমার চেয়ে তুমি বেশি চেন না। ঘণ্টা খানেকের বেশি ও ঘুমোবে না।'

'কিন্তু পারভীন… আমার যে তোমার সঙ্গে অ-নে-ক কথা

ছিল।'

পারভীন ওর ডান হাতটা আমার কাঁধে রাখলো। মৃদু ধাকা দিল।

'রাসেল!'

'বলো, পারভীন।'

'আমাদের যে কথা বলার সময় নেই। হয়তো কোনদিনই তা পারবো না।'

'পারভীন…।'

'আমরা শুধু মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্যে কাছে আসতে পারি, সুযোগ পেলে প্রেম করতে পারি। তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে ধরা পড়তে চাও না নিশ্চয়ই?'

আমি চুপ করে রইলাম।

'কি হলো, কথা বলছো না কেন? ধরা পড়তে চাও তুমি?'

'না না পারভীন, তা আমি চাই না।' মুহূর্তে সাতকোটি টাকার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ আমার মাথায় চক্কর খেলো।

'আমিও তা চাই না। রাসেল, তোমাকে একটা কথা বলবো। আমার কথা মতো চলতে পারলেই এ সম্পর্ক থাকবে, তা নাহলে দু'জনকেই সব ভুলে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে আমি চাকরীটা হারাতে রাজী নই।'

'এ শুধু প্রেম নয়, পারভীন, তারও চেয়ে বেশি কিছু—তুমি আমায় পাগল করে তুলেছ।'

ওর হাতটা আমার কাঁধ থেকে নেমে গাল বেয়ে চিবুকের

কাছে এসে থামলো। সরু সরু আঙ্গুলগুলোকে আমার চিবুকের দু'ধারে আলতো করে চেপে থাকলো।

'আমারও যে ঐ একই অবস্থা, রাসেল। তুমি ভীষণ টানো আমাকে। তবে কোনরকম ঝুঁকি নিতে আমি চাই না।'

'আমার জন্যে কি তুমি···'

'আমার কথা শোন, রাসেল।' আমার ঠোঁটের ওপর ওর অনামিকাটা চেপে ধরলো। 'আবার একটা সুযোগ বের করে নেবার দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও। আশা করি উতলা হবে না।'

'ঠিক আছে। এ সুযোগটা কিন্তু আমিই বের করেছিলাম।' ওর মুখের ওপর আমি একটু ঝুঁকে পড়লাম। 'শেলীর মাথার যন্ত্রণা শুরু হতেই তোমার কথা আমার মনে হলো।'

'তাই বুঝি?' মিষ্টি করে হাসলো পারভীন। 'ওর মাথার যন্ত্রণা দিলো কে? যন্ত্রণা না হলে তুমি কিছুই করতে পারতে না।'

চমকে উঠে মুখটা পিছিয়ে নিলাম আমি। আমার সারা শরীর বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত যেন নেমে গেলো। জড়িয়ে থাকা হাতটা হয়ে গেল শিথিল।

'কি বলছো তুমি—পারভীন?'

'কেন, আমার কথা কি বুঝতে পারছো না? এ রকম মাথা ধরা ওর নতুন কিছু নয়। আমি যখন ওকে আর কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। তখন একটা বড়ি খাইয়ে দিই। ওতেই ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই সাথে প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হয়। তবে আর কোন ক্ষতি হয় না।'

'ক্ষতি করে না তুমি ঠিক জানো? 'আমার কাছে যেন কেমন ঠেকলো ওর কথা।

'জানি বৈকি! নির্দোষ এই জিনিসটি আমার এক ডাক্তার বন্ধু দিয়েছিল। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, এতে ওর মৃত্যু হবে না। তুমি কি তাই বোঝাতে চাইছো?'

'তাই। ওষুধ নিয়ে এ ধরনের খেলা বিপদ ঘটাতে পারে।'

'তাহলে ... এমন ঘটনা মানে আমাদের দেখা হওয়া আর তুমি চাও না?'

ওর প্রত্যয় ভরা কণ্ঠস্বরে আমি চমকে উঠলাম।

'তুমি কি শেলীকে খুব ঘৃণা করো, পারভীন?'

'ঘৃণা ... হ্যাঁ রাসেল, তুমি যতটুকু করো, তার চেয়েও আমার বেশি ঘৃণা ওর ওপর।'

'কেন, সে তোমার কি ক্ষতি করলো?'

'কোন ক্ষতি করেনি। অন্য সবার প্রতি যেমন, আমার প্রতিও তেমনিই সে। শুধু যা ওর থাকা উচিত নয়, তা ওর আছে বলে।'

'তারপরও ওর কাজ করছ কেন?'

'তুমি ...তুমি তাহলে ওকে বিয়ে করেছ কেন?'

'তা তো অন্য কথা।'

'অন্য কথা নয়। খুবই সোজা—তুমি বিয়ে করেছ ওর টাকার জন্যে। আমি কাজ করি ওর বিলাসিতার ছায়ায় থাকতে পারি বলে।' কেবিনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো পারভীন। 'আমরা আর মাত্র কয়েক মিনিট একত্রে আছি রাসেল।'

আমার হাতে ওর হাত রেখে আমার দিকে তাকালো সে।

আমি হাত বাড়িয়ে কাছে টানলাম ওকে। চিবুকটা তুলে ধরে আমার মুখটা এগিয়ে নিলাম। একটু থামলাম। দেখলাম ওর কামনাসক্ত ঠোঁট দুটো কাঁপছে। সামনের দিকে প্রসারিত, একটু ফাঁক, যেন মেলে আছে দুটো পাপড়ি। আমার ঠোঁট ওর সে-পাপড়ি দুটো লুফে নিলো। আমার ঠোঁট জড়িয়ে রইলো ওর অধরে। নিবিড়, অন্তরঙ্গ আবেশে।

আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার মাঝে কি ঘটছে। এ যেন আমার প্রথম ভালোবাসা। আকুল প্রেম নিবেদন। আমার রক্তের শিরায় শিরায় প্রলয় নাচন। এ নাচন যেন শেষ হবার নয়।

'রাসেল,···থামো, প্লীজ···আর নয়।' আমাকে ও জোর করে সরিয়ে দিল। তারপর নিজের চুল ঠিক করতে করতে বললো, 'বাস্তব অবস্থাকে আমাদের মানতেই হবে, রাসেল। আজকের মতো সুযোগ আর আমাদের নাও আসতে পারে।'

'জাহাজে?'

'জাহাজে কোন মতেই সম্ভব হবে না। আমার মতো তুমি ওকে চেনো না। ও সন্দেহ বাতিক গ্রস্ত। আর ঈর্ষা তো ওর প্রতি লোমকূপে ঠাসা। সব চেয়ে বিপদ হলো, ও সবরকম গোপন ব্যাপারেরই গন্ধ টের পেয়ে যায়।'

'মনে হয় চৌধুরী ভবনে ফিরে গেলে আমাদের মিলন অনেক সহজ হবে।'

'ও তোমার ভুল ধারণা। সেখানে আরও কঠিন হবে।

দিনের বেলা সে আমাকে কাছে চাইবে, রাতে চাইবে তোমাকে।'

'অন্য কোন সুযোগ বের করে নিতে হবে।'

'যাই করো না কেন, খুব নিরাপদ হতে হবে। তা নইলে আমাদের এই অভিসার একদম বন্ধ করতে হবে।'

সান্ মারকোর সিঁড়িতে নৌকো এসে ভিড়লো।

পারভীন এক ঝটকায় উঠলো। 'আমাকে আগে যেতে দাও।' বলেই সে আমার দিকে ঝুঁকে একটা চুমো উপহার দিয়ে বললো, 'তুমি আমার প্রেম, রাসেল।'

মিনিট দু'য়েক পরে আমিও নেমে পড়লাম। মাঝিকে ভাড়া মিটিয়ে ধীর পায়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলাম। সমস্ত ঘটনাটা আপন মনে ভাবতে ভাবতে হোটেলের দিকে পা বাড়ালাম।

ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমি যেন কোন খেই পাচ্ছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম, পারভীনের সঙ্গে প্রেম আর শেলীর সাথে জীবন কাটানো—দু'টো এক সাথে আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। তবে হ্যাঁ, শেলী যদি মরে যায়, তবে আর কোন সমস্যাই থাকবে না।

বিশ্বাস করুন, এ পর্যন্ত ওকে খুন করার চিন্তা আমার মাথায় একবারও আসেনি।

দশ

খুবই নীরস ভাবে কেটে গেলো কয়েকটা সপ্তাহ। পারভীনের কথাই শেষ পর্যন্ত সত্য বলে মনে হলো। একান্তভাবে কাছে পাওয়া বুঝি আর হবেই না।

ওর সঙ্গে নৌ-বিহারের তিনদিন কেটে যাবার পর আমার ধৈর্য আর কোন বাঁধ মানতে চাইল না। তবু ওভাবেই কাটালাম আরও দুই দিন। তার পরদিন মরিয়া হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম কিছু একটা করবোই।

বাথ রুমে ঢুকে কলটা পুরোপুরি খুলে দিলাম। তারপর পারভীনের ঘরে টেলিফোন করবো বলে টেলিফোন তুললাম।

বিপদ যে ছিল না, তা নয়। শেলী বিছানায়। বিছানার পাশেই একটা টেলিফোন, যেটায় আমাদের কথা সে শুনতে পারে।

কিন্তু বাথরুম থেকে কল খোলা থাকা সত্ত্বেও আমার গলা শেলীর কানে পৌঁছবে ভাবতে পারিনি। আমি পারভীনের

ঘরের নাম্বারটা অপারেটরের কাছে চাইলাম।

পারভীন টেলিফোন তুললো। 'হ্যালো ?'

'আজ রাতে কিছু একটা ব্যবস্থা করো, আমি তা নাহলে মরেই যাবো।'

হঠাৎ রিসিভার তোলার ক্লিক শব্দ শোনা গেলো। শেলী নিশ্চয় রিসিভার তুলেছে। আর পারভীন তা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি রিসিভার রেখে দিয়েছে।

'রাসেল, তুমি কি ফোন করছিলে ?'

আমি চমকে উঠে চুপ করে থাকলাম।

'রাসেল !'

'দিলে তো আমার লাইনটা কেটে !' আমি খুব বিরক্তি প্রকাশ করলাম। 'আমি মিস্ পারভীনকে ফোন করছিলাম।'

'ফোন করছিলে, কেন ?'

কোন উত্তর না দিয়ে ফোন রেখে দিলাম। কল বন্ধ করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। শোবার ঘরে ঢুকে দেখি শেলী বিছানায় বসে আছে। চোখে সন্দেহ ভরা দৃষ্টি।

'পারভীনকে কেন ফোন করেছিলে বললে না তো ?'

আমি হাসতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাতেও শেলীর কোন ভাবান্তর নজরে পড়লো না। ভেতরে ভেতরে আমাকে একটা অজানা ভয় আঁকড়ে ধরলো।

'তোমাকে একটা চমক দেবার ইচ্ছে ছিলো আমার !'

'পারভীন তাহলে অমন ব্যস্ত ভাবে ফোন ছেড়ে দিলো

কেন ?'

'সে ছাড়বে কেন ? তুমিই তো লাইনটা কেটে দিলে।'

'শব্দ শুনে মনে হলো, পারভীন ফোন রেখে দিলো।'

'আমার কথা শোন, শেলী, এ নিয়ে তোমার সন্দেহের কোন মানে হয় না। আজ বিকেলে মোটর বোটে করে বেড়াতে যাবার ব্যবস্থা করার কথা সবে মাত্র বলতে যাবো—'

শেলীর দিকে তাকিয়ে মনে হলো না যে সে আমার কথা বিশ্বাস করছে।

'রাসেল, তোমাকে একটা কথা বলবো, কিছু মনে করো না। পারভীনকে কিছু আদেশ দিতে হলে আমিই দেবো। তোমার কোন প্রয়োজন হলে আমাকেই তুমি বলবে। কেমন ?'

'সে তোমার ইচ্ছে। তাই না হয় করবো।' দাড়ি কামাবার জন্যে আমি আবার গিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম।

আমার ব্যাকুলতা কি পারভীন বুঝেছে ? এরপরও কিছু একটা ব্যবস্থা কি সে নেবে না ?

আসলে ব্যবস্থা সে নিয়েছিল।

ডিনারের পর পরই শেলীর মাথা ধরলো। কিছুক্ষণ পর সাংঘাতিক অসুস্থ বোধ করতে লাগলো।

আমি বললাম, 'সকালে তো আমার কথা শুনলে না। কড়া রোদে বসে রইলে। এখন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো।'

'রাসেল, একটু কষ্ট করে পারভীনকে আমার কাছে আসতে বলো।' মাথা টিপে ধরে বিছানায় বসে পড়লো শেলী। 'আমার জন্যে ভেবো না, তুমি বাইরে থেকে না হয় একটু

বেড়িয়ে এসো। শুধু পারভীনকে পাঠিয়ে দাও।'

প্রায় ছুটে পারভীনের ঘরের দরজায় চলে এলাম। দরজা খুলতেই ওকে দু'হাতে কোলে তুলে নিলাম। দুজনেই দু'জনকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলাম। আমার মুখ ওর মুখটাকে কিছুতেই রেহাই দিচ্ছিলো না। পারভীন আমাকে ঠেলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো।

'শেলী এখনই তোমাকে ডাকছে।'

'আমি ওকে দুটো নোভালজিন খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবো। তুমি কেবিনওয়ালা নৌকো নিও, আমি সান্‌মারকোয় আসছি।'

'ওঃ। অপেক্ষা করা নয়তো যেন নরক যন্ত্রণা ভোগ করা। ব্যবস্থাটা যদি না করতে…'

'কিন্তু তুমি প্রায় বিপদ ডেকে আনছিলে, রাসেল।'

'তোমাকে কাছে না পেলে বাঁচবো না পারভীন।'

'ওর কাছে যাচ্ছি।'

'তাড়াতাড়ি করো কিন্তু।'

'তা তোমাকে বলতে হবে না।'

পারভীনের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সানমারকোয় যেতেই আগের দিনের মাঝিটা এগিয়ে এলো। আমি মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাতেই সে নৌকোর বাঁধন খুলে তৈরি হয়ে সিঁড়ির কাছে এসে গেলো।

কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও পারভীন এলো না। আমার এদিকে অস্থিরতা বাড়ছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি আর নামছি। পায়চারি করছি। এক ঘণ্টা প্রতীক্ষার প্রতিটা মিনিটই

আমার কাছে মনে হলো যেন এক একটা বছর। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কি ঘটলো দেখার জন্যে ফিরে এলাম হোটেলে।

ঘরের ভেতর পারভীনের গলা শুনে মেজাজ চড়ে গেলো।

শেলী বিছানায়। কপালে তার জলে ভেজানো রুমাল।

পারভীন শেলীর কাছে বসা। হাতে ধরা বই থেকে জোরে জোরে কবিতা পড়ছে।

'তুমি এসেছো, রাসেল?' বিড় বিড় করলো শেলী।

আমি মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে রাখলাম। তা নাহলে আমার মুখে প্রচণ্ড রাগের চিহ্ন শেলী দেখতে পেতো।

'এখন কেমন আছো?' গলার স্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করলাম।

'একটু ভালো। মাথার যন্ত্রণা একটু কমেছে।'

বইয়ের দিকে মুখ নিচু করে বসে আছে পারভীন, বিবর্ণ।

'তুমি ঘুমোলে ভালো করতে।'

'আমার ঘুম এখনই এসে যাবে। পারভীন আমাকে বই পড়ে শোনাচ্ছে আর আমার ঘুম আসছে।'

পারভীনের দিকে তাকাবার ভরসা পেলাম না।

'আর দেরি না করে এখনই তোমার ঘুমানো উচিত। আগামীকালও তোমাকে ক্লান্ত দেখাক, তা নিশ্চয় চাও না?'

'না তা চাই না। রাসেল, আজ রাতে পাশের ঘরে ঘুমাতে তোমার কোন কষ্ট হবে না তো?'

মনের মধ্যে একটা আশার আলো ঝলক দিয়ে উঠলো। শেলী না ঘুমানো পর্যন্ত অপেক্ষা। তারপর···আমি আর পারভীন,

সারাটা রাত এক সাথে আনন্দে কাটানো যাবে।

'তোমার একটু আরামে ঘুমানোর কাছে আমার এ কষ্ট কিছুই না, শেলী।'

বুঁজে থাকা চোখ দু'টো খুলে আমাকে দেখলো শেলী। 'আমি জানি, রাসেল, আমার জন্যে তুমি তা করবে। পারভীন আমার কাছেই থাকবে। ও বলেছে সোফায় শুতে ওর কোন কষ্ট হবে না।'

আরো দিন গড়ালো। এর মধ্যে শেলীর কাছে যে কি ভাবে নিজের মনের ভাব চেপে রেখেছি, বলতে পারবো না।

এক রাতে আর মনের চাপ সহ্য করতে পারলাম না। ডিনারে যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় বদলে তৈরি হয়ে শেলীর কাছে এসে দেখি সে তখনো কোন্ পোশাক পরবে তাই ভাবছে।

'আমি নিচে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।'

'এত তাড়াতাড়ি তৈরি হলে কেমন করে?'

'তোমার মতো তো আমি আর আলসে নই,' হাসলাম খুব কষ্ট করে। 'তুমি এসো, আমি যাই।'

'এই তো আসছি বলে, দেরি হবে না।'

ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে দ্রুত পায়ে সোজা পারভীনের ঘরে চলে এলাম।

পারভীন তখন ব্রার হুক লাগাচ্ছে। পরনে লাল রং-এর প্যান্ট। ভোঁ করে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেলো।

'রাসেল!' মেঝে থেকে একটা কাপড় তুলে সে বুকে চেপে ধরলো।

'ওষুধটা আবার দিতে হবে কালই।'

আমাকে এগিয়ে আসতে দেখেই পারভীন পিছিয়ে গেলো।

'রাসেল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?' রাগে ফুঁসে উঠলো পারভীন। 'ও এখনই এসে পড়বে।'

'আরো আধ ঘন্টার আগে ওর কাপড় পরা হবে না। আমি বলে এসেছি, নিচে যাচ্ছি।

'তুমি জানো না, সে—'

আমি দু'পা এগিয়েই জাপটে ধরলাম পারভীনকে। প্রায় নগ্ন সে-শরীরের উত্তাপ আমার রক্তে আগুন ধরিয়ে দিলো।

'রাসেল··· কি যে করছো বুঝতে পারছো না। না না··· ···ছাড়ো, ছাড়ো বলছি!'

'আমি পাগল হয়ে যাবো পারভীন—কাল ওষুধটা আবার দাও।'

'ওতে আর কোন লাভ হবে না। অসুস্থ হলেই আমাকে ওর কাছে থাকার কথা বলে দিয়েছে।'

'তাহলে আমার কি হবে?'

'আমার থেকে দূরে থাকতে হবে। তুমি সাবধান না হলে চাকরীটা হারাবো। কিন্তু আমি তা চাই না।'

দরজায় মৃদু টোকার শব্দ শোনা গেলো।

চকিতে দু'জনে দু'জনের দিকে তাকালাম। আমি তখন হতভম্ব।

পারভীন খপ্ করে আমার হাতটা ধরে টেনে নিয়ে মেঝে পর্যন্ত গড়ানো জানালার ভারী পর্দার আড়ালে আমাকে ঢুকিয়ে দিলো।

দরজার কাছে পারভীন পৌঁছার আগেই শেলীর কথা শোনা গেলো। 'কার যেন কথা শুনলাম?'

'আমি নিজে নিজেই গুন গুন করছিলাম।' ধীর শান্ত গলা পারভীনের। সামান্যতম জড়তাও নেই ওর বলার ভঙ্গিতে। 'কাপড় ছাড়ছি—আপনার কি কিছু লাগবে?'

'তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। তোমার সেন্টের শিশি টা একটু ধার দেবে? আমারটা হঠাৎ হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেলো।'

'নিশ্চয়ই, এই যে নিন।' দরজা সামান্য ফাঁক করে শিশি এগিয়ে দিল পারভীন।

'তোমার এ সেন্টের গন্ধটা বেশ মিষ্টি। আমার খুব পছন্দ।' বলতে বলতে দরজা ঠেলে ভেতরে চলে এলো শেলী। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

পর্দার পেছনে আমি তখন ঘামছি। কি সাংঘাতিক মেয়েরে বাবা! ঠিক যেন গন্ধ শুঁকে শুঁকে এ ঘরে চলে এসেছে। ঐ পোশাক পরা পারভীনের সঙ্গে আমাকে দেখা মানে কর্মসারা। আমি কি সত্যিই পাগল হয়ে গেলাম? তা নাহলে কেউ অমন নির্বোধের মতো কাজ করে? মেয়েটার প্রতি আকর্ষণে আমার যে সব বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। তা নাহলে অমন ঝুঁকি কেউ

নেয় ? শেলী কি নিঃসন্দেহ হতে পারলো ? অজুহাত বটে একটা —সেন্টের শিশি ভেঙে গেছে। উহু, বিচ্ছু মেয়েটাকে এই মুহূর্তে গলা টিপে মারতে ইচ্ছে করছে।

'ধন্যবাদ, পারভীন,' শেলীর গলা শুনলাম, 'যাই, রাসেল আবার আমার জন্যে নিচে অপেক্ষা করছে।'

দরজা বন্ধের শব্দ হলো।

আমার পা যেন আটকে গেছে। বুকে তখনো হাতুড়ী পেটার শব্দ। অল্পের জন্যে রক্ষা পেলাম, সাত কোটি এখনই যেত। আর এ কথা মনে হতেই আমার শরীর যেন অসাড় হয়ে গেল। নড়তে পারছি না।

এক ঝটকায় পর্দা সরিয়ে আমার মুখোমুখী দাঁড়ালো পারভীন।

'তুমি এক্ষুণি বেরিয়ে যাও।' ওর কালো চোখ দু'টো জ্বলছে।

'পারভীন—' মুখের ঘাম মুছলাম রুমালে।

'তোমার কোন কথা শুনতে চাই না।' রাগে ফেটে পড়লো সে।

'তুমি বাঁচালে। আর একটু হলেই...'

'আর নয়। আজই এই মুহূর্ত থেকে, তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই।'

'আমার কথা শোন, পারভীন।'

'তুমি বেরিয়ে যাও। তোমাকে আগেই সাবধান করেছিলাম। শোননি। আমি আর তোমার কোন কথায় নেই। যাও।'

হাত তুলে সে আমাকে দরজা দেখিয়ে দিলো।

'ঠিক আছে, আমিই না হয় কোন একটা পথ বের করে নেব।' দরজার দিকে পা বাড়ালাম।

'তুমি আর কোন পথই খোলা রাখলে না। দাঁড়াও, আমি আগে বাইরেটা দেখে নিই।'

শাড়ীটাকে কোমরে ও গায়ে পেঁচিয়ে দরজা খুললো পারভীন। বারান্দাটা দেখলো ভালো করে। বিশেষ করে শেলীর ঘরের দিকে। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বললো, 'যাও এখন।'

পারভীনের দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি।

এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! কিন্তু আমাকে একটা কিছু করতেই হবে। টাকাগুলো যেমন ছাড়তে পারবো না, তেমনি ছাড়তে পারবো না পারভীনকে। পারভীনকে আমার চাই-ই।

- উপায় বের করতেই হবে, যেমন করে হোক।

কিন্তু কোনমতেই কোন উপায় করতে পারলাম না। দিনের শুরুতে আশায় বুক বাঁধি, কোন না কোন সুযোগ বুঝি পারভীনকে কাছে এনে দেবে। রাত আসে, ভাবি, আগামী দিন পারভীনকে কাছে পাবোই। আবার সকাল গড়িয়ে রাত আসে···সুযোগ আর আসে না।

অপেক্ষা আর অপেক্ষা। পারভীনও ভীষণ কঠিন মেয়ে, সেদিনের পর যেন পণ করে বসেছে, দেখা করবে না। অথচ আমার চরম অবস্থা। বিরাট এক শূন্যতার মাঝে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। আমার যেন রেহাই নেই, ঝুঁকি নেবার আর সাহস

নেই, সেদিনের আতঙ্ক আমার মন থেকে তখনও দূর হয়নি।

এরই মধ্যে একদিন শেলী বাড়ি ফেরার দিন ঘোষণা করলো। শুরু হলো মাল পত্র গোছানো।

আমরা চৌধুরী ভবনে ফিরে এলাম।

ভেনিসে যে-আশা আমার পূরণ হয়নি, সে-আশা এখানে মিটাতে পারবো বলে মনে মনে ফন্দি আঁটতে থাকলাম। অফিসে থাকার সময়ে বেশ কিছু সময় আমি শেলীর কাছ থেকে দূরে থাকবো। তখন একটা ঘরের বন্দোবস্ত করতে পারলে সেখানে পারভীনের সাথে মিলতে পারি—এ রকম একটা ভাবনা আমার মাথায় ঘুরছিল।

বিকেলে শেলী জমে থাকা একগাদা চিঠির মধ্যে ডুবে গেলো।

আমি এর মধ্যেই মুন্সীকে ফোন করেছি। অনেক উৎসাহ-জনক খবর দিলো সে। আগামীকাল দেখা করবো বলে ওকে কথা দিলাম।

পড়ার ঘর হিসেবে যে ঘরটা আমাকে দেয়া হয়েছিল সে-ঘরে বসে বসে আমি সাত সতেরো ভাবছিলাম। ভাব-ছিলাম পারভীনের কথা। পারভীন এখন কোথায়? এ বাড়ির কোন্ প্রান্তে, কি করছে? তাকে কি আর কাছে পাবো? ভাবছিলাম সাত কোটি টাকার কথা। কবে আসবে এ টাকা আমার হাতের মুঠোয়। মুন্সী নিশ্চয় এর মধ্যেই বেশ মোটা অঙ্ক আমার জন্যে গুছিয়েছে। উইলে শেলী কি রেখেছে আমার জন্যে? শেলী যদি এর মধ্যেই মরে যেত…।

'দেখো, রাসেল, এই চিঠিটা দেখো।' একটা চিঠি হাতে নিয়ে শেলী এসে ঘরে ঢুকলো। চেয়ারের হাতলে গা'টা ঠেকিয়ে আবার বললো, 'আমার পুরনো স্কুল থেকে চিঠিটা এসেছে।'

'তোমার স্কুল? কোথায়?' আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম।

'আমি কিছুদিনের জন্যে ঢাকার এক কনভেন্টে পড়েছিলাম। স্বাস্থ্য টিকলো না বলে চলে এসেছিলাম।'

'স্কুল থেকে কি লিখেছে তোমাকে?'

'ওরা যেতে লিখেছে। আব্বা স্কুলের একটা অডিটরিয়াম তৈরির জন্যে টাকা দিয়েছিলেন। সেটা এতদিনে তৈরি শেষ হয়েছে। আমাকে দিয়ে ওপেনিং করাতে চায়। আমি অবশ্য আগেই আমার মত দিয়ে দিয়েছিলাম।'

'তাহলে কবে যাচ্ছো?'

'আগামী পরশুদিন। তুমিও যাবে আমার সাথে, রাসেল।'

'এই মেরেছো! বিরক্তিকর ওসব অনুষ্ঠানে আমাকে যেতে বলো না, লক্ষ্মী। তুমি একাই যাও।'

'তিন তিনটে দিন তোমাকে ছেড়ে দূরে থাকতে হবে, সে যে আমি ভাবতেই পারছি না, রাসেল।'

আমার মনটা আনন্দে নেচে উঠলো।

তিন দিন, মানে দু'রাত...পারভীন আর আমি!

পরক্ষণেই আবার চুপসে গেলাম। প্যারভীনকে তো শেলী নিশ্চয়ই সঙ্গে নিয়ে যাবে।

'তিন দিন কেন ?' আমি নিজেকে সামলে নিলাম।

'অডিটরিয়াম ওপেনিং এর পরের দিন ওদের বার্ষিক স্পোর্টসে পুরস্কার বিতরণ করতে হবে।'

'কিছু মনে করো না শেলী, এদিকে আমার অনেক কাজ জমে আছে। আমি যেতে পারলাম না বলে সত্যি দুঃখিত।'

'আমি অবশ্য বুঝি তোমার অবস্থা। তবে তুমি যদি আমার বক্তৃতা শুনতে, আমার খুব ভালো লাগতো। যাকগে পারভীনকে নিয়ে যাবো, তাহলেই আর একা একা লাগবে না।'

ওর মাংসহীন গালে কষে একটা চড় লাগাবার ইচ্ছে সামলে নিলাম অনেক কষ্টে।

কিন্তু পারভীন শেষ পর্যন্ত গেলো না। শেষ মুহূর্তে সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লো। সাথে প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা।

ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে নিলো না শেলী। বললো, 'ওর যদি কোন কাণ্ড-জ্ঞান থাকতো, তবে বেঁচে যেতাম।'

'কি করবে বলো। অসুখের ওপর তো বেচারীর কোন হাত নেই। তুমি বরং অন্য কাউকে নিয়ে যাও।'

আমি কিন্তু খুব সন্ত্রস্ত ছিলাম, পাছে না আবার সে আমার মনের ভাব টের পেয়ে যায়।

'এখন মেরীকেই সঙ্গে নিতে হবে। তবে ওকে নেয়া না নেয়া সমান কথা—একদম গবেট।'

যাওয়ার আগের পুরো দিন ব্যস্ত রইল শেলী তার বক্তৃতা নিয়ে। টেপ করলো। শুনলো। পছন্দ হলো না, আবার করলো।

প্রত্যেক বারই ওর বক্তৃতা আমাকে শুনতে হয়। খুব সতর্ক

ভাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করতে হয়।

বার কয়েক টেপ করার পর শেষে সে থামলো। সন্তুষ্ট হলো। রেকর্ডার ঢাকা নিয়ে যাবে অনুষ্ঠান শুরুর কিছু আগে বক্তৃতাটা একবার শুনে নেবে।

বিমান বন্দরে গেলাম সি-অফ করতে।

'তুমি ভালোভাবে থেকো, রাসেল। দেখো, আমি কাছে থাকছি না বলে আবার কোন অপকর্ম করে বসো না।'

'আজ রাতে মুন্সীর ওখানে ডিনার, আগামী রাতে রেজা সাহেবের ওখানে,' হাসলাম আমি। 'ওদের সাথে অপকর্ম কতটুকু করা যায় তা ভেবে দেখতে হবে।'

'তোমার সাথে একটু ঠাট্টা করছিলাম। তবে এটা সত্যি, রাসেল, পারভীন সহ বাড়িতে তোমাকে একা রেখে যেতে মন আমার কেমন কেমন করছে।'

বিষধর কোন সাপের ঠাণ্ডা ছোঁয়া যেন আমার শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেলো।

'বাড়ি ভর্তি চাকর-বাকর, তারপরও বলছো একা থাকা? এ তোমার অমূলক ভাবনা, শেলী।'

'মেয়েটা যদি অমন বিদ্ঘুটে সাজগোজ না করতো, যাকে বলে আন-ইম্প্রেসিভ, তবে আমি ঠিক ঠিকই চিন্তা করতাম।' আমার দিকে চেয়ে আদুরে ভঙ্গিতে হাসলো শেলী।

এটা অবশ্য আমি দিনে দিনে বুঝছিলাম যে, কথাতে মনের ভাব যত টুকু প্রকাশ করে তার চাইতে অনেক বেশি সন্দিহান এই রুগ্না স্ত্রীলোকটি।

'রাখো তোমার ওসব, আমি পছন্দ করি না। তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া কিছু করতে চাইলে বাড়ির বাইরে করাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না?'

চমকে উঠে শেলী আমার দিকে তাকালো।

'তুমি···তুমি রাসেল, আমার গা ছুঁয়ে বলো, ওসব তুমি করবে না। আমি তাহলে মরে যাবো, রাসেল।'

আমি তো তাই চাই।

'একটা ভাল কাজে রওনা দিয়ে এসব কি শুরু করেছ তুমি বল তো। কথা দিচ্ছি, ওসব কিছু করবো না। নাও হল তো এবার অন্য কথা বলো।'

আমার দিকে অপলক তাকিয়ে রইল শেলী।

'তুমি কখনো তেমন কিছু করো না, লক্ষ্মীটি। আমি—আমি তা কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।' অসহায়ের মতো আমার হাত ধরে বললো, 'রাসেল, আমাদের বিয়েটা সফল হোক, তা কি তুমি চাও না?'

'বাদ দেবে এ সব কথা?' আমি রাগ দেখালাম। 'যাবার সময় অহেতুক এ সব ভেবে মন খারাপের কোন মানে হয়? সহজ সুন্দর ভাবে দিন ক'টা কাটিয়ে তাড়াতাড়ি তুমি ফিরে এসো, এই আমার একমাত্র কামনা।'

খুশি হয়ে উঠলো শেলী।

আমি হাত নাড়লাম। প্লেনের দিকে এগিয়ে গেলো শেলী।

'ভালো ভাবে থেকো যেন। তোমার জন্যে আমার চিন্তা

হয় খুব।'

'আমার যেতে ইচ্ছে করছে না, রাসেল।' চলতে চলতেও থেমে গেলো শেলী।

কি যন্ত্রণা!

'আর দেরি করো না, যাও। সময় আর নেই।'

প্লেনে উঠতে উঠতে ওর লিকলিকে হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানালো। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। একে একে প্লেনের ইঞ্জিন দুটো চালু হলো। এক সময় চলতে শুরু করলো প্লেন।

প্লেনটা যদি এখন কোন দুর্ঘটনায় পড়ে আগুন ধরে যায়! শেলীর এ যাওয়া যদি চিরদিনের জন্য হতো! তবে সবচেয়ে খুশি হতাম আমি।

চৌধুরী ভবনে পৌঁছে পারভীনের কোন সাড়া পেলাম না।

তারা মিয়াকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম ওর কথা।

তারা মিয়া খুব সংযত ভাবে উত্তর দিলো, 'তিনি তো অসুস্থ বলেই জানি। নিজের ঘরেই হয়তো শুয়ে আছেন।'

আমি যেন হোঁচট খেলাম। সচেতন হলাম।

শেলী এলে তারা মিয়া জানিয়ে দিতে পারে যে বিমানবন্দর থেকে আমি বাড়ি ফেরার সাথে সাথেই পারভীন সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

ভাবছি কি করা যায়। এতবড় বাড়িতে পারভীন যে কোন্ ঘরে থাকে তা খুঁজে বের করা এখন সম্ভব নয়। এদিকে মনও মানছে না। শেলীর অনুপস্থিতির সুযোগটা যেমন করেই হোক

সদ্ব্যবহার করতে হবে।

মনে পড়লো বাড়িটাতে একটা ছোটখাট টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আছে। তাড়াতাড়ি পড়ার ঘরে গেলাম। বাড়ির বিভিন্ন ঘরের ফোন নাম্বারের তালিকাটায় দ্রুত চোখ বুলালাম। দুরু দুরু বুকে ডায়াল করলাম পারভীনের নাম্বারে।

সঙ্গে সঙ্গেই পারভীনের সাড়া পেলাম।

'আজ রাত বারটার সময়,' খুব আস্তে বললাম, 'তুমি আসবে, না আমি যাবো তোমার ঘরে?'

'আমি—আমিই আসবো তোমার কাছে' 'পারভীন আর কোন কথা বললো না। রিসিভার রেখে দিলো।

আমি তখন ঘেমে গেছি।

এগার

দু'টো বাজতে দশ মিনিট বাকী।

রাত বারোটার পর থেকেই আমরা দু'জনে এক ঘরে। এক বিছানায়।

সময় গড়িয়ে যাবার সাথে সাথে আমার মাঝে একটা বিষাদ দানা বেঁধে উঠছিলো। রাত শেষ হলে পারভীন আর কাছে থাকবে না।

'উহ্, কতগুলো দিন, কি যে অসহনীয় যন্ত্রণায় কেটেছে! এত তাড়াতাড়ি আবার মিলতে পারবো সত্যি ভাবিনি। কিন্তু পারভীন, আমার মনে হয় এমন সুযোগ আর হয়তো আমরা পাবো না।'

'যা পেলে তাতেই খুশি থাকো। আর কোন সহজ পথ নেই। মিসেস শেলী সত্যিই ভেঞ্জারাস মহিলা। হয়তো এই মুহূর্তেই ফিরে আসতে পারে। সরাসরি ঢুকে পড়তে পারে এ ঘরে।'

'তা পারবে না। দরজায় তালা আছে।'

'তবু আমি নিরাপদ ভাবি না, রাসেল।'

'কিন্তু এ সাংঘাতিক অবস্থার বেড়াজাল থেকে আমাদের মুক্তি পেতেই হবে।' আমি বিছানায় উঠে বসে ওর মসৃণ উরুতে হাত রাখলাম। 'একটা উপায় আমার মাথায় এসেছে, পারভীন, শোন। সপ্তাহে তো তুমি একদিন ছুটি পাও। আমরা একটা ঘর ভাড়া নিই না কেন? এমন জায়গায়, যেখানে আমাদের কেউ চিনবে না। আমি অফিসে থাকার সময়, আর তোমার ছুটি কাটাবার সময়—সে-ঘরে আমরা নির্বিঘ্নে একত্র হতে পারি।'

বুঝতে পারলাম, পারভীন নিজের ভেতর যেন গুটিয়ে গেল।

'ছুটির দিনে আমি মাকে দেখতে যাই, রাসেল।'

'তোমার মা!'

'হ্যাঁ। আমাকে যেতেই হয়। না গেলে আমার মা মিসেস শেলীর কাছে নির্ঘাৎ খবর নেবেন। যার সঙ্গে আমার একটু মন কষাকষি বলে তিনি কখনো আমাকে বিশ্বাস করেন না। ভাববেন আমি বুঝি...'

'কতরকম অজুহাত আছে, দেখিয়ে দেবে। শোন, তোমাকে অন্ততঃ ঐ একটা দিন আমার জন্যে রাখতেই হবে।'

'সম্ভব নয়, রাসেল। এ ধরণের বিপজ্জনক পথে পা বাড়াতে আমি কিছুতেই পারবো না।'

'এতটা কাছে এসে এখন দিনের পর দিন তোমায় না পেয়ে হা-পিত্যেস করে মরবো?'

'সাবধান করার কথা মনে নেই তোমার?'

'আমার কথার উত্তর হলো না, পারভীন।'

'আমি কি করতে পারি, রাসেল ?'

'আমি যেমন তোমাকে চাই, তুমিও কি আমাকে…'

'আমিও চাই, রাসেল।'

কালো চোখ দু'টি তুলে পারভীন এমন ভাবে তাকালো যে, আমি আরো জ্বলে উঠলাম। ওকে পাবার একটা তৃষ্ণা আমার ভেতর দাউ দাউ আগুন ছড়িয়ে দিলো।

ওর একটা হাত আমার হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। বললাম, 'আমি এমন দীর্ঘ প্রতীক্ষার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবো না। আমার হাতে এখন টাকা আসছে। হাতে আছে ত্রিশ হাজারের মতো। এক দালাল বন্ধুর সাথে অংশী-দারী ব্যবসা শুরু করবো শীঘ্রিই। পারভীন, আমার কথা হলো, আমরা কেন নতুন করে চিন্তা করতে সাহসী হবো না ? শেলী যাতে আমাকে ডিভোর্স করে সে-ব্যবস্থা আমার ওপর ছেড়ে দাও। এবং তারপর…আমরা সহজেই বিয়ে করতে পারি।'

'বিয়ে করবো ?' বালিশটা ঠেলে আধ শোয়া হয়ে পারভীন হাসলো। 'পাগল আর কাকে বলে। ত্রিশ হাজারে ক'দিন থাকবে ? ব্যবসা থেকেই বা কত আসবে মনে করো ? তাছাড়া —আমি তো আগেও বলেছি, এ চাকরী আমি ছাড়বো না।'

'কেন ? এ চাকরীতে তোমার জন্যে কি এত মজা ?'

'মজার কথা নয়। সুযোগগুলোও দেখতে হবে। বিলাস বহুল বাসস্থান, ভালো মাইনে, নিজের ব্যবহারের প্রয়োজনে গাড়ি—আর কি চাই আমার ? তাছাড়া বেশি পরিশ্রমও নেই। এমন চাকরী ছাড়লে বোকামী হবে না ?' সারা শরীরে একটা

ঢেউ খেলিয়ে পারভীন টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো।

'তাহলে এমন হাবা-গোবা সেজে থাকো কেন? ওই চশ-মা তো তোমার লোক দেখানো? ঐ উ'িটয়ে টেনে চুল বাঁধার প্রয়োজন কি?'

'তুমি এখনও শেলীকে চিনে উঠতে পারোনি দেখছি। আমাকে ওর চেয়ে কোনমতেই সুন্দর দেখানো চলবে না। তা হলে মুহূর্তের জন্যেও সে আমাকে সহ্য করবে না। শুধু একই কারণে অনেকগুলো সেক্রেটারীকে সে তাড়িয়েছে। নিজে দেখতে বিশ্রী বলে অন্যের সৌন্দর্যে সে ঈর্ষা বোধ করে। যার মাধ্যমে আমি কাজটা পেয়েছিলাম, এ ব্যাপারে সে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল। সুতরাং বুঝতেই পারছো, কাজটা আমি রাখতেই চাই। জীবন আমার খুব কষ্টের, রাসেল। বাঁচার জন্যে আমাকে অনেক লড়াই করতে হয়েছে। তার ওপর যার সাথে আমার প্রচণ্ড অমত আমাকে আরও অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিয়েছে। এই বিলাসিতার চাকরীটা হারিয়ে আমি আবার পথে দাঁড়াতে রাজী নই।'

'যা তুমি বলছো, তা সত্য নয়, পারভীন। এ শুধুই আমাকে বুঝ দেয়া।' আমার রাগ চেপে গেলো মাথায়। 'আসল কথা হলো শেলী তোমাকে প্রচুর টাকা উইল করে দেবে বলেই এ চাকরীতে থেকে যেতে চাও।'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তোমার সঙ্গে প্রেমে পড়া বা তোমাকে ভালোবাসার সাথে এ ব্যাপারটাকে আমি জড়াতে চাই না। আবার এ কথাও সত্য নয় যে, নিছক

ওগুলোর জন্যেই আমি আমার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাগুলোকে ধ্বংস করে ফেলবো।'

'শেলী তোমাকে বোকা বানিয়ে ধোকা দিচ্ছে। মাত্র সামান্য কিছু টাকা—'

'সামান্য কিছু!'

'শেলী নিজে আমাকে তাই বলেছে।'

পারভীন হাসলো। ওর হাসিতে রহস্য ছড়ানো। কাত হয়ে আমার গায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ হলো। ওর উন্মত্ত যৌবনের মাদকতা আমাকে উষ্ণ পরশ দিলো। চুলের ফাঁকে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বললো,

'আসলে শেলী তোমাকেই বোকা বানাচ্ছে। আমি জানি সবই। উইলটা আমি দেখেছি।'

'তুমি দেখেছ? কখন?'

'এই তো কয়েকদিন আগে একটা নতুন উইল করলো সে। অ্যাটর্নী যে খসড়াটা পাঠিয়েছিল সেটাই আমি দেখেছি।'

হঠাৎ উত্তেজনায় আমি কেঁপে উঠলাম।

'তাহলে তোমার জন্যে কি রেখেছে?'

'পঞ্চাশ হাজার।'

'পঞ্চাশ হাজার! কিন্তু সে যে বলেছিল মাত্র কয়েক হাজার...'

'সে হয়তো ভেবেছে তুমি হিংসে করবে।'

আমার হৃৎপিণ্ডে তখন দ্রুত রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে। নিজেই নিজের বুকের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি।

'উইলে আমার জন্যে কি রাখা আছে, পারভীন?'

'তোমার জন্যে তো সব কিছুই রয়েছে। সমস্ত বাড়ি ঘর, ব্যবসা, জায়গা-সম্পত্তি সবই। আর ছ'কোটি টাকা। বাকী টাকা দান খয়রাত আর উত্তরাধিকারীদের জন্যে।'

দম বন্ধ করে শুনছি ওর কথা। শেষে লম্বা শ্বাস নিয়ে ফুসফুসকে বাতাস যোগালাম।

'তুমি ঠিক জানো তো, পারভীন?'

'ঠিক জানি। এখন বলো, ডিভোর্স নেবে?' ওর চোখে মুখে বিদ্রূপের ঝিলিক। 'কি হলো, কথা বলছো না কেন?'

'তোমার কথা শোনার পর নতুন করে চিন্তা করতে হয়।'

পারভীনের প্রশ্নটা আমাকে অস্থির করে তুললো। এক দিকে পারভীন, অন্যদিকে বিপুল ধন সম্পদ। বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। অস্থির ভাবে পায়চারি করছি ঘরময়। টাকা-পয়সা কিছুই এখন পাবো না, কিন্তু পারভীনকে আমার এখনই চাই। আবার পারভীন আমাকে চাইলেও, টাকার আশা ছেড়ে আমার সাথে সে আসতে রাজী নয়। আমি যেন দুরূহ এক ঘোর প্যাঁচের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছি।

'পারভীন, টাকাটা আমরা যখন পাবো, তখন দু'জনেই বুড়ো হয়ে যাবো। ভোগ করার এ বয়স আর থাকবে না তখন।'

'বুড়ো হবার আগে পাবার সম্ভাবনা কি নেই?'

'তুমি কি বলতে চাইছো, অসুস্থ হয়ে বা দুর্ঘটনায় সে মারা যেতে পারে?'

'অনেকেরই তাই হয় কিন্তু।'

কমিশনার সাহেব, সেই মুহূর্তে, পারভীন বিছানায়, আর আমি পায়চারি করতে করতে শেলীর মৃত্যুর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছি,…তখনও, বিশ্বাস করুন, ওকে খুন করার চিন্তা মনে আসেনি।

'বলিহারি আমাদের আশা,' বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে পারভীনের চোখে চোখ রেখে বললাম, 'কবে শেলী মরবে, সে আশায় থাকতে থাকতে আমাদের উপভোগের জীবন শেষ! তখন আমরা বুড়ো। মুখের, শরীরের চামড়া ঝুলে পড়বে।'

'তবু আশায় আশায় থাকা ছাড়া উপায় কি বলো?'

ঠিক সেই মুহূর্তে, আচমকা টেলিফোনটা বেজে উঠলো। আমরা দু'জনেই চমকে উঠলাম। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শাড়ী, ব্লাউজ, পেটিকোট আর ব্রাটা পারভীন এমন ভাবে কুড়িয়ে নিজের গায় চেপে ধরলো যেন সে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেছে। কেউ যেন ঘরে ঢুকে পড়েছে।

আর আমি হতবাক হয়ে টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'নিশ্চয়ই শেলী! এই রাত আড়াইটের সময়, যত্তোসব!'

পারভীন বললো, 'নাও, কথা বলো তোমার প্রিয়তমা স্ত্রীর সাথে। যা বলবে, খুব সাবধানে।'

রিসিভারটা তুললাম। আমার হাত কাঁপলো। তবু গলার স্বরে ঘুম ঘুম ভাব জড়িয়ে প্রায় ধমকে উঠলাম।

'কে?'

'রাসেল…'

সেই সুদূর ঢাকা থেকে শেলী তার অস্তিত্ব জাহির করছে আমার আর পারভীনের মাঝখানে।

'শেলী! কি ব্যাপার? এত রাতে—আরে, এ-যে আড়াইটে বাজে!'

'তোমার ঘুম ভাঙালাম কি?'

'ওহ্, কি গভীর ঘুমই না হচ্ছিল!'

'তুমি রাগ করো না, রাসেল। আমার বড় একা লাগছে…।'

মনে মনে ওর নিকুচি করছি আর দেখছি পারভীন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পেটিকোটের ফিতে বাঁধছে।

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, রাসেল। কিন্তু একটা দুঃস্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি। ভীষণ ভয় পেয়ে ফোন করলাম। স্বপ্নটা এমন, তোমাকে বলতে-ও আমার ভয় লাগছে।… তুমি আমাকে ঘৃণা করছো… তুমি যেন আগের মত নেই।…তোমার কাছে করুণা ভিক্ষা করতেই তুমি আমাকে ঠেলে ফেলে দিলে। তারপর তুমি ছুটছ। আমিও ছুটছি তোমার পিছু পিছু … তুমিও ছুটছ… আমিও ছুটছি … ছুটতে ছুটতে তুমি কোথায় যেন মিলিয়ে গেলে… তোমাকে না পেয়ে আমি কাঁদতে লাগলাম। ঘুম ভেঙে ভয় হলো, তোমার কিছু হয়নি তো?'

ওর দুঃস্বপ্নটা আমার বুকে খোঁচা দিলো। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমলো।

'ওটা নিছক স্বপ্নই, শেলী।' আমি নিজেকে অবিচলিত রাখতে সচেষ্ট হলাম। 'আমার জন্যে কোন চিন্তা করো না, শেলী, আমি ভালো আছি।'

'তোমার কথা শুনতে খুব ভালো লাগছে, রাসেল। জানো, আমার কেবলই মনে হচ্ছে, তোমাকে ছেড়ে এতদূরে একা আসা আমার উচিত হয়নি। রাসেল—রাসেল তুমি আমাকে এখনও ভালবাসো তো?'

আঙ্গুলের চাপে রিসিভারটাকেই গুঁড়ো করতে ইচ্ছে করছে। বললাম, 'আমার ভালোবাসায় কোন খাদ নেই, শেলী।'

'আমিও তোমাকে ভালবেসে যেন অপার শান্তি পাই, রাসেল। তাই তো এখন তোমার কথা শুনে, হোক না টেলি-ফোনে, আমার হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার বইছে।'

'অনেক রাত হলো, শেলী, এখন ঘুমোও।'

'তুমি যে শুনতে চাইছো না, আমার বক্তৃতাটা কেমন হল?'

'নিশ্চয় সবাই খুব প্রশংসা করেছে?'

'সে আর বলো না, দারুণ হয়েছে, সবাই...'

তারপর একটানা বলে গেল কে কি বলেছে...ওকে কিভাবে স্বাগতম জানিয়েছে...ওর বক্তৃতা শুনে কারা কারা অভিনন্দন জানালো...ইত্যাদি।

অগত্যা ওকে থামাতে বাধ্য হলাম।

'তোমার কথা শুনতে খুব ভালো লাগছে, শেলী। বিশেষ করে তোমার সাফল্যের কথা। তা এখন ফোন রেখে ঘুমোও। আমারও ঘুমের দরকার।'

'ঠিক আছে, রাসেল, শুভরাত্রি। তবে মনে রেখো, আমি তোমাকেই ভাবছি।'

'আমারও একই অবস্থা, শেলী। শুভরাত্রি।'

রিসিভার রেখে দিলাম।

সব যেন নষ্ট হয়ে গেলো। আমার আর পারভীনের সাজানো সুখের পাপড়িগুলো যেন ঐ একটা টেলিফোন দলে মলে দিলো। আমরা দু'জন ভালবাসার একটা বৃত্ত তৈরি করেছিলাম। সবার আড়ালে আমরা স্বপ্নের নীড় রচনায় ছিলাম গভীর মগ্ন। দু'জনে দু'জনের ছোঁয়ায় উষ্ণতা অনুভব করছিলাম। হৃদয়ের কাছে হৃদয় এনে তন্ময় হয়ে শুনছিলাম প্রেমের কবিতা। কিন্তু সবই—সবই মুহূর্তে খানখান হয়ে ভেঙে গেলো। মনে হচ্ছে, টেলিফোনটা আমাদের চারপাশে শেলীর অস্তিত্ব ঘোষণা করে গেলো।

'আমি এখন যাই, রাসেল।' পারভীন কাপড় পরে নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে।

'মেয়েটার ন্যাকামী দেখে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। দেখো না, বলছে, স্বপ্নে দেখেছে, আমাকে হারিয়ে ফেলেছে। আদিখ্যেতা দেখাবার আর সময় পেলো না।'

'আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, সব গোপন ব্যাপারেরই সে গন্ধ পেয়ে যায়।'

'এখন তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। চুলোয় যাক, তুমি এখনই যেও না, পারভীন। ভোর হতে এখনও অনেক সময় বাকী।'

'আমার আর ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে, ও এখনো এই ঘরেই ঘাপটি মেরে বসে আছে।'

'আমারও যেন তাই মনে হচ্ছে।'

পারভীনের কাছে এগিয়ে গেলাম। বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলাম। মুখটা একটু নামিয়ে চুমো খেলাম। কিন্তু পারভীন কোন সাড়া দিলো না। নিজেকে আলগা করে নিলো।

'আজকে আর না, রাসেল।'

'ঠিক আছে, আজ তবে থাক। কাল রাতে আবার, বারোটায়। তুমি আসবে, না আমি তোমার ঘরে যাবো?'

'তুমি সত্যি নির্বোধ, রাসেল। শেলীকে তুমি সামান্যই চেনো। আগামী রাত আর আমাদের হয়ে আসবে না। সে নির্ঘাৎ ফিরে আসবে।'

'না, ফিরতে পারে না। কাল ওর একটা কি যেন পুরস্কার বিতরণের ব্যাপার রয়েছে।'

'আমার কথাই ফলবে দেখো। সে ফিরবেই।'

পারভীনের কথাই সত্য হলো। সন্ধ্যের আগেই ফিরে এলো শেলী।

অফিস থেকে ফিরে দেখি শেলী আমার জন্যে অপেক্ষা করছে বাগানে।

অথচ বাড়ি পৌঁছোর আগমুহূর্ত পর্যন্ত আমি ভাবছিলাম, শেলী না ফিরলে পারভীনের সাথে আরেকটা রাত কী সুখেই না কাটবে। ওর সঙ্গে গত রাত, যা ছিল সত্যিই আদিম, উদ্দাম, ক্ষুধিত প্রেমের রাত, তাতে আমার কামনা পরিপূর্ণ

ভাবে তৃপ্ত হতে পারেনি। ভেবেছিলাম আজ রাতে হয়তো আমার সর্বনাশা কামনার তৃপ্তি ঘটবে। পারভীন আমার রক্তে নেশা ধরিয়েছে। আশ্চর্য! এর আগে অন্য কোন মেয়ে তা কখনো পারেনি।

আর এদিকে শেলীর কাণ্ডকারখানা আমাকে পাগল করে তোলার যোগাড় করছে। ওর নানারকম কথাবার্তা আর সতেরো রকম বায়নাকায় মেজাজ ঠিক রাখা দায় হয়ে উঠছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখছি। কি করবো, অসংযত হয়ে টাকা-গুলোতো হাত ছাড়া করতে পারি না। তবু মাঝে মাঝে আমার ভেতরের চাপা উত্তেজনা বুঝতে ওর কষ্ট হতো না। আর তখনই দেখেছি ওকে অবস্থা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠতে।

কয়েকদিন পর।

আমি আমার পড়ার ঘরে। মুন্সীর কাছ থেকে লগ্নীর টাকার বিবরণীটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম।

আহ্লাদে ভঙ্গিতে দুলতে দুলতে শেলী ঘরে ঢুকলো, 'রাসেল...।'

'এই যে, শেলী, এসো। বসো।'

'কি করছো, রাসেল?'

'আমি একটু ব্যস্ত আছি। কি ব্যাপার?'

'কাল রাতে বাড়িতে একটা পার্টি দিচ্ছি। তেমন কাউকে বলবো না, ধরো কয়েকজন পুরনো বন্ধুবান্ধব আসবে আর কি। কবীর সাহেবকে আসতে বলবো। তুমি তো আছোই।'

'আমি তো আছিই,' ওর কথায় বিশেষ মন ছিল না। 'এবার

লক্ষ্মী মেয়ের মতো এ ঘর থেকে কেটে পড়ো। ডিনারের আগে আমাকে ডাকবে না খবরদার, আমার অনেক কাজ শেষ করতে হবে।'

কোন কথা না বলে সুড়সুড় করে চলে গেল শেলী। অথচ দু'মাস আগে শেলীর এ অবস্থা কেউ কল্পনাই করতে পারতো না। কিন্তু এখন ঘটছে। শেলী আর এখন বাধা পেলেই ফুঁসে ওঠে না। বিশেষ করে আমার সঙ্গে তো নয়ই। আমার সঙ্গে ব্যবহারেও ও আজকাল সংযত হতে শিখেছে। আমার প্রতি দুর্দমনীয় ভালবাসাই হয়তো তার মধ্যে এই পরিবর্তন আসতে সাহায্য করেছে। ওর ভালবাসার পেছনে আবার একটাই মুখ্য কারণ, আমাকে হারাতে ওর দারুন ভয়। ওর টাকা আছে সত্যি, কিন্তু ঐ শরীর আর চেহারা নিয়ে আমার মতো সুপুরুষ পাওয়া দুঃস্বপ্ন। এ ব্যাপারে সে খুব সজাগ। তাই এখন অবস্থা চক্রে মনে হচ্ছে, স্বামী হিসেবে আমার কাছ থেকে যে-কোন রকম ব্যবহার পেতেই সে তার মনকে প্রস্তুত করে নিয়েছে।

শেলী ঘর থেকে চলে যাবার পরই হাতের কাগজগুলো টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিলাম। শেলী ওপরে গেল তার সাজঘরে। হয়তো পোশাক বদলাবে।

এখন কোথায় আছে পারভীন? আমার মনে ভাবনাটা ঘুরপাক খেলো। সে-রাতের পর থেকে পারভীন শুধু আমার মনে খেলছে। সমস্ত কাজ-কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে

অসম্ভব উতলা করে তুলছে। এ ক'দিনের মধ্যে কোনদিন এক পলকের জন্যে দেখেছি, কোনদিন আবার দেখিওনি। এখন সে কোথায়? কি করছে? আমার কথাও সে ভাবছে কি?

আমি এখনও জানি না, পারভীনের শোবার ঘরটা কোন্ দিকে।

আমার পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘরে এলাম। না, নেই পারভীন। গেলাম শেলীর পড়ার ঘরে। দেখলাম নিবিষ্ট মনে টেবিলে কাজ করছে পারভীন। আমার ঘরে ঢোকার শব্দে চোখ তুলে তাকালো সে। আমি এগিয়ে গেলাম।

'তোমার কথাই ভাবছিলাম, পারভীন। বৃহস্পতিবার আমার সঙ্গে কোথাও দেখা করবে?'

'নাহ্।' রাগে গরগর করে উঠলো। 'আমি আমার মাকে দেখতে যাবো। দয়া করে জ্বালাতন করবে না।'

'আমার ভালবাসা কি এমনি শুকিয়ে মরবে?'

কোন উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়ালো পারভীন। টেবিলটা ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়ালো। আমি থাবা মেরে ওর হাত ধরে ফেললাম। হেঁচকা টানে নিয়ে এলাম বুকের কাছাকাছি।

'আমি আর দেরি করতে পারবো না। যেমন করেই হোক কোথাও আমাদের মিলতেই হবে।'

'আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও। বাড়াবাড়ি করো না বলছি!' হাতটা মোচড় দিয়ে ছাড়িয়ে নিলো। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে একটানে দরজাটা খুলে প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পরাজিতের মত টেবিলের ওপর হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম। শুধু পরাজিতই নই, আহতও বটে। বুকটার এক পাশে কে যেন হাতুড়ী পেটাচ্ছে। আমি কি পারভীনের কাছে হেরে যাচ্ছি ?

কার যেন মৃদু পায়ের শব্দে চমকে উঠে ফিরে তাকালাম।

দরজার সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে তারা মিয়া। নির্বিকার তারা মিয়া তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চোখের চাউনিতে কেমন যেন সন্দেহের ছায়া। আর সে-মুহূর্তেই একটা ঠাণ্ডা ভাব আমার প্রতিটা লোমকূপকে শিউরে দিলো।

'কি চাই এখানে ?' একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়লো-আমার গলা থেকে।

'দরজার পর্দাটা ঠিক করছিলাম, স্যার।'

ওর দিকে আর না তাকিয়ে দ্রুত পায়ে ওপরে চলে এলাম।

মনে হলো, এখানে বাস করলে আমি পাগল হয়ে যাবো। চারদিকে শুধু সন্দিগ্ধ চোখের দৃষ্টি, গুপ্তচর। সবাই যেন নীরবে দেখছে। দেখছে আমার গতিবিধি।

মনের ভেতর একটা ভীষণ তোলপাড় শুরু হলো। বারান্দা দিয়ে হাঁটছি। এ তোলপাড়ের কি শেষ নেই ? আছে। শুধু পারভীনই পারে এর অবসান ঘটাতে। কিন্তু তাকে পাই কোথায় ? কোথায় আছে সে। বারান্দার দু'পাশের দরজাগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে ভাবছিলাম শুধু ওই কথা। পারভীনকে আমার পেতে হবে। হঠাৎ খেয়াল হলো, পারভীনের চিন্তায় চিন্তায় সাজঘর ছেড়ে চলে এসেছি বারান্দার শেষ প্রান্তে।

বিতৃষ্ণায় নিজেই নিজেকে খিস্তি করে উঠলাম। ফিরে যাবার জন্যে আবার ঘুরলাম। আর তখনই নজরে পড়লো, আমার দাঁড়ানোর জায়গা থেকে এক চিলতে পথ, বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে বাঁক নিয়েছে।

এ বিশাল বাড়িটায় অনেকগুলো ঘর। শুনেছি এর মধ্যেই অতিথিদের জন্যে রয়েছে ত্রিশটা। কিন্তু ঐ চিলতে পথটা কোথায় গিয়ে পড়েছে কে জানে।

নিজের মধ্যে হঠাৎ বেশ উত্তেজনা বোধ করলাম। পথটা একবার দেখে এলে কেমন হয়? যদি সেখানেই পারভীনের ঘরটা পেয়ে যাই?

ভাল করে তাকালাম চারদিকে। দেখলাম কোন সন্দিগ্ধ চোখ নীরবে আমাকে অনুসরণ করছে কি না। না, কেউ নেই। সুরুৎ করে ঢুকে পড়লাম সেই চিলতে পথটায়। এগিয়ে চললাম। শেষে পথটা বাঁক নিতেই থেমে গেলাম। সামনেই একটা ঘরের দরজা। পথটাও শেষ।

এ ঘরটাই যদি পারভীনের হয়।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তমাত্র চিন্তা করলাম। তারপর কপাটের ওপর কান পাতলাম।

ঘরে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে। চলা ফেরার শব্দ হচ্ছে। ঝুঁকি নেবার জন্যে মনকে তৈরি করলাম। তারপর দরজায় টোকা দিতে অনামিকাকে বাঁকিয়ে ডান হাতটাকে কপাটের দিকে এগিয়ে নিলাম।

ভেতরে টেলিফোনের টিং শব্দ কানে এলো। টোকা দিতে

গিয়েও থেমে গেলাম। তারপর ডায়ালের শব্দ শুনলাম।

দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। চারদিকে আবার ভাল করে তাকিয়ে দরজায় কান পাতলাম।

ভেতরে পারভীনের গলা।

'হ্যালো, শাহেদ বলছো? শোন, বৃহস্পতিবার আমার আসতে একটু দেরি হতে পারে। এখানে একটা পার্টি হচ্ছে সেদিন। তবে সাতটার মধ্যেই আমি এসে যাবো। তুমি হোটেল ব্রডলাইনেই থেকো।— হ্যাঁ, সাতটার মধ্যেই। তুমি সব ব্যবস্থা করতে পারবে তো? পুরো সময়টা তোমাকে কাছে পেতে চাই, শাহেদ।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর আবার পারভীনের গলা, 'আমি তো শুধু সময় গুণছি, শাহেদ। তুমি কিন্তু দেরি করো না। লক্ষ্মীটি আমার।'

একটু পরে ক্লিক শব্দ শুনলাম। রিসিভার রেখে দিয়েছে।

কি করে সাজঘরে ফিরেছিলাম জানি না।

কিছুক্ষণ পর দেখলাম আমি বিছানায়। দু'হাতে দু'গাল সজোরে চেপে ধরে বসে আছি। আমার শরীর যেন ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

আর কেউ যেন আমার মাথায় হাতুড়ি দিয়ে সজোরে ঘা দিয়ে চলেছে।

বার

আমি আগে এমন চিন্তা করিনি একথা সত্য। কিন্তু এখন ব্যাপারটা চিন্তা করতে বেশ মজা পাচ্ছি।

আমার প্রতি শেলীর ভালবাসা ছিল নির্ভেজাল। মনে প্রাণে সে চাইতো আমাকে। আবার সেই সাথে সব সময় আতঙ্কিত থাকতো, আমাকে যদি হারিয়ে ফেলে। আর আমি পারভীনের প্রেমে অন্ধ। ওকে হারাবার ভয়ে আমিও আতঙ্কিত।

যাই বলুন, এটা একটা মজার ব্যাপার। আমার কাছ থেকে যন্ত্রণা পাচ্ছিল শেলী, আর আমি পাচ্ছিলাম পারভীনের কাছ থেকে।

কিন্তু আমার আর শেলীর সহ্য শক্তির মধ্যে অনেক তফাৎ। পারভীন আমাকে ঠকাচ্ছে—ধাক্কাটা সামলে নিতে কিছুটা সময় নিয়েছিলাম। তারপর প্রচণ্ড রাগ চাপলো আমার মাথায়। পারভীনের কাছে প্রেমভিক্ষা চাইবার পাত্র আমি নই। কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ঐ লোকটা কে? তা বের করতেই হবে।

জানতে হবে, ব্যাপার কিছু আদৌ আছে কিনা, থাকলে কত দিনের পুরনো। দরকার হলে যেমন করেই হোক, ওটা বন্ধ করতে হবে।

বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যে সাতটা। পারভীন যাবে হোটেল ব্রডলাইনে। শাহেদ নামের একজন লোকের সাথে সে দেখা করবে। তাহলে···মাকে দেখার কথাটা স্রেফ ধাপ্পা, মিথ্যে। আর শাহেদকে একটা দিন দিতে পারলে আমাকেও একটা দিন দিতে ওর আপত্তি কিসের ?

বৃহস্পতিবার সকালে অফিস যাবার আগে শেলীকে বললাম যে ফিরতে আমার একটু দেরি হবে। তবে পার্টি শুরু হবার আগেই চলে আসবো।

কিন্তু সন্ধ্যে ছটায় শেলীকে ফোন করলাম।

'শেলী, কিছু মনে করো না, পার্টিতে পৌঁছতে আমার বেশ একটু দেরি হবে।'

'কি ব্যাপার, রাসেল ?'

'আমার পুরনো এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা। দীর্ঘ দিনের অসাক্ষাতে অনেক কথা জমে আছে। তুমি নিশ্চয় পার্টি চালিয়ে নিতে পারবে।'

'তোমার বন্ধুকে নিয়ে পার্টিতেই চলে এসো না, রাসেল। আমি একা···তুমি থাকলে, বুঝলে, আমি অনেক সাহস পাই।'

'সত্যি বলতে কি বন্ধুটি পার্টির জন্যে উপযুক্ত হবে না। তোমার কেতাদুরস্ত বন্ধুদের মাঝে ওকে খুব বেমানান লাগবে। ঠিক আছে, তুমি শুরু করো, আমি এগারটার মধ্যেই ফিরবো।

তার আগে বন্ধুকে বিদায় করতে পারলে তো কথাই নেই।'… শেলী যেন কি বলতে চেয়েছিল, রিসিভার রেখে দিলাম।

অফিসে আর এক মুহূর্ত দেরি করলাম না। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গাড়িতে চাপলাম। আজ আমার ডাটসানটা ধোলাই-মোছাই হচ্ছে বলে শেলীর মার্সিডিজটাই অফিসে নিয়ে এসেছিলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পথে নামলাম।

হোটেল ব্রডলাইন শহর থেকে বেশ কিছুটা দুরে। সমুদ্রের পাড়ে। জায়গাটা টুরিস্টদের জন্যে খুব আকর্ষণীয়। বালুকা-বেলায় ছোট ছোট তাঁবু আর পাতার ছাউনি দিয়ে বসার ব্যবস্থা আছে। আর আছে হোটেলটা প্রেম-নিকুঞ্জ। অনেকেই জোড়া বেঁধে চলে আসে এখানে। ঘর ভাড়া নেয় এক ঘণ্টা, একবেলা বা একদিনের জন্যে। নিশ্চিন্ত সান্নিধ্যে দু'টি হৃদয় কাছাকাছি হয়। রিতাকে নিয়ে আমি অনেকবারই এসেছি। রাত কাটিয়েছি।

হোটেল থেকে বেশ কিছুটা দুরে আমার গাড়িটা দাঁড় করালাম। তারপর বেলাভূমি ঘেঁষে হেঁটে হেঁটে হোটেলের চত্বরে এলাম।

হোটেলের চত্বরটা খুব সুন্দর। সুন্দর সুন্দর সব ছাতা দাঁড় করানো। তার নিচে টেবিল। সন্ধ্যায় লোকজনের ভিড়ে চত্বরটা বেশ মুখরিত।

আমি ঝোপের আড়ালে একটা টেবিলে বসলাম। আর চারদিকে পারভীনকে খুঁজতে থাকলাম।

খুঁজে পেতে বেশ সময় লাগলো। তার হয়তো একটা

কারণ, ওকে হঠাৎ করে চিনতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। বিদেশে ওকে প্রথম চশমা আর বেখাপ্পা সাজগোজের খোলসের বাইরে দেখার চেয়ে এখন ওকে আরও বেশি আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে।

ওর সাথে বসা লোকটা দেখতে বেশ লম্বা আর শক্ত সামর্থ্য মনে হচ্ছে। চেহারা আর গায়ের রং প্রায় আমারই মতো। বয়সে হয়তো আমার চেয়ে কিছু ছোটই হবে। স্পোর্টস জ্যাকেট আর বাদামী রংয়ের ঢিলা-ঢালা কর্ডের প্যান্ট পরনে।

এক ঘণ্টা ধরে ওদের দেখছি।

পারভীন সেই প্রথম থেকেই শুধু বক্‌বক্‌ করছে। ওর কথায় যেন মনের উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ছে। কিন্তু লোকটার মাঝে তেমন কোন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। কেমন যেন মনমরা। কখনো কখনো সে আনমনা হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকছে। কখনো চেয়ারে পিঠ এলিয়ে ঘন ঘন হাই তুলছে।

লোকটা কি পারভীনের কথায় বিরক্তি বোধ করছে? শেলী যখন আমার পেছন লেগে অমন বক্‌বক্‌ করে, তখন কি আমাকেও ওই লোকটার মতই দেখায়?

পারভীনের প্রতি লোকটার আগ্রহ নেই বললেই চলে। সে লুকিয়ে ঘড়ি দেখছে। একতরফা পারভীনের কথা চালিয়ে যেতে বেশ অসুবিধা হচ্ছে বোঝা যায়। আর ওই অবস্থা দেখে আমি এক অদ্ভুত সুখ অনুভব করছিলাম।

সোয়া আটটার দিকে উঠলো ওরা। কিছু খাবে বলে হয়তো রেস্তোরাঁয় ঢুকলো। আমিও উঠলাম। ওদের পিছু

পিছু আমি রেস্তোরাঁয় গেলাম। কিন্তু ভেতরে ঢুকলাম না। বারান্দায় এমন ভাবে দাঁড়ালাম, যেন ওদের কথা-বার্তা শোনা যায়। বারান্দা থেকে জানালা দিয়ে ওদের ওপর চোখ রাখলাম।

কিন্তু লোকটা কোন কথাই বললো না। খেতে খেতে পারভীনই আবার বক্‌বক্‌ করলো। শেষ পর্যন্ত, মনে হলো হাল ছেড়ে দিয়ে পারভীন চুপ করে মন দিল খাবারে।

লোকটার মুখে বিরক্তির ছাপ এবার আরও স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আর পারভীনের সুন্দর মুখটা ফ্যাকাশে—দুঃখ দুঃখ ভাব সারা মুখে ছেয়ে আছে। এ রকম ছাপ তো আমি শেলীর মুখে অনেক দেখেছি।

শেলীর কষ্ট ভোগ আমার জন্যে, আমার পারভীনের জন্যে, আর পারভীনের শাহেদের জন্যে। সত্যি, মজা বৈকি!

খাওয়া শেষ হলে পারভীন শাহেদের হাতে একশ টাকার একটা নোট দিলো। সে টাকা দিয়ে শাহেদ বিল মেটালো। তারপর ওরা বেরিয়ে এলো। বারান্দায়। আমি তখন আড়ালে চলে গেছি।

পারভীন হঠাৎ লোকটার একটা হাত জড়িয়ে ধরলো। তারপর বললো শুনলাম, 'চলো, এবার সমুদ্রের ধারে যাই।'

লোকটা নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মাথা নাড়লো। 'অসম্ভব, আমি এখনই ফিরবো। এক বন্ধুর সাথে আমার দেখা করার কথা আছে···'

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনে দেখা করার মতো বন্ধু

শুধু আমারই নয়, লোকটারও আছে।

পারভীনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো।

'তুমি অযথা কেন মিথ্যে বলছো, শাহেদ। তুমি কি জানতে না…'

'বেশ তাই হলো। দেখা করার মতো কোন বন্ধু না থাকলেও আমার কাজ আছে। তুমি তোমার ঐ ভালোবাসার বকর-বকর বন্ধ করে বাড়ি যাও। আগামী বৃহস্পতিবার যদি পারি, দেখা করতে চেষ্টা করবো।'

'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমি বাড়ি ফিরতে পারবো না। তোমাকে তো আগেই বলেছি,' পারভীন থেমে লোকটার মুখের দিকে চাইলো, 'চলো, শাহেদ, সমুদ্রের ধারে। সেই বাংলোর চাবিটা আমি নিয়ে এসেছি।'

'না, ওখানে রাত কাটানোর মতো মেজাজ আজ আমার নেই। তাছাড়া আমার কাজ আছে।'

পারভীনের দিকে আর না তাকিয়েই লোকটা বারান্দা থেকে নিচে নেমে গেলো। পারভীন ওর পেছন পেছন হোটেলের চত্বর পর্যন্ত এলো। কিন্তু লোকটা কোন ভ্রূক্ষেপই করলো না। অগত্যা দাঁড়িয়ে পড়লো পারভীন। হয়তো ওর হাত-পা ভেঙে আসছিল, তাই ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লো।

আর সে লোকটা, আমরা দু'জনেই দেখলাম, হোটেলের গাড়ি রাখার জায়গার দিকে এগোচ্ছে। তারপর একটা ঝর ঝরে ফিয়াট গাড়িতে উঠে চলে গেলো।

আমি একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পারভীনের পাশের চেয়ারটায় বসলাম।

শাহেদের চলে যাওয়া পারভীনকে এত বেশি আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, সে টেরই পেলো না, তার পাশে কেউ বসেছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ও বাস্তবে ফিরে এলো। পাশের চেয়ারে কাউকে অনুমান করতেই চকিতে ফিরে তাকালো।

দু'জোড়া চোখ নিষ্পলক তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ।

'পারভীন, তুমি!' আমি মৃদু হাসলাম।

পারভীন যুগপৎ ভয়, বিস্ময় আর রাগে ক্ষোভে কুঁকড়ে উঠলো।

'তুমি এখানে কি করছো?'

'তোমার মাকে দেখছিলাম। বেশ চমৎকার দেখতে। গল্পটা আরো চমৎকার, কি বলো?'

হাত দু'টো মুঠো করে নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করতে চাইল পারভীন।

'মিসেস শেলী কি জানেন, তুমি এখানে—মানে কোথায় আছো?' রাগে ফুঁসে উঠলো সে। 'পার্টি ছেড়ে এলে কেন?'

'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, পারভীন।'

বোকার মতো তাকালো ও আমার দিকে।

'কোন পুরুষ, কোন মহিলাকে নিয়ে যখন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন সব ক্ষেত্রেই দেখা করার মতো একজন বন্ধু থাকে।'

কিছু বলতে গিয়েও পারভীন চুপ করে গেল।

'লোকটার পরিচয় জানতে পারি কি, পারভীন?'

আমার দিকে তাকিয়ে কিছুটা ইতস্ততঃ করলো সে। তারপর ধীর শান্ত গলায় বললো, 'আমার স্বামী।'

আমার যেন হঠাৎ উঁচু জায়গা থেকে পতন হলো। এ কথা আমি আশা করিনি।

'তুমি ওকে আমাদের সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে, তাই না?' আমার গলায় যেন কথা আটকে যেতে চাচ্ছিল। 'তুমি—তুমি কি ওই লোককে ভালোবাসো, পারভীন?'

পারভীন যেন তখন নিস্পন্দ। পাথরের চোখের মতো ঘোলাটে ওর চোখের দৃষ্টি। 'ভালোবাসাই আমার অভ্যাস।'

'খুব ভাল কথা। সত্যি বলতে কি, এতদিন পর্যন্ত আমি অনেক চিন্তা করেও কারণ খুঁজে পাইনি, তুমি কেন ঐ বিলাসিতার চাকরীটা ছাড়তে চাও না। আজ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু এ জন্যে কি একটু বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে না?'

মনে হলো, পারভীন অস্বস্তিবোধ করছে। বললো, 'ওকে নিয়ে আর কোন আলোচনা করতে চাই না।'

'আমি আলোচনা করেই আরো কিছু তথ্য জানতে চাই। তোমার এই সান্ধ্য অভিসারে লোকটাকে খুব একটা সহজ হতে দেখলাম না। সে শুধু বিরক্তিই প্রকাশ করলো। কারণটা কি অন্য কোন সুন্দরী মেয়ে?'

'ওহ্! ওসব বলে আর আমার যন্ত্রণা উস্কে দেয়ার চেষ্টা করো না, রাসেল। আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না, কাউকে মন প্রাণ সঁপে দিয়ে ভালবাসার কি মানে,—সে ভালো-

বাসা আবার যখন নিজেরই চোখের সামনে খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ে, তা দেখার কি অসহণীয় জ্বালা।'

আমার দিকে তাকিয়ে থামলো পারভীন। ভারাক্রান্ত হৃদয়কে যেন সামাল দিতে চাইল। বেশ সংযত কণ্ঠে বললো, 'বলতে কোন বাধা নেই, রাসেল, শাহেদের মূল্য আমার কাছে এখন মূলতঃ শূন্য। শুধুই একটা পুরনো পচা অভ্যাস। ধরো আবার যদি শাহেদ হঠাৎ করেই আমাকে ভালবাসতে শুরু করে তবে তাকে নিরাশ হতে হবে।'

আবার থামলো পারভীন। আপন মনেই কি যেন ভাবলো। বললো, 'যতই দিন যাচ্ছে, আমার সব রকম আশাই ধীরে ধীরে ঝরে পড়ছে। সপ্তাহে একদিন, বৃহস্পতিবার, এখনও দেখা করি বটে। তুমি বিশ্বাস করো, রাসেল, এ সময়টাও শাহেদ অন্য এক মেয়ের জন্যে বরাদ্দ করে রেখেছে। তবে এখনও যা একদম বন্ধ করে দেয়নি, তা হলো সে আসে। হয়তো এও ওর একটা অভ্যাস। কিন্তু এলেও, আমি বুঝি, প্রতিটা মুহূর্ত সে মরণ যাতনা ভোগ করে। তবে আমি জানি, শাহেদ বদলাবে।...আমি ভেবে অবাক হই সেই সময়টার কথা যখন সে আমার কাছে করজোড়ে ভালবাসা ভিক্ষে চাইতো। দিন হয়তো আসবে, আবার সে ভিক্ষে চাইবে। তখন... তখন আমিই ওকে পিঠ দেখাবো। বলবো—এবার ফিরে যাও। এবং সেই কথা বলেই আমি সারাজীবনের তরে ওর কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাই।'

'কাজটা ঠিক হবে না, পারভীন।'

'কি বললে, হবে না? হবে, আমি ঠিক তাই করতে চাই। আমাকে কেউ একবার ভালোবেসে আবার পায়ে মাড়াবে তা আমি কল্পনাই করতে পারি না। শাহেদই আমার সে-বিশ্বাসে আঘাত করেছে। এর মূল্য ওকে দিতেই হবে। আমি শুধু আমার সেদিনটির জন্যে অপেক্ষা করছি, যেদিন আমি প্রতি-শোধের ছোবল হেনে ওর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবো। আর দেখে দেখে আনন্দ পাবো, শাহেদ আমাকে পাবার জন্যে হন্যে হয়ে ছুটে মরছে, আমার ভালোবাসা ফিরে পাবার আশায় করুণা ভিক্ষা করছে।'

চুপ করে গেল পারভীন। সব কথা যেন শেষ হয়ে গেছে। আমিও চুপ করে বসে রইলাম ওর পাশে। কোন কথাই বললাম না—ওকে ধাতস্থ হতে দিলাম। একসময় আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'এসো ওদিকে, সমুদ্রের কাছে যাই।'

'আ-আমি—আমাকে কেন ডাকছো?' হতচকিত ভাব পারভীনের। নিজের আসনে শক্ত হয়ে বসলো। 'তুমি যাও, রাসেল।'

হঠাৎ করেই যেন আমার মাথায় রক্ত উঠে এলো। ওর দিকে ঝুঁকে ওর ডান কব্জিটা চেপে ধরলাম।

'তুমি কিন্তু নিজেই যেতে চেয়েছিলে।'

'আমি চেয়েছিলাম, কে বললো তোমাকে?'

'শাহেদকে বলছিলে, আমি শুনেছি। চলো।'

উঠলো না পারভীন। হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চাইলো কিন্তু

আমার মুঠো আরো শক্ত হলো।

'এখানে যে কোন অবস্থাকে আমি পরোয়া করবো না। আমাকে জোর খাটাতে বাধ্য করো না, পারভীন।'

'প্লিজ, রাসেল, আমাকে ছেড়ে দাও।'

'আমি আর কথা বাড়াতে চাই না।'

অসহায়ের মতো আমার দিকে চাইলো পারভীন। ওর মুখ রক্ত শূন্য। মলিন। আমিও অপলক তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। আমার চোখের দৃষ্টি বুঝেই হয়তো পারভীন হঠাৎ বিচলিত বোধ করলো।

'না। এখন নয়।'

'একটু আগে তুমিই চেয়েছিলে। এখন ওঠো।'

উঠে পড়লো পারভীন। আমার হাত তখনো ওর কব্জিতে। চত্বর ছেড়ে আমরা নিচে নামলাম। ধীরে ধীরে এগোলাম সমুদ্রের দিকে।

নির্জন জায়গায় এসে দু'জনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওকে সামনে এনে দু'হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম। ও যেন এজন্যেই অপেক্ষা করছিল। ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার বুকে। আমার কাঁধে মুখ ঘষলো, জোরে আঁকড়ে ধরলো। তারপর অবাক করে দিয়ে হঠাৎ পারভীন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কান্নার তোড়ে আমার হাতের বাঁধনে আটকা ওর শরীর বার বার উথলে উথলে উঠছে।

সত্যি বলতে কি, আমি এর জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। পারভীনের মতো মেয়ে কাঁদতে জানে, এও যেন আমার

কাছে আরেক বিস্ময়।

আমি ওর কান্নার বেগ থামার অপেক্ষা করলাম। আমার গাল ওর মাথার চুলে ঘষতে থাকলাম। একটা হাত ওর পিঠ, কোমর, আর নিতম্বে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। আরেক হাতে ওকে বুকের সাথে চেপে রেখেছি।

অনেকক্ষণ পর কান্না জড়িত কণ্ঠে ও বললো, 'আমাকে তুমি ঘৃণা করতে পারো না, রাসেল?'

'ঘৃণা। কি যে বলো। আমি যে তোমায় ভালোবাসি, পারভীন।'

'এরপরও কি তোমার ভালোবাসা ঘৃণার সঞ্চার করতে পারে না?'

আমি ওর চিবুকটা তুলে ধরলাম। প্রচণ্ড আবেগে ওকে চুমো খেলাম। পারভীনও পরম আবেশে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো।

'পারভীন।'

'হুঁ!'

'চলো আমরা নতুন করে জীবন শুরু করি। বিয়ে করি।'

'কিন্তু শাহেদ...'

'চুলোয় যাক শাহেদ। এখন তুমি আর আমি। আমরা সহজেই বিয়ে করতে পারি।'

'না রাসেল, বিয়ে করলে আর তোমার এই ভালোবাসা অটুট থাকবে না।' পারভীন নিজেকে আলগা করে নিতে চাইলো।

কিন্তু আমি আলগা হতে দিলাম না। আরো জোরে জাপটে ধরে চুমোয় চুমোয় পাগল করে তুললাম ওকে।

'এ তোমার মিথ্যে ধারণা.। আমার ভালোবাসা অফুরন্ত। সারা জীবন তুমি তাতে মনের খুশিতে অবগাহন করতে পারবে।'

'এত সুখ আমার কপালে সইবে না, রাসেল।' পারভীন আমার বুকে আহ্লাদে মুখ ঘষতে থাকলো।

'সইবে, সইবে। এখন চলো, তাড়াতাড়ি যাওয়া যাক।'

'কোথায় ?'

'সেই বাংলোতে। তোমার কাছে তো চাবি রয়েছে।'

খপ্ করে বুকের কাছে আমার জামাটা মুঠো করে ধরলো পারভীন। হাতটা শক্ত করে আমাকে কিছুটা ওর দিকে টানলো। বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছু সময়। তারপর ওর হাতের মুঠো আপনিই শিথিল হয়ে এলো। জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে হাঁপাচ্ছে পারভীন। আমি ওর হাতটা নামিয়ে দিলাম।

'কি হলো পারভীন ?'

'আমার একটা কথা শুনবে, রাসেল ?'

'বলো।'

'রাসেল, আজ থাক।'

'না। পরে হয়তো আর চাবি পাওয়া নাও যেতে পারে।'

ঘাড় তুলে তাকালো পারভীন। আমি ওর চোখে আলতো করে চুমো খেলাম।

বাংলোটা এখান থেকে অনেক দূরে। বালুকাবেলায় শেলী ওটা তৈরি করেছিল মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে বিশ্রাম নেবে বলে। কিন্তু আমি চৌধুরী ভবনে আসার পর শেলীকে কখনো সেখানে যেতে দেখিনি। তবে শুনেছি, মাঝে মধ্যে লোক পাঠিয়ে ওটা সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়।

এখান থেকে বাংলোতে সরাসরি যাবার দুটো পথ আছে। একটা পথ শহর হয়ে যেতে হবে। আরেকটা বালুকাবেলার ওপর দিয়ে। এ পথে গেলে সেখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে। এখান থেকে কিছুদূর গিয়ে বালুকাবেলায় গাড়ি নিয়ে নেমে যাওয়ার পথ রয়েছে।

স্পিডোমিটারের কাঁটাটা পঁচাত্তর ছুঁই ছুঁই করছে। ব্রেকের ওপর পা রাখলাম। সামনেই বালিয়াড়িতে নেমে যাওয়ার পথটা।

প্রায় সমকোণে বাঁক নেয়া পথটার মুখে সড়ক থেকে গাড়িটা নামিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম। সোঁ সোঁ আওয়াজ করে গাড়িটা গিয়ে বালুর রাজ্যে পড়লো।

অ্যাকসিলারেটরে পা রেখে চাপ দিলাম।

আর ঠিক সে সময়েই বোমা ফাটার মতো এক আওয়াজ শুনলাম। কি ঘটেছে তৎক্ষনাৎ বুঝতে পারলাম। গাড়িটা ডান দিকে কাৎ হয়ে তীরের বেগে ছুটে চলেছে।

অ্যাকসিলারেটর থেকে পা-টা সরিয়ে স্টিয়ারিংটাকে ঠিক রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকলাম। গাড়িটা যে কোন মুহূর্তে উল্টে যেতে পারে। খেয়াল হতেই ব্রেকের ওপর পা

রেখে সজোরে চাপ দিলাম।

চাকাগুলো যেন শূন্যে উঠে আবার নেমে গেলো। ঘুরতে ঘুরতে বালির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে এক সময় থেমে গেলো।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেলো ঘটনাটা। আর এ ঘটনাই আমার জীবনে এনে দিলো এক বিরাট পরিবর্তন। আর—সেই সাথে কেড়ে নিলো আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমার সুন্দর ভবিষ্যৎ। আজ বাংলোর গুমোট গরমে বসে যে খুনের স্বীকারোক্তি টেপ করছি, বিশ্বাস করুন, সে দুর্ঘটনাই তার জন্যে দায়ী।

ধকলটা সামলাতে কিছুক্ষণ গাড়িতেই বসে ছিলাম। পারভীন ছিটকে পড়ে আছে সীটের ওপর। কোন রা নেই—একদম বোবা।

ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিতে দিতে গাড়ি থেকে নামলাম।

শুধু টায়ারটাই ফেটেছে। আর কিছু হয়নি। আঁচড়ও লাগেনি। খেয়াল করে দেখলাম, ভাগ্য বোধ হয় এটুকুই ভাল ছিল, গাড়িটা বসে যাবার জায়গার বালি তেমন নরম নয়। গাড়িটাকে সহজেই পিছিয়ে নেয়া যাবে।

কোট, জামা খুলে চাকা বদলের কাজে লেগে গেলাম।

ভাবলাম, কি বাঁচাটাই বেঁচেছি। সড়ক পথে থাকলে এ যাত্রা আমাদের কেউ বাঁচাতে পারতো না। সামনেই ছিল, উঁচু টিলা কাটা আঁকা-বাঁকা পথ। ওই বাঁকগুলোর কোন একটাতে চাকাটা ফাটলে এতক্ষণে পরপারে থাকতাম। সাথে থাকতো পারভীন। ওর ওই ভরাট যৌবনের সঙ্গী হয়ে পরপারে যেতে

কি আমার কোন আপত্তি আছে ?

অথচ চাকা ফাটার মতো এর চেয়ে ভালো জায়গা আর কোথাও আছে বলে আমার মনে হলো না। সমস্ত ধকলটাই গেলো বালুর ওপর দিয়ে।

হঠাৎ মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেলো। তখন চাকার বল্টুগুলো সজোরে টাইট করছি।

আমার এখন মনে হয়, শেলীর সম্পত্তি উইলের কথা শুনে—হ্যাঁ, সে-কথা শোনার পর থেকেই আমার মধ্যে খুনের বীজ বপন হয়েছিল।

চাকাটা ফেটে সে-বীজটাকেই অঙ্কুরিত করলো।

বিদ্যুৎ খেলে গেলো আমার চোখের সামনে। সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেলো। কোন সমস্যাই এখন আর সমস্যা নয়। টাকা, পারভীন,...আমার ভবিষ্যৎ,—সব কিছুরই সমাধান আমি পেলাম। শেলী যদি মারা যায়...

এ চিন্তা তো আগেই আমার মাথায় ছিলো। এখন... এখন তো আমি ওকে খুন করতে পারি।

আমি ওকে খুন করবো।

তেরো

আমি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি আর ভাবছি, কি ব্যাপার, এত তাড়াতাড়ি পার্টি শেষ হয়ে গেলো ? তা নইলে সব এত নীরব কেন ? লাউঞ্জে তো দেখছি আলো জ্বলছে। রাতও তো খুব বেশি হয়নি। সাড়ে বারো। শেলীর পার্টি তো সবে জমার কথা।

লাউঞ্জ ছাড়িয়ে হলঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি, ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো শেলী।

'এতক্ষণে ফিরলে তাহলে ?' কর্কশ, কঠিন ওর গলার স্বর।

'দেখতেই পাচ্ছো, এটা আমার প্রেতাত্মা নয় নিশ্চয়ই ?'

ওর কোন কথাই আজ আমার সহজ ভাবে নেবার কথা নয়। বিশেষ করে আমার মনের অবস্থা যা, তাতে এই মুহূর্তে ওকে সহ্য করার প্রশ্নই ওঠে না।

সাগরের সেই বালিয়াড়ির মধ্যে ফেটে যাওয়া চাকা বদলিয়েছি। আমার তখন ঘর্মাক্ত অবস্থা। সমস্ত স্নায়ু-

গুলো ক্লান্ত, অবসন্ন। মারাত্মক এ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হতে পারতো। কিন্তু হয়নি। কিন্তু মনে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেছি। পারভীনের সাথে কয়েক ঘণ্টা নিরিবিলি কাটাবার অপূর্ব সুযোগটা নষ্ট হয়ে গেলো। অনেকদিন ধরে এ ধরনের সুযোগের জন্যে হা-পিত্যেশ করে মরছিলাম। আবার কবে সুযোগ পাবো কে জানে।

আশ্চর্য, দুর্ঘটনার পর চাকা পাল্টাবার দীর্ঘ এ সময়ে পারভীন একটা কথাও বলেনি। আমিও ওর অবস্থা দেখে কোন কথা বলিনি ওকে। আমার মাথায় তখন অন্য একটা চিন্তা খেলা করছে।

চাকাটা পাল্টানো শেষ হলে ফাটা চাকাটা গাড়ির পেছনের বুটে রেখে চাবি লাগিয়ে দিলাম। তারপর হাত-পায়ের বালি ঝেড়ে ফেলে জামা-কোট গায়ে চড়িয়ে নিলাম। স্টিয়ারিং এর সামনে বসে পারভীনের দিকে তাকালাম। সীটের ওপর ঘাড় কাত করে নিস্পন্দের মতো পড়ে আছে সে। গাড়িটা পিছিয়ে নিয়ে বড় সড়কে উঠে এলাম। এরপর আর বাংলোতে যাবার মানসিকতা আমাদের কারোই অবশিষ্ট ছিল না। শহরে ফেরার বাকী পথটুকু খুব সাবধানে গাড়ি চালিয়ে এসেছি। আমার মাথাটা তখন অন্য কাজে ব্যস্ত।

শহরে ঢুকেই প্রথমে একটা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করলাম পারভীনের। আগামীকাল ভোরে চৌধুরী ভবনে কাজে যোগ দেবে। বাকী পথটা আমি একা একা। মাথায় চিন্তাটা ক্রমাগতই ঘুরপাক খাচ্ছে।

মার্সিডিজটা গ্যারেজে রেখে, সিঁড়ি ভেঙে চত্বর হয়ে লাউঞ্জে

আসার সময়টুকুর মধ্যেই খুনের পরিকল্পনার মোটামুটি একটা ছক মনে মনে এঁকে ফেলেছি। আর ঠিক সে-সময়েই শেলী এসে আমার সামনে দাঁড়ালো।

অবশ্য এ নিয়ে আর বেশি চিন্তা করার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু শেলীর ঐ অযাচিত আক্রমণে মনে হলো, আমি আরও আগেই ওকে খুন করার চিন্তা না করে মস্ত ভুল করেছি।

গলা টিপে ধরার মতো আওতায় থাকলেও, সে-ধরনের একটা প্রবল ইচ্ছেকে অতি কষ্টে হজম করে নিলাম।

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? নিশ্চয়ই কোন মেয়ের সঙ্গে ?' রাগে উন্মাদের মতো শেলী প্রায় লাফাচ্ছে। 'আমাকে মিথ্যে বলার মানেটা কি ?...মেয়েটা কে ?'

'আমার বাল্যকালের এক বন্ধু। বর্তমানে সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন। খুব ভালো গান গায় বটে, কিন্তু ওর বুকে বেশ ঘন কালো চুল রয়েছে।' আমি চিবিয়ে চিবিয়ে কথা-গুলো বললাম।

মুহূর্তের মধ্যে শেলীর হাতটা বাতাসে ঝলক দিয়ে আমার গালে এসে আছড়ে পড়লো। ওর হাড়সর্বস্ব হাতের চড়টা বেশ জোরালো ছিলো। হাড়গুলো যেন আমার গালের মাংসে কাঁটার মতো বিঁধলো। চোখে পানি এসে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। ওর কাছ থেকে এমন ব্যবহার আমি আশা করিনি। এর চেয়ে অনেক কম খারাপ ব্যবহারের জন্যেই কেউ আমার হাত থেকে রেহাই পায়নি আজ পর্যন্ত।

সুতরাং···

খপ্ করে ওর কাঁধ দুটো ধরে ফেললাম। আমার মাথায় তখন প্রচণ্ড রাগ। যে-রাগের তোড়ে আমার হাতের আঙুল-গুলোতে যেন শরীরের সব শক্তি জড়ো হয়েছে। ওর কঙ্কাল-সার কাঁধে আমার আঙুলগুলো সমস্ত আক্রোশ নিয়ে ধীরে ধীরে চেপে বসতে থাকলো।

পরমুহূর্তেই হাত সরিয়ে আমার আঙুলগুলোকে ওর গলার ওপর নিয়ে আসার ইচ্ছে আমাকে অদম্য ভাবে নাড়া দিচ্ছে। কেন জানি না, এত আক্রোশ সত্ত্বেও আমি তা পারিনি।

হঠাৎ করেই, কোত্থেকে এসে লোহাপেটা দু'টো হাত আমার কব্জি দু'টো ধরে চাপ দিলো। আমার হাত দু'টো অবশ হয়ে শেলীর কাঁধ থেকে আপনি খসে পড়লো। এ যেন অপ্রত্যাশিত এক প্রচণ্ড ধাক্কা, পড়তে পড়তে নিজেকে কোন মতে সামলে নিলাম।

'এসব ব্যাপার সহজ ভাবে নেবেন, মিঃ রাসেল।' পুলিশের ডিটেকটিভ কবীর হোসেন আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'এসব ক্ষেত্রে উত্তেজনা শুধু বাড়তি ঝামেলাই ডেকে আনে।'

অভ্যাসবশতঃ ঘুষি কষাবার জন্যে হাত দু'টো নিশপিশ করে উঠলো। কিন্তু পুলিশের ঝানু ডিটেকটিভ কবীর হোসেনের মুখের দিকে তাকিয়ে সে-ইচ্ছে আমার দূর হয়ে গেল।

নিজেকে সহজ করার জন্যে কাঁধ ঝাঁকিয়ে গায়ের কোটটা ঠিক করে নিলাম। এ পকেট সে-পকেট হাতড়ালাম সিগারেটের

জন্যে। পেলাম না। রাগে আমার সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে। তবু নিজেকে সংযত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে থাকলাম। ···কাজটা খুব ভাল করিনি। কবীর হোসেন সত্যিই বিপজ্জনক। সে কাছাকাছি আছে জানলে আমি ঐ হাড্ডিসার মেয়েটার গা স্পর্শ করতাম না।

শেলী কোন্ ফাঁকে জানি চলে গেছে। খেয়াল করতে পারিনি। এখন লাউঞ্জে আমি আর কবীর হোসেন। সে আমাকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে দেশলাই জ্বালালো।

'সত্যি, মেয়েরা কখনো কখনো এত নীচ হতে পারে···' সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই-র কাঠি ফেলে দিলো, 'মাঝে মাঝে আমার স্ত্রীও এমন করে বসে। তখন ইচ্ছে করে গলা টিপে তাকে মেরে ফেলি।'

'আপনার মতই আমারো ইচ্ছে হয়···' আমার গলাটা যেন হঠাৎ কেঁপে উঠলো।

'কিন্তু মনে রাখবেন, এটা কোন মতেই ভাল কাজ নয়। সে যাকগে, এবার তাহলে আমি বাড়ি যেতে পারি। আপনার স্ত্রী, আপনার ফিরতে দেরি দেখে একা একা খুব চিন্তা করছিলেন। তাই আমি থেকে গিয়েছিলাম।' কবীর হোসেন কথা বলতে বলতে ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করলো।

আমিও ওর পেছন পেছন চলছি।

হঠাৎ সে পেছন ফিরে আমার দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। আমার আপাদমস্তকে একবার চোখ বুলালো। মনে হলো, আমার মাঝে সে যেন কিছু খুঁজছে।

'মাপ করবেন, মিঃ রাসেল। আমার টুপিটা ফেলে এসেছি। আমি এক্ষুণি ওটা নিয়ে আসছি।'

ও টুপিটা নিয়ে এসে সহজ ভঙ্গিতে আবার আমার পাশে দাঁড়ালো।

আমি একটু হাসতে চেষ্টা করলাম।

'আমার স্ত্রীকে নিয়ে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। মাঝে মাঝে এত বেশি কর্তৃত্ব ফলাতে চায় যে···' একটু থামলাম। এর কাছে অজুহাতটুকু তুলে ধরবার দুর্বলতাটা যেন আমাকে পেয়ে বসলো। 'আমার এক পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা করার কথা, অথচ সে কিনা ভেবে নিয়েছে, আমি কোন মেয়ের সাথে সময় কাটিয়েছি।'

'কি করবেন বলুন, মেয়েদের ওরকম একটু আধটু সন্দেহ বাতিক থাকেই।'

আমার রাগটা যেন পড়ে গেলো। বেশ সহজ বোধ করলাম। গোয়েন্দা ব্যাটাকে যতটা ধুরন্ধর মনে হয়েছিল, ঠিক ততটা হয়তো নয়।

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মিঃ কবীর হোসেন। আমরা ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবো। আসলে হয়েছিল কি, বন্ধুটি একটু অন্য ধরনের, তাই পার্টিতে নিয়ে আসিনি।'

'ঠিক আছে, মিঃ রাসেল। শুভরাত্রি।'

আমরা করমর্দন করলাম।

'আপনার কোটের কাঁধে আর জামার বুকে—ঠোঁটের লাল দাগটা একটু খেয়াল রাখবেন যেন,' মুচকি হাসতে হাসতে

বললো, 'আপনার স্ত্রীর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

আমার বুকে যেন হাতুড়ির ঘা পড়লো। সে বেরিয়ে গেলো।

চৌদ্দ

পরদিন। রাত তিনটে। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। আলো জ্বাললাম না। পায়ে পায়ে দরজার সামনে এসে থামলাম। কান খাড়া করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। না, কোথাও কোন শব্দ নেই। খুব ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে দরজা খুললাম। বারান্দায় আধো অন্ধকার। বাইরে পা দিলাম।

বারান্দার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, যতটুকু নজর যায় দেখলাম। কিছুই নজরে এলো না। কোন দিকে কোন সাড়া শব্দও নেই।

চাবি লাগিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। আমার আর শেলীর শোবার ঘর পাশাপাশি। পা টিপে টিপে শেলীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় কান পাতলাম। ভেতরে কিছুই শোনা গেল না।

আর মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে সোজা চলে এলাম বারান্দার শেষ প্রান্তে। পারভীনের ঘরের দিকে যাবার পথটাতে

পা রেখে পেছন ফিরে তাকালাম। সমস্ত বারান্দাটায় চোখ বুলিয়ে নিলাম। না, কেউ নেই।

পারভীনের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম তখন নিজের বুকের ঢিপ্ ঢিপ্ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি পরিষ্কার। দরজার হাতলে হাত রেখে ঘুরালাম। একটু চাপ দিলাম ভেতর দিকে। আশ্চর্য, দরজাটা খুলে গেলো। সেই সাথে একরাশ চাঁদের আলো গিয়ে ঘরটার মেঝেতে ছড়িয়ে পড়লো।

'কে! কে?' প্রায় চিৎকার করে উঠলো পারভীন।

মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা স্নিগ্ধ চাঁদের কিরণের আবছা আলোয় বুঝলাম, পারভীন উঠে বসেছে বিছানার ওপর।

'আস্তে, পারভীন। আলো জ্বেলো না।'

আরো একবার বাইরের দিকে চোখ বুলিয়ে পারভীনের ঘরে ঢুকলাম। চাবিটা দরজার হাতলেই ছিল। লক করে দিলাম।

'কি চাই তোমার? এত রাতে এখানে কেন এসেছ?' পারভীন চমকানোর ভাবটা তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ওর কথায় কোন ভ্রূক্ষেপই করলাম না। বিছানার দিকে অন্ধকারে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, 'শেলীর অভিযোগ, গত রাতে নাকি আমি কোন মেয়ের সাথে বাইরে সময় কাটিয়েছি। এ নিয়ে যে বিশ্রী কাণ্ডটা ঘটে গেছে তা নিশ্চয়ই শুনেছ।'

'মেয়েটা যে কে, তা ও জেনেছে?'

'না।'

'কিন্তু তুমি এখানে কেন?' ঝাঁঝালো গলায় প্রায় চিৎকার

করে উঠলো।

'চিৎকার করো না, পারভীন। আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে এসেছি।' নিজেকে ধীর এবং সংযত রাখলাম। এতরাতে ও একটা গোলমাল পাকিয়ে আমার সব কিছু সর্বনাশ করে দিক তা আমি হতে দিতে পারি না।

'তোমাকে কোন কথা বলতে হবে না। আমি শুনতে চাই না তোমার কথা। তুমি বের হও। এক্ষুণি, এই মুহূর্তে—তা নাহলে…'

'কয়েক দিনের মধ্যেই পঞ্চাশ হাজার টাকা পেতে কেমন লাগবে, পারভীন?'

'প্লিজ, এখন যাও, রাসেল।'

ওর গলার স্বরে কিছুটা নমনীয়তা টের পেলাম। মারমুখো ভাবটা অন্ততঃ নেই। টাকার কথায় কার না মন গলে।

'আমার একটা প্রস্তাব আছে তোমার কাছে। আর তাতে রাজী হলেই তুমি পেতে পারবে পঞ্চাশ হাজার। শুধু তাই নয়, আমার ভাগের ছ'কোটির ওপরও তোমার অধিকার এসে যাবে।'

একটু চুপ করলাম। পারভীনের প্রতিক্রিয়াটা বুঝতে চাইলাম। কিন্তু সে চুপ করে রইলো।

আমি আবার বললাম, 'তার আগে অবশ্য আমাকে গ্রহণ করতে হবে তোমার স্বামী হিসেবে।'

ঘর অন্ধকার। আমি ওর কাছ থেকে কিছু শোনার অপেক্ষা করতে থাকলাম। মনে হলো, এই নিঃশব্দ অন্ধকারেই পারভীন আমাকে দেখছে। বুঝতে চেষ্টা করছে আমার প্রস্তাবের গুরুত্ব।

গভীরতা। আমি ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। শুধু কান দুটো খাড়া রাখলাম, অন্ধকারে ওর দিকে চেয়ে।

'তুমি কি আজ খুব বেশি টেনেছো, রাসেল? নেশার ঘোরে তুমি কি বলছো, তা হয়তো নিজেই জানো না।'

মরণ জ্বালা, মেয়েটা দেখছি কেবল পিছলেই যাচ্ছে। সে কি আমায় বিশ্বাস করতে পারছে না?'

'কথাগুলো এত তাড়াতাড়ি তুমি ভুলে গেছ, তা আমি বিশ্বাস করি না, পারভীন। তবু আমি তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। শেলীর উইলকৃত টাকাগুলো আমাদের বার্ধক্যের আগেই উপভোগের সম্ভাবনার একটা কথা তুমিই বলেছিলে। বলেছিলে, শেলী অসুস্থ হয়ে বা কোন দুর্ঘটনায় মারা যেতে পারে।'

'রাসেল!' মনে হলো পারভীন ভীষণ রকম চমকে উঠে বিছানার চাদরটা জোরে আঁকড়ে ধরলো। 'তুমি—তুমি কি বলতে চাইছো?'

'শেলীর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। একটা দুর্ঘটনা ওকে শীঘ্রিই মৃত্যুর ওপারে টেনে নিয়ে যাবে।'

'দয়া করে এবার আমার ঘর ছেড়ে চলে যাও, রাসেল।' ওর শিউরে ওঠা ভাবটা যেন উবে গেলো। 'আমার ঘরে দাঁড়িয়ে ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র—যে কোন মুহূর্তেই ও কিন্তু চলে আসতে পারে।'

আমি পারভীনের বিছানার দিকে এগিয়ে গেলাম। হাত দিয়ে বিছানাটা ছুঁয়ে একটু ঝুঁকে বললাম, 'তোমার ইঙ্গিত দেয়া ওই

সব সম্ভাবনাগুলোই আমাদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু আমি অপেক্ষা করতে আর রাজী নই, পারভীন। আমি,—আমি ওকে খুন করবো।'

পারভীনের নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল এবার। খুব দ্রুত বইছে। নিঃশ্বাসের লয়ে বোঝা যাচ্ছে সে প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। আমার বিশ্বাস ছিলো, খুনের কথা বললে পারভীন খুব উৎসাহের সাথে আমার কথাটা লুফে নেবে। কিন্তু এ অবস্থায় ওর প্রতিক্রিয়াটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ও যদি এরপর বেঁকে বসে, তবে আমি নির্ঘাত ডুববো।

চুপ করে বসে রইলো পারভীন। নিস্পন্দ। আর ওর নীরবতায় আমার গলা শুকিয়ে উঠলো। আমার বুকের ধুপ-ধুপ শব্দ ক্রমশঃ বেড়ে চললো। আমি কি হাতের তাস খেলতে কোন মারাত্মক ভুল করলাম ?

'তুমি খুন করবে···শেলীকে ?' খুব ধীর, ফিস ফিসে শোনালো ওর কথা। 'এ নিয়ে তুমি কি ভেবেছো, রাসেল ?' এবার আগ্রহ প্রকাশ পেলো গলায়।

ভয়ানক দুঃশ্চিন্তার মেঘ কেটে গিয়ে যেন ঝলমল করে রোদ উঠলো। আমি সে-রোদে সানন্দে অবগাহন করে নিজের মনকে হালকা করলাম। আমি যে তাই চাই। পারভীনও এগিয়ে আসুক। ওকে ছাড়া যে আমি সামনে এগোতে পারছি না। ওর সহযোগিতা ছাড়া আমার পরিকল্পনা কোন কাজে লাগানো যাবে না।

আমার বুকের ধুপধাপ দূর হয়ে গেলো। সিগারেট বের করলাম। দলে টানতে পারার আনন্দে ওকেও একটা এগিয়ে দিলাম। ততক্ষণে অন্ধকার চোখে অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। ও সিগারেট নিলো না। দেশলাই-এর কাঠির আলোতে আমি ওর দিকে তাকালাম। একদৃষ্টিতে পারভীন আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ওর মুখটা কি রক্তশূন্য ?

আমি মনে মনে হাসলাম। একদিকে পঞ্চাশ হাজার টাকার স্বপ্ন, অন্যদিকে খুন করার মতো একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের কথা, ওকে ভীষণ কাহিল করে ফেলেছে। বললো, 'কিভাবে কাজটা করবে, তা যে কিছু বলছো না ?'

খুন করার ব্যাপারে পারভীন নিজে কি এখন খুব তাগাদা অনুভব করছে ?

'কিভাবে করবো তা নিয়ে তোমাকে মোটেও ভাবতে হবে না। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তার আগে বলো, এ কাজ করলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে কি না।'

'বিয়ে ? তোমাকে সেদিনই বলেছি আমি বিবাহিতা। তুমি নিজেই দেখেছো, আমার স্বামী শাহেদ খান এখনো জীবিত।'

'সেটা কোন সমস্যাই নয়। এতগুলো টাকার মালিক হতে পারলে যা খুশি তাই করা যাবে। তবে হ্যাঁ, তোমার কাছ থেকে আমি কথা চাই। বিবাহ বিচ্ছেদের তিন মাস পরই আমাদের বিয়ে হবে। এ ব্যাপারে তুমি রাজী না হলে,

এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না হচ্ছো, ততক্ষণ আমিও কাজে হাত দেবো না।'

'কিন্তু হুট করে তো আর একটা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো যায় না।'

'এর জন্যে যে সময়টা লাগবে সে-সময়টা আমরা দু'জনে স্বামী-স্ত্রীর মতো ঘুরে বেড়াবো। আনন্দ করবো। জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করবো।'

'কল্পনাটা কি একটু বেশি রকম হয়ে যাচ্ছে না?'

'মোটেও না, শেলী মারা যাওয়ার পর মুহূর্ত থেকেই আমি তোমার সঙ্গ চাই, পারভীন। তোমাকে চোখের আড়াল করা··· পারভীন, তোমার কথা যে আমি কতখানি ভাবি তা তোমাকে কোনদিন বোঝাতে পারবো না। জানি না, তুমি আমাকে কতটুকু ভাবো। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, তুমি···তোমাকেই আমি ভালোবেসেছি। তুমি ছাড়া আর কোন মেয়েই এমন করে আমার রক্তে নাচন তুলতে পারেনি।'

থামলাম আমি। আমার মনের প্রচণ্ড আবেগ যেন হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠলো। হৃদয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করার আনন্দে যেন আমি কাঁপছি।

'তুমি আমাকে নিয়ে ভাবো কি ভাবো না, ভালবাসো কি বাসো না,—কোন কিছুই আমি জানতে চাইবো না, পারভীন। আমি জানি শুধু তোমাকে। তোমাকে পেলে আমি সুখী হবো। তুমি শুধু বলো, পারভীন, শেলী মারা গেলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

'তুমি যখন এমন করে চাইছো, আমি তোমাকে ফেরাবো না, রাসেল। ঠিক আছে, কথা দিলাম, আমি তোমাকে বিয়ে করবো।'

বিশ্বাশ করুন, পারভীনকে এত সহজে রাজী করাতে পারবো তা কখনো ভাবিনি। হ্যাঁ, খুব বেশি তাড়াতাড়ি রাজী হওয়া সত্ত্বেও আমি ওকে একবিন্দু বিশ্বাসও করি না। ওর জন্যে আমার একটা উদগ্র কামনা থাকলেও আমি ঠিক জানি, এখনো শাহেদ খানকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে ও।

আমি ওর জন্যে পাগল হতে পারি, কিন্তু জেনেশুনে আমি প্রাণে মরতে রাজী নই। শেষ পর্যন্ত দু'দিক থেকে ফাঁকে পড়ে সব হারাবার পাত্র আমি নই।

সিগারেটটা শেষ টান দিয়ে ফেলে দিলাম। বসলাম বিছানায়। ওর মুখোমুখী। একদম কাছে।

'তুমি রাজী হয়েছো বলে আমার খুব আনন্দ লাগছে। কিন্তু তারপরেও আমার কিছু কথা আছে, পারভীন। শোন,—টাকার ভাগীদার যেমন আমরা দু'জনেই হবো, তেমনি ওকে খুনের দায়িত্বও আমরা দু'জনে সমান ভাবে ভাগ করে নেবো। আমার মতোই তোমারও এর মাঝে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে এবং সমস্ত ব্যাপারটা সফল করতে সে-ভূমিকাটা আন্তরিক ভাবে তোমায় পালন করতে হবে। কাজ শেষে তুমি যদি মত বদলাও, আমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে তোমার মাঝে যদি বিন্দুমাত্র সংশয় দেখা দেয়, তবে আমি স্বেচ্ছায় পুলিশের হাতে ধরা দেবো। তার অর্থ, তুমিও ধরা পড়বে।

সুতরাং সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তুমি চিন্তা করে নাও। চাইলে সময়ও দিতে পারি তোমাকে। আমি না হয় আবার কাল রাতে আসবো। শুনবো তোমার কথা।'

চলে আসার জন্যে আমি বিছানা থেকে উঠে পড়তে চাইলাম।

ঝট্ করে আমার হাতটা চেপে ধরলো পারভীন।

'বসো, রাসেল। আমি আর সময় নিতে চাই না। আমার এ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত—আমি তোমাকে বিয়ে করবো। এতে কোন নড়চড় হবে না। আমি বুঝতে পারছি, তোমাকে পেলে আমিও আনন্দ পাবো। সুখী হবো। প্রত্যেকটা মেয়েই তাই চায়। কিন্তু রাসেল,⋯কাজটা খুব নিরাপদে হওয়া চাই।'

তীব্র আবেগে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। নরম আবেশে পারভীন আমার বুকে নিজেকে এলিয়ে দিলো। পাতলা রাত্রিবাস ওর পরনে। সে-পাতলা আবরণে ঢাকা ওর কবোষ্ণ বুকের উত্তপ্ত ছোঁয়া আমার মনের মধ্যে পাগলা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। ওকে শক্ত করে বুকে চেপে ধরে মাথার চুলে গাল ঘষতে ঘষতে পাগলা ঘোড়াটার রাশ টেনে ধরলাম। এখন তো ভালোবাসার সময় নয়। এখন তো হৃদয়ে হৃদয় রেখে আদর করার সময় নয়। অফুরন্ত সে সময় তো আমাদের আসছেই। তখন ভালোবাসা, আর আদর, আর আনন্দে আমরা কাটিয়ে দেবো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। তখন পারভীন তো শুধু আমারই থাকবে।

'পারভীন,⋯খুন করা কিন্তু কখনো নিরাপদ নয়। তবে আমার পরিকল্পনা মতো কাজটা সমাধা করতে পারলে

তা নিরাপদ হতে পারে। সব কিছুই নির্ভর করবে তোমার ওপর।' ওকে একটু আলগা করে আবার বললাম, 'কাল রাতের ব্যাপারটা আমার সারা গায়ে এখনো জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। আমি কোন মেয়ের সঙ্গে বাইরে ছিলাম—ওর এই বিশ্বাস-টাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু উত্তেজনায় শেলী যেন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললো—আমার গালে সাঁ করে এক চড় কষিয়ে দিলো। আর আমিও ওকে ধরেছিলাম—ঘাড়টা মট্‌কে দেবার ইচ্ছেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। ভাগ্য ভালো, পুলিশের সেই গোয়েন্দা লোকটি এসে আমাকে ছাড়িয়ে দিলো। অবশ্য আবার বললো যে, এ ধরনের পরিস্থিতি হলে সে তার বৌয়ের গলা টিপে মেরেই ফেলতো। গোয়েন্দা প্রবর বিদায় নেবার সময় আমার জামা আর কোটে লেগে থাকা ঠোঁটের রং দেখিয়ে আবার ঠাট্টাও করলো।'

'ঠোঁটের রং প্রসঙ্গে অন্য কিছু সে ইঙ্গিত করেনি তো?'

'না। এখন কথা হলো, শেলীর সাথে ঝগড়ার সূত্রপাতটা পুলিশের গোয়েন্দা নিজ চোখেই দেখে গেলো। সুতরাং শেলীর কোনরকম দুর্ঘটনার কথা শুনলেই সে ভেবে নেবে যে আমিই ওকে খুন করেছি। শেলীর প্রতি কোন আকর্ষণ নেই, ওকে ভালবাসি না, তাই ওকে খুন করা আমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। ওর মৃত্যুতে লাভ সবটুকু আমারই। এ সব কারণ মিলিয়ে সে যদি ভাবতে শুরু করে যে আমিই খুন করেছি—তবে নেহায়েত মন্দ হবে না। আমি যদি পরিষ্কার ভাবে দেখাতে পারি যে খুন করা আমার পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়, তখন এই লাইনের

চিন্তা ভাবনা বাদ দিয়ে সোজা ভাববে, এটা সত্যিই দুর্ঘটনা। আমার ওপর কোন সন্দেহ আসবেই না ওর মনে।'

ওকে জড়িয়ে থাকা আমার হাত দু'টো জোরে চেপে ধরে পারভীন আমার আরো ঘনিষ্ঠ হলো।

'আমার মাথায় কিছুই আসছে না, রাসেল,' ওর গলা কাঁপা কাঁপা, 'আমার ভয় করছে···কাজটা কি ঠিক ভাবে হবে?'

'গাড়ির সামনের চাকা ফেটে গেলে কি ঘটতে পারে তা তো তুমি দেখলেই। কাল রাতে হোটেল থেকে ফেরার পথে যা ঘটেছিলো তা এর মধ্যে তো তোমার ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমরা আশ্চর্য ভাবে রেহাই পেয়েছিলাম, গাড়িটা বালিয়াড়িতে আটকে গিয়েছিলো বলে। এই বাড়ি থেকে বের হয়ে শহরে যাবার পথে তিন মাইলের মাথায় যে টিলাটা আছে, তার পাশেই রয়েছে একটা গভীর খাদ। খাদটাকে ডান দিকে রেখে রাস্তাটা টিলার গা বেয়ে বেঁকে গেছে। সে-বাঁকটা দিয়ে যেতে শেলীরও ঘটবে ঐ একই ধরনের ঘটনা···কিন্তু সেখানে কোন বালিয়াড়ি থাকবে না বলে ওর পতন কিছুতেই রোধ হবে না।'

আমার বাহুতে পারভীনের মুঠো আরো শক্ত হলো।

'তোমার খেয়াল আছে কিনা জানি না, হোটেলে যাবার জন্যে আমি ওর গাড়িটাই নিয়েছিলাম। গাড়ির পেছনের বুটে ফাটা চাকাটা আমি রেখে দিয়েছি। ধরো, এর মধ্যে রাতে নিশ্চয়ই শেলী বের হবে। তখন ড্রাইভার গোমেসকে আটকাতে হবে। তোমার সে-ওষুধটা তাকে খাইয়ে দিলেই চলবে।

ড্রাইভার অসুস্থ হলে, শেলী নিজেই গাড়ি নিয়ে বের হবে। গাড়ি নিতে শেলী গ্যারেজে যাবার আগেই আমি ওখানে থাকবো। সেখানে পৌঁছা মাত্রই ওর মাথায় আমি আঘাত করবো। তারপর ওকে নিয়ে আমি নিজেই গাড়ি চালিয়ে পথের সে বাঁকটার কাছে যাবো এবং ডান দিকের চাকাটা খুলে ফাটা চাকাটা লাগিয়ে দেবো। তারপর শেলীকে ড্রাইভিং সীটে বসিয়ে গাড়িটা খাদের দিকে ঠেলে দিলেই কাজ শেষ।'

সিগারেট ধরালাম। দেশলাইএর কাঠির আলোয় পারভীনের দিকে দেখলাম। ওর চোখে মুখে উত্তেজনার ছাপ।

'তারপর, তারপর বলো, রাসেল।'

'কাজটা এ পর্যন্ত খুব সহজ। কিন্তু পুরো কাজটা সূক্ষ্মভাবে সারতে হবে। সেটা খুব সহজ নয়। কারণ—যে মুহূর্তে গোয়েন্দা কবীর হোসেন এ দুর্ঘটনার কথা শুনবে, সেই মুহূর্তেই আমার কথা তার মনে ভেসে উঠবে—ভাববে, আমিই এ কাজ করেছি। সুতরাং তার এই ভাবনাকে ঠেকাতে হলে ইস্পাতের মতো শক্ত এক অ্যালিবাই দাঁড় করাতে হবে। সেই অভেদ্য অ্যালিবাই হবে আমাদের বর্ম। আর তা তৈরিতেই তোমাকে তোমার ভূমিকা পালন করতে হবে যথাযথ ভাবে। তা যদি তুমি নির্ভুল ভাবে করে যেতে পারো, তবে আমাদের কোন ভয় থাকবে না।'

'আমার ভূমিকাটা কি হবে ?'

'পুরো ছকটার মূল কথা হলো, আমাকে একই সময়ে দু'টো জায়গায় থাকতে হবে। অর্থাৎ যখন আমি সেই খাদের

কাছে থাকবো, তখনই তোমার সাথে পড়ার ঘরেও থাকবো। আর তা প্রমাণ করতে কয়েকজন সাক্ষী তৈরি করতে হবে, যারা বলবে ঐ সময় আমাকে পড়ার ঘরে দেখেছে, আমার কথাও শুনেছে। আসলে আমি কিন্তু সে-সময়ে সশরীরে গাড়ির চাকা বদলে গাড়িটাকে খাদের দিকে পাঠাবার কাজে ব্যস্ত। বুঝতে পেরেছো? সাক্ষীদের মধ্যে একজন থাকবে তারা মিয়া। তারা মিয়ার কথা কবীর হোসেন নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করবে, কারণ আলাপের শুরুতেই সে বুঝবে যে তারা মিয়া আমাকে যথেষ্ট ঘৃণা করে। সেই তারা মিয়াই সাক্ষ্য দেবে দুর্ঘটনার সময় আমি সত্যিই পড়ার ঘরে ছিলাম। আমি তোমাকে চিঠির ডিক্‌টেশন্ দিচ্ছিলাম। আরেকজন সাক্ষী থাকবে মুন্সী ফজলুর রহমান। তার যতটুকু সম্মান আছে, তাতে পুলিশ তাকেও সন্দেহ করবে না। কারণ, পুলিশ বুঝবে, মুন্সী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনার লোক নয়।'

'একই সময়ে দু'জায়গায় থাকার কথাটা কেমন যেন ভুতুড়ে ভুতুড়ে শোনাচ্ছে না?'

'মোটেও না। এর জন্যে শুধু দরকার ধৈর্য, সতর্কতা আর নির্ভুল অভিনয়।'

'অ্যালিবাইটা কি ভাবে সাজাবে তুমি?'

'ধরো, রাত নটায় শেলী বাড়ি থেকে বের হলো। দশ মিনিট পর তুমি তারা মিয়াকে ডাকবে। সে লাউঞ্জে আসতে আসতেই তুমি পড়ার ঘরের দরজাটা খুলে বের হবে। দরজাটা পুরো খুলে দেবে। তারা মিয়া শুনবে, আমি ঘরে বসে চিঠি

ডিক্টেট করছি। আমার চেয়ারের পেছনটা সে দেখবে, আর দেখবে চেয়ারের হাতলে আমার কনুই আর হাতের কিছু অংশ। ওর জন্যে এটুকু দেখাই যথেষ্ট। আমার মাথা, পা এসব ও কল্পনায় দেখে নেবে। কারণ মানুষের কল্পনা অনেক ফাঁক পুরণ করে দেয়। আর এভাবেই তারা মিয়ার বিশ্বাস হবে আমি ঘরেই আছি।—তুমি ওকে আমার জন্যে কফি আনতে বলবে। সে চলে যেতে চাইলে তাকে ডেকে আবার মনে করিয়ে দেবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মুন্সী ফজলুর রহমান আসবে, এবং এলে যেন তাকে সসম্মানে লাউঞ্জে বসায়। তাকে যেন কিছুতেই ঘরে না পাঠায়, কারণ আমি আধ ঘণ্টার জন্যে ভীষণ ব্যস্ত। তারপর তুমি আবার পড়ার ঘরে ফিরে আসবে। দরজা খোলা থাকবে। তারা মিয়া কফি নিয়ে আসলে তাকে ঘরে ঢুকতে দেবে। কিন্তু সাবধান, আমার চেয়ার আর তারা মিয়ার মাঝে তুমি অবশ্যই দাঁড়িয়ে থাকবে। ইশারায় তাকে দরজার কাছের টেবিলটায় কফি রাখতে বলবে এবং কোনরকম শব্দ করতে নিষেধ করবে। তখন আমার গলা শোনা যাবে, আমি ডিক্টেশন দিচ্ছি। তারা মিয়া চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে দেবে। এরপর মিনিট পনেরোর মধ্যেই মুন্সী এসে যাবে। তারা মিয়া তাকে লাউঞ্জে বসাবার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি আবার ঘর থেকে বের হয়ে আসবে। এবারও দরজাটা খোলা থাকবে। ওরা দু'জনেই দেখবে আমি চেয়ারে বসে আছি। মুন্সীকে বলবে, আমি একটা জরুরী ডিক্টেশন প্রায় শেষ করে এনেছি। দশ মিনিটের বেশি লাগবে না।

ঘরে ফিরে তুমি আবার দরজা বন্ধ করে দেবে। ব্যাপারটা মোটামুটি এই—পারবে বলে তোমার মনে হচ্ছে?'

'ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু কিভাবে কি ঘটবে তা কিন্তু বললে না।' পারভীনের আগ্রহ বেশ উৎসাহজনক।

'কতকগুলো চিঠি ডিক্‌টেট করা টেপ আগেই রেকর্ড করা থাকবে। তোমার কাজ হবে টেপটা সময় মতো চালানো যাতে তারা মিয়া ও মুন্সী ফজলুর রহমান দু'জনেই আমার গলা শুনে সাক্ষী দিতে পারে যে আমি ঘরেই ছিলাম। একটা তারের কাঠামো আর জামা দিয়ে চেয়ারের হাতলে আমার হাত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। একটা হাতল ওয়ালা চেয়ার এমন ভাবে ঘরে বসাতে হবে যেন সেটার পেছন দিক দরজার দিকে থাকে। তাহলে গলার স্বর আর হাতের ব্যবস্থা হলো। এবার হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ঠিকমতো বসাতে পারলে আমার ঘরে থাকার ব্যাপারে আর কারো অবিশ্বাসই থাকবে না। তুমি যখন পড়ার ঘরে কাজ করবে, আমি তখন চাকা বদ্‌লাচ্ছি। কাজ শেষে আমি দ্রুত ফিরে এসে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকবো। তারপর চেয়ারে রাখা জামা, যেটা সাক্ষী দু'জনে দেখবে, ওটা পরে দরজা খুলে লাউঞ্জে আসবো। মুন্সীকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্যে ওর কাছে মাফ চেয়ে নেবো। ব্যাপারটা এখন তোমার মাথায় আসছে তো? সমস্ত ব্যাপারটাকে মাথায় রেখে, এবং তোমার স্নায়ু যদি তোমার সাথে হটকারিতা না করে তবে আমার কথামতো কাজ করে গেলে এই অ্যালিবাই হয়ে দাঁড়াবে একদম দুর্ভেদ্য। এখন তুমি

চিন্তা করে বলো, তোমার মাথায় কোন প্রশ্ন জাগছে কিনা; ভেবে দেখো, কোনরকম ফাঁক থেকে যাচ্ছে কিনা কোথাও।'

আমার দিকে একটু ঝুঁকলো পারভীন। ওর ডান হাতটা রাখলো আমার বাঁ কাঁধে। নখ দিয়ে কাঁধের জামাটা খুঁটতে খুঁটতে বললো, 'মুন্সীর যদি আসতে দেরি হয়? টেপ যদি ফুরিয়ে যায়?'

'ভালো প্রশ্ন তোমার। আমরা যে টেপ রেকর্ডারটা ব্যবহার করবো, তাতে ঐ বড়ো টেপ স্লো স্পীডে এক ঘণ্টা চালাতে পারবে। তবু যদি ঝুঁকি নিতে না চাও তবে তারা মিয়া কফি রেখে চলে যাবার পর টেপ বন্ধ করে দিতে পারবে। মুন্সী লাউঞ্জে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আবার তা চালু করে দিলেই চলবে। কিন্তু সেই সময়ে তোমাকে খুব সতর্ক ভাবে আর একটা কাজ করতে হবে। নিখুঁত ভাবে কাজটা সম্পন্ন করার ওপরই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে। তুমি যখন ঘর থেকে বের হয়ে লাউঞ্জে মুন্সীর সঙ্গে কথা বলবে, তখন আমিও ঘর থেকে 'একটু বসো মুন্সী, আমার বেশি দেরি হবে না' কথাটা ওকে বলবো। অর্থাৎ কথাটা আগেই টেপ করা থাকবে। তোমাকে শুধু ঠিক সময় মতো টেপটা বন্ধ ও চালু করতে হবে। এটা অবশ্য মহড়া দিয়ে ভালমত অভ্যাস করে নিতে হবে। এই চালাকিটা সম্পূর্ণই সময় জ্ঞানের ওপর নির্ভর করবে। টেপের আগে পিছে চিঠির ডিকটেশন আর মাঝে ওই কথাটা এমন জায়গায় রেকর্ড করতে হবে যেন ঠিক সময় মতো ওই কথাটা টেপ থেকে বের হয়ে আসে।'

'বেশ কঠিন হবে কিন্তু কাজটা, রাসেল।'

'কঠিন হলেও তা আমাদের করতেই হবে।'

'মহড়া না দিয়ে বলতে পারবো না ঠিক যেমন চাইছো তেমন হবে কি হবে না। আরেকটা কথা, রাসেল, গ্যারেজ থেকে গাড়ির শব্দ বাড়ির ভেতর থেকেও শোনা যায়। শেলী যদি ঘর থেকে নটায় বের হয়, গাড়ির কোন আওয়াজই শোনা না যায়, তারা মিয়ার মনে সন্দেহ জাগতে পারে। সে হয়তো গ্যারেজে যাবে শেলীর কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা দেখতে। তখন কি হবে?'

'তোমার মাথায় তো বেশ বুদ্ধি খেলছে দেখছি। ভাল, খুব ভালো। এ ধরনের কাজে এমনি ছোটখাট ভুল করে ফেলা বিচিত্র নয়। তাইতো তোমার সাথে আলোচনা করে ফাঁকগুলো বের করে নিতে চাই।' হাতের সিগারেটটা ফেলে আরেকটা ধরলাম। 'তারা মিয়ার মনে এ সময়ে কোনরকম সন্দেহ জাগার সুযোগই আমি দেবো না। শেলীকে আঘাত করেই গাড়িতে তুলে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবো। মুন্সীর গাড়ি আমাদের ক্রস না করা পর্যন্ত পথেই কোন আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকবো। সে চলে গেলে আমি ঐ বাঁকটার কাছে গাড়ি নিয়ে যাবো।

'রাসেল, খাদের ধারে রাস্তাটার বাঁকে বেড়া দেয়া আছে সে-কথা কি তুমি ভুলে যাচ্ছো? সে-পথে আসার সময় হেড লাইটের আলোতে বেড়াটা যে ঠিক আছে তা মুন্সীর নজরেও পড়তে পারে। অথচ তুমি ব্যাপারটা এমন ভাবে বোঝাতে

চাইছো যে দুর্ঘটনাটা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে।'

'ঠিক ধরেছ তুমি। বিষয়টা আমার মাথায়ই আসেনি। সময়ের গ্যাপ আমাদের আরো কমাতে হবে। মুন্সীকে আরো আগে আনতে হবে। কাজটা তাহলে এভাবে হবে, দূর থেকে মুন্সীর গাড়ির আলো দেখতে পাওয়া মাত্রই আহত শেলীকে আমার কোলে বসিয়ে নেব। ওর হাত দুটো স্টিয়ারিঙে থাকবে। এই অবস্থায় শেলীর নিচে বসে আমিই খুব জোরে গাড়ি চালাতে থাকবো। সময়ের প্রশ্নে মুন্সীও খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে আসবে। দুটো গাড়ি অতিক্রম করার সময় সে শুধু শেলীর মার্সিডিজ গাড়িটা দেখবে। শেলীকেও এক ঝলক দেখতে পারে। আমি তখন একদম নিচু হয়ে গাড়ির ভেতর প্রায় ডুবে থাকবো। তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, মুন্সী যখন খবরটা জানবে—সে ভাববে, তার গাড়িটা ক্রস করে আসার কয়েক সেকেণ্ড পরই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে।'

'সময় নিয়ে কিন্তু খুব সমস্যা দেখা দিতে পারে। মুন্সী যদি আগে এসে যায়?'

'তা কক্ষণো হবে না। মুন্সীর অভ্যাস সবসময়ই দেরি করা। তবে সেদিন যেন সময় মতো আসে সে-কথা তাকে বিশেষ করে বলতে হবে।'

'এত দূরে ঘটনা ঘটিয়ে তুমি আবার ঠিক সময় মতো কি করে ফিরে আসবে, রাসেল? ওইটুকু সময়ের মধ্যে সে-পথটা হেঁটে আসাও যে সম্ভব নয়।'

'সমস্যা বটে। আচ্ছা, তুমি তো ড্রাইভিং জানো?'

'জানি, তবে খুব একটা ভাল না।'

'কিন্তু এখন চালাতেই হবে। এর মধ্যেই নিজে গাড়ি নিয়ে গিয়ে সে-জায়গাটার আশপাশে গাড়িটা লুকিয়ে রাখার একটা জায়গা দেখে এসো। সেদিন গাড়িটা নিয়ে ওখানে রেখে আসবে।'

'বুঝেছি। তা পারা যাবে।'

ঘড়ি দেখলাম। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

'তাহলে, পুরো পরিকল্পনাটা এবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার ভেবে দেখ। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। চিন্তা ভাবনা করে, ত্রুটিগুলো বের করতে হবে। কোনরকম ভুলই আমাদের করা চলবে না।'

'নিশ্চয়ই, এ নিয়ে ভাল করে ভাবতে হবে।'

'তুমি তো ওর রোজকার প্রোগ্রাম আগে থেকেই জানো। সন্ধ্যের পর ও কবে বের হবে আমাকে অবশ্যই জানাবে। তার আগেই আমাদের তৈরি হয়ে নিতে হবে।'

'তাই করবো।'

শেলীকে খুন করার পরিকল্পনাটা মাথার ভেতর চেপে বসার পর থেকে খুবই অস্থিরতার মধ্যে ছিলাম। পারভীনের সঙ্গে আলোচনা করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সূচনা করতে পেরে নিজেকে বেশ হালকা লাগলো। উঠে পড়লাম। অন্য কারো ঘুম ভাঙার আগেই নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে।

'তাহলে পারভীন, আজ এ মুহূর্ত থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু হলো।'

'আমাদের যাত্রা সফল হোক।'

'তোমার কোনরকম ভয় করছে না তো?'

'একটু যে না করছে তা নয়।'

'তুমি শক্ত থাকতে পারলে কোন ভয় নেই। কেননা, সাক্ষী সৃষ্টি করার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা তোমাকেই করতে হবে।'

'আর তোমার দিকটা...'

'সে আমি ঠিক সামলাতে পারবো। তাহলে, আমি এখন যাই। আমাদের যৌথ দায়িত্ব এখান থেকেই শুরু হলো কিন্তু।'

সামনে ঝুঁকে আলতো করে ওর ঠোঁটে চুমো খেলাম।

দু'হাত বাড়িয়ে পারভীন আমার গলা জড়িয়ে ধরলো।

'হ্যাঁ, এখান থেকেই শুরু হলো।'

'এবং তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

'আমি তো তোমাকে কথাই দিয়েছি, তোমার সঙ্গে ঘর বাঁধবো।'

'আমাদের জীবনটা সত্যি খুব আনন্দময় হয়ে উঠবে। তবে এটা জেনো, শেলীর টাকার চেয়েও তুমি কিন্তু আমার কাছে বেশি প্রিয়। তোমাকে একান্ত আপন করে কাছে পেতে চাই।'

'ভেবো না, দুটোই তোমার হবে।'

ওর হাত দুটো নামিয়ে চিবুকটা একটু নেড়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙলো। স্নান করলাম। শরীরটা

বেশ ঝরঝরে লাগলো।

সে-রাতের পর আর শেলী আমার মুখোমুখী হয়নি। মনে হলো, ব্যাপারটা এবার মিটমাট করে ফেলা ভালো। ও ধরনের চিন্তা যদি ওর মনে গেঁথে যায় তবে আমার প্রতি তার একটা বিদ্বেষ ভাব আরও সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে। শেলী তখন উইলটা বদলেও ফেলতে পারে। ওর খাম-খেয়ালী স্বভাবে কিছুই অসম্ভব নয়। আমি যেন হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে আবার হাতের মুঠোয় নিয়ে আসা দরকার।

সে-রাত থেকে ওর মনে নিশ্চয় এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, আমি কোন মেয়ের সঙ্গে বাইরে ছিলাম।

এখন সমস্যা হলো, ওর মতো মেয়ে যা বুঝে বসে আছে, তাকে ভিন্ন কিছু বিশ্বাস করানো সত্যি কঠিন ব্যাপার। তাছাড়া বন্ধুর গল্পটা না ফাঁদলে হয়তো বোঝানোর চেষ্টা করে দেখা যেতো। কিন্তু এখন বন্ধুর কথা নিয়েই এগোতে হবে···

শেলীর ঘরের নাম্বারে ডায়াল করলাম।

'কে?' রুক্ষ স্বরে তেড়ে উঠলো শেলী।

'আমি রাসেল। তোমার সঙ্গে···'

'না। আমার সঙ্গে যে এরপর আর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না, একথা তোমার বোঝা উচিত।' রাগে যেন ফুঁসছিয়ে রয়েছে শেলী।

'সেদিনের ঘটনায় আমি খুব লজ্জিত, শেলী। সে-ব্যাপারে আমার কিছু বলার আছে, আমি তোমার কাছে অকপটে

স্বীকারোক্তি করতে চাই।'

'কিসের স্বীকারোক্তি ?'

আমার কথায় কাজ হয়েছে বলে মনে হলো।

'টেলিফোনে সেকথা বলা যায় না। তোমার ঘরে গিয়ে বলতে চাই।'

অত্যন্ত অনুগতের মতো গলার স্বরে একটা পরাজিত ভাব ফোটাবার চেষ্টা করলাম। তাকে যে গলাতে আমার হবেই।

গাম্ভীর্য পুরোপুরি বজায় রেখে শেলী বললো, 'ঠিক আছে। আধঘন্টা পর এসো, আমি স্নানটা করে নেই।'

ফোন নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবলাম, আর কদিনই বা দেখাবে···দিন তো বুঝি ফুরিয়ে এল। ঘড়ি দেখলাম, এগারোটা।

ওর দরজার পর্দা তুলে ভেতরে যখন ঢুকলাম তখন সাড়ে এগারো।

ভেজা চুল পিঠে ছড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে আছে শেলী। পরনে হলুদ শাড়ী। স্নানের পর মেয়েদের যে স্নিগ্ধতা ফুটে ওঠে তার ছিটেফোঁটাও ওর মাঝে খুঁজে পেলাম না।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। শেলী যেন আমাকে দেখেও দেখছে না। আপন মনে চুল আঁচড়াচ্ছে।

'আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, শেলী।' আমার কথার স্বর ও ভঙ্গিতে যথেষ্ট বিনয় ফুটিয়ে তুললাম। 'আমি জানি, আমার কথা শোনার পর তুমি আর আমার ওপর রাগ রাখতে পারবে না। তুমি তো ধরেই রেখেছো, সত্যি সত্যি আমি কোন

মেয়ের সঙ্গেই বাইরে ছিলাম। তুমি মনে করেছো…’

‘আমার মনে কি ছিল বা আছে তা আমি শুনতে চাই না।’

‘আসলে আমি পুরোনো বন্ধুর পাল্লায় পড়ে খুব বেশি মাত্রায় মদ খেয়ে ফেলেছিলাম। বিশ্বাস করো, আমি তা করতে চাইনি, কিন্তু বন্ধুটি এমন জোর করল যে…’

‘আর তুমি বেহদ্দ মাতাল হয়ে রাত দুপুরে বাড়ি ফিরলে। বাইরের লোকের সামনে বৌয়ের সঙ্গে ভদ্র আচরণ করার কথাও ভুলে গেলে।’

‘ঠিক তাই। কিন্তু তোমার সঙ্গে এমন একটা বেসামাল ব্যবহার করে বসবো তা কিন্তু ভাবিনি। শেলী, আমাকে এর আগে নিশ্চয়ই তুমি…’

‘বন্ধুর পাল্লায় পড়ে শুধু কি মদই খেয়েছিলে, না অন্য কিছু…অন্য কোন মেয়ের পাল্লায় পড়ে আমাকে অপমানের সাহস পেয়েছি।’

হায়রে বেচারী! আমাকে হারাবার আতঙ্ক তোমার এত বেশি!

‘এ সব তোমার অমূলক ভাবনা, শেলী।’

‘আমি কি করে বিশ্বাস করতে পারি?’

‘নিজে যেচে এসে স্বীকারোক্তি করার পরও তোমার সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার আগে আমার মরণও ভালো।’

‘রাসেল!’ শেলী চমকে উঠে আমার দিকে তাকালো।

‘তুমি আমাকে দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস করতে পারো, শেলী।’

'ওহ্, কি যে কষ্ট হচ্ছিল—আমি তাই করবো, তাই করবো, রাসেল।'

'তোমার সন্দেহ দূর করতে আমাকে এও বলতে হচ্ছে, শেলী, আমাদের ভালোবাসা তো এখনো মরে যায়নি। অন্য কিছুর চেয়ে ভালোবাসার মহিমা আমার কাছে অনেক বড়। এর মর্যাদা আমার কাছে অনেক পবিত্র।'

'রাসেল, আমার রাসেল।' উঠে আমার সামনে দাঁড়ালো শেলী। 'আমি সত্যি সেদিন ভয় পেয়েছিলাম। আমার মনে বারে বারে কেন যেন উঁকি দিচ্ছিলো, তুমি অন্য মেয়ের প্রেমে পড়েছো। তুমি জানো না···জানো না, ওই কথা ভাবতে গিয়ে আমার হৃদয়টা···আমার হৃদয়টা কিভাবে মোচড় দিয়ে···'

শেলীর চোখ থেকে হঠাৎ জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো। আমি ওকে বুকে টেনে নিলাম। ওর কান্নার বেগ আরো বাড়লো। আবেগে আমার মুখে মুখ ঘষলো। আমার মাথার চুলে ওর হাড্ডিসার আঙ্গুল দিয়ে বিলি কাটলো।

'রাসেল, মদ খেয়ে মাতাল হওয়ার জন্যে আমি কিছুই মনে করছি না। তুমি তা বাড়িতেও করতে পারতে।'

'না, তেমন কিছু আমি আর করতে চাই না।'

'কিন্তু আমার এখন দুঃখ লাগছে, আমি তোমাকে অযথা সন্দেহ করেছিলাম। আমাকে তুমি ক্ষমা করো, রাসেল।'

এখন বুঝুন, কত সহজে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেললাম। সত্যি, অজস্র টাকা থাকলে কি হবে, কাঙালীরও অধম বেচারী। আকণ্ঠ হাবুডুবু খাচ্ছে আমার প্রেমে। একটু করুণা হলো

ওর ওপর—ঘৃণা মিশ্রিত করুণা। দাঁড়াও, শালী—বের করছি তোমার প্রেম।

জনাব কমিশনার সাহেব, আমি দেখতে পাচ্ছি ক্যাসেটটা প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

আমি নিশ্চিন্ত, শেলীকে যে আমি খুন করেছি সে-ব্যাপারে আপনার মাঝে নিশ্চয় আর কোন সন্দেহ নেই। তবে খুনের পরিকল্পনাটা···

খুনের দায় থেকে আমি কিন্তু বাঁচতে চেয়েছিলাম। বাঁচতে পারলাম কি? আমার সাধ, টাকা আর পারভীন—পূরণ হলো কি?

সব···সবই বলছি আমি। দয়া করে ক্যাসেটটা উল্‌টিয়ে শুনে নিন।

[আগামী খণ্ডে সমাপ্য]

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan

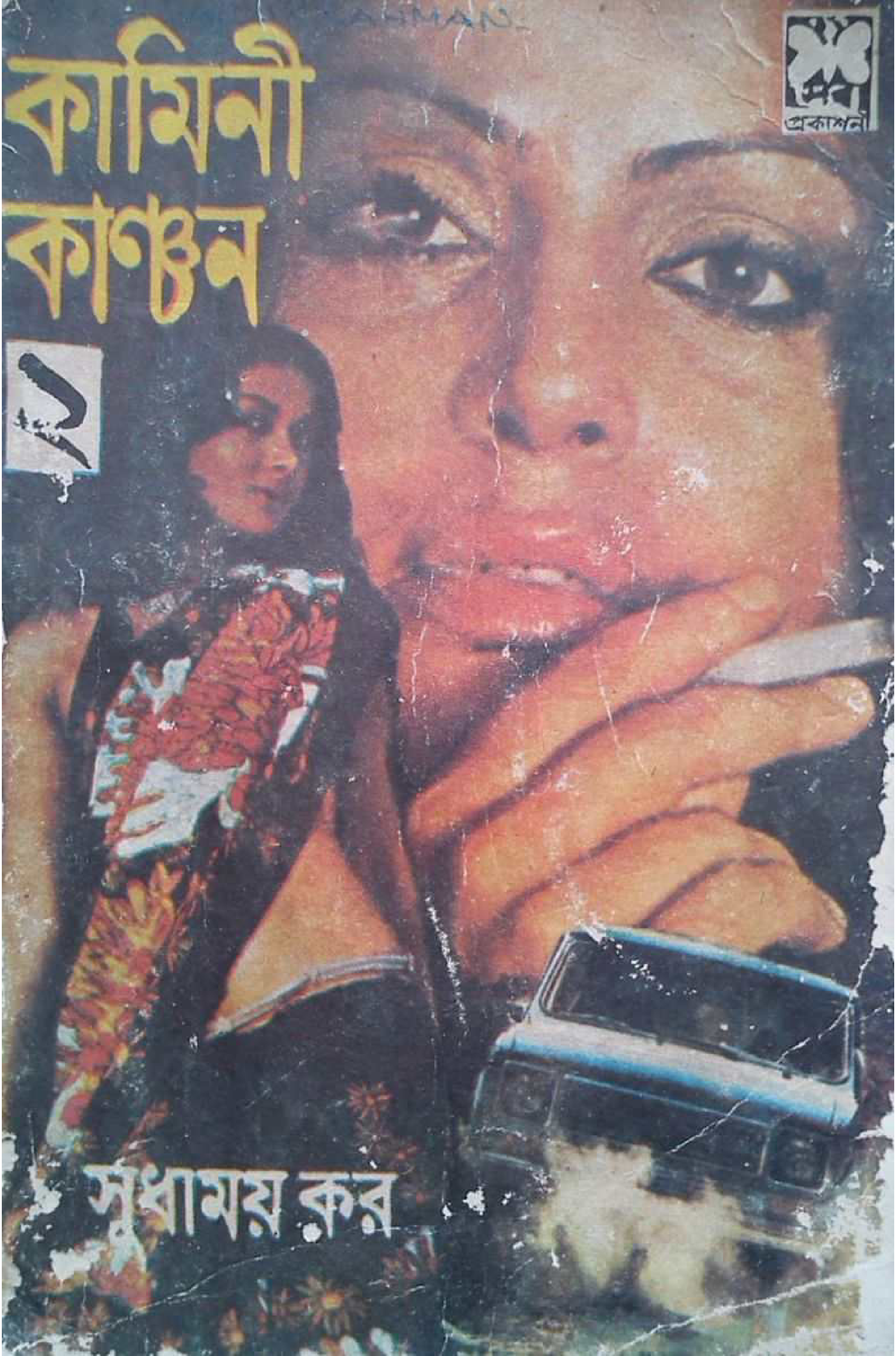
কামিনী
কাঞ্চন
২
সুধাময় কর
প্রকাশনী

কামিনী কাঞ্চন-২

এক সময় মনে হয়, টাকাই বুঝি সব—
টাকার পেছনে ছুটি।
টাকা পেলে মনে হয়, ও দিয়ে কি হবে—
যদি মনের মানুষই না পেলাম?
ছুটি তার পেছনে।
তার জন্যে খুন করতেও দ্বিধা নেই।
তারপর যদি দেখি, মেয়েটা ঠকিয়েছে আমাকে;
টাকাও গেছে, মনের মানুষও নেই—তখন?
তখন কি করি?

কামিনী ও কাঞ্চন, লালসা ও লোভ—
ভেসে তো গেছি। এখন থৈ পাই কোথায়?
কেন যে মানুষ কি করে, যদি বুঝতাম!

দশ টাকা

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

প্রকাশক :

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রকাশনী

১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৮০

প্রচ্ছদ : শাহাদত চৌধুরী

রচনা : বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রণে :

মো: রুহুল আমিন

পলাশ মুদ্রণ

২৪, মোহিনী মোহন দাস লেন

ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :

সেগুনবাগান প্রকাশনী

১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

দূরালাপনী : ৪০৫৩৩২

জি, পি, ও, বক্স নং ৮৫০

KAMINI KANCHAN-2

By Sudhamoy Kar

এক

ক্যাসেটটা উল্টিয়ে রেকর্ডারে আবার ঠিক মতো বসিয়ে ডালাটা বন্ধ করে দিল রাসেল। তারপর লম্বা করে দম নিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। রোদের তেজ তখনো কমেনি। বাতাসে গরম ছোঁয়া। কপালের ঘাম মুছলো রাসেল। চেয়ারের গায় পিঠ এলিয়ে সিগারেট ধরালো।

গলা পরিষ্কার করলো রাসেল। একটানা পৌনে এক ঘন্টা কথা বলতে গিয়ে গলাটা ধরে আসতে চাইছে। আরও প্রায় একই সময় কথা বলতে হবে তাকে—রেকর্ড করতে হবে পুরো কাহিনীটা। শাহেদ খান এসে পৌঁছার আগেই শেষ করতে হবে কাজটা।

পর পর ক'টা টান দিয়ে সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে দিলো। নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলো রাসেল। তারপর রেকর্ডারটা সামান্য একটু কাছে টেনে রেকর্ডিং বাটন টিপলো···

'জনাব কমিশনার সাহেব, কিছুক্ষণ আগে যে খুনটা করেছি

তার স্বীকারোক্তি করার ইচ্ছেতেই রেকর্ডিং শুরু করেছিলাম। শুরু করেছিলাম ঘটনার সূত্রপাত থেকেই। সে-ঘটনার চক্রাবর্তে এমন করে জড়িয়ে পড়েছিলাম যে, পরিণতিতে আজকের এই খুনটা অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবীর হোসেন আমাকে যেভাবে গাঁথতে চাইছে, তাতে আজকের খুনটা তার কাছে আর প্রমাণের অপেক্ষায় থাকবে না। কিন্তু সে যে কথাটা জানবে না, তাহলো, মেয়েটি কেন আমার হাতে খুন হলো। আমি এ পর্যন্ত যা বলেছি, তাতে এ প্রশ্নটা আপনার মনেও জাগছে নিশ্চয়। জাগাটাই স্বাভাবিক।'

'বলছি, শুনুন...'

কয়েক দিন পর। সকাল বেলা। অফিসে যাবো। পড়ার ঘরে বসে কাগজ পত্র গুছিয়ে ব্রীফকেসে নিচ্ছিলাম।

হাতে কিছু চিঠি পত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল পারভীন। আমার সামনে ডেস্কের ওপর সেগুলো রাখলো। চিঠিগুলোর ওপর আঙ্গুল রেখে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। ওর দৃষ্টি অর্থপূর্ণ। চলে গেলো পারভীন।

চিঠিগুলো থেকে পারভীনের দেখানো কাগজটা বেছে নিলাম। টাইপ করা। লেখা আছে—এইমাত্র শেলী মিসেস জোয়ারদারের সঙ্গে একটা দিন ঠিক করেছে। শুক্রবার। ২৮ তারিখ রাত সাড়ে নয়টা। সেখানে বেহালাবাদক ওস্তাদ মতি-লালের বাজনা শুনতে যাবে।

আমার মাঝে একটা আনন্দ শিহরণ বয়ে গেলো।

মিসেস জোয়ারদার হচ্ছেন সোসাইটির একজন ডাকসাইটে মহিলা। এক ডাকে সবাই তাঁকে চেনে। মোটা নাদুস নুদুস। কথা বলেন বেশি। শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজ সেবা—এমন ধারার সব কিছুতেই তাঁর উৎসাহ। স্থানীয় সব মহলের খবরাখবরই তাঁর কাছে থাকে। শেলীর নাকি সেজন্যেই মিসেস জোয়ারদারের সাথে ঘনিষ্ঠতা। বাইরে এখানে ওখানে না গিয়েও শেলী ওনার কাছ থেকে মোটামুটি সব খবরাখবর পেয়ে যায়।

ঢাকা থেকে ওস্তাদ মতিলাল আসার খবরটাও শেলী মিসেস জোয়ারদারের কাছেই পায়। শহরের আরও কয়েক জায়গায় ওস্তাদ তাঁর বাজনার অনুষ্ঠান করেছেন। শেলী নিজে বেহালার ভক্ত। তাই নিজের বাড়িতে ওস্তাদকে নিয়ে একটা জলসা করার খুব ইচ্ছে ছিলো। সে-ইচ্ছাতেই মিসেস জোয়ারদারকে বলতে গিয়ে জানতে পারলো, ওস্তাদের একদম সময় নেই। যে ক'দিন আছেন তার প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও তিনি আটকা। মিসেস জোয়ারদার নাকি ওস্তাদকে অনেক বলে কয়ে ওনার বাড়িতে বসার জন্যে রাজী করিয়েছেন। তার পরদিনই তিনি ঢাকা চলে যাবেন। বুঝতে পারলাম, শেষ পর্যন্ত শেলী মিসেস জোয়ারদারের জলসাতেই যাবে।

আমার হাতে তখনও পুরো তিন দিন।

একথা মনে হতেই শরীরটা কেমন করে উঠলো। এতদিন এটা ছিল শুধুই পরিকল্পনা, এখন তা বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। আর সাথে সাথেই বিবেকে কেমন একটা দংশন অনুভব করলাম।

ভয়ও পেলাম। আমার ধারণা, ভয় থেকেই জন্ম বিবেকের।

সামান্য একটু ভুল—আমি খতম।

টাইপ করা সে-কাগজটা পুড়িয়ে ছাই করে দিলাম। বাকী চিঠিগুলো ব্রীফকেসে নিয়ে অফিসে যাবার জন্যে বের হলাম। গ্যারেজের দিকে যাচ্ছি, পথের মাঝে পারভীন আমাকে ক্রস করলো।

'বৃহস্পতিবার, দুপুর দুটো। সাগরতীরের বাংলো', প্রায় ফিস ফিস করে কথাগুলো ওর দিকে ছুঁড়ে দিলাম।

চলতে চলতেই সামান্য একটু মাথা ঝাঁকালো পারভীন।

অনেক অসুবিধে থাকলেও এছাড়া আর কোন উপায় নেই। রাতে পারভীনের ঘরে মহড়া দেয়া সম্ভব নয়। কারণ এখন শেলীর সঙ্গে রাতে শুতে হচ্ছে। সুতরাং পারভীনের ছুটির দিনই একমাত্র ভরসা।

অফিসে বসেই চিঠির বাণ্ডিল থেকে কয়েকটা চিঠি বেছে নিলাম। দেরি না করে ডিক্‌টেশন রেকর্ড করতে শুরু করলাম। প্রত্যেকটা চিঠি রেকর্ড করার পর তার সময়টা লিখে রাখলাম। এবং সেই সাথে চিঠির নাম্বারটাও। এতে পারভীনের বুঝতে সুবিধে হবে, ঠিক কখন মুন্সীর জন্যে বলা আমার কথাটা আসবে।

রেকর্ডিং শেষ করে কিছুটা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। কিন্তু বাজিয়ে শুনতে পারলাম না। অফিসের স্টেনো মিস মুন্না বেগম আবার তা শুনে ঝামেলা বাধাতে পারে। এর মধ্যে একবার শেলী ফোন করেছিলো। মিসেস জোয়ারদার নাকি তাকে বলেছেন ওস্তাদ মতিলালের বাজনা শুনতে হলে

তাঁর বাড়িতে যেতে হবে। শেলীর ইচ্ছে আমিও ওর সঙ্গে যাই। আমি ওকে বলেছি, সেদিন রাতে মুন্সীর আসার কথা রয়েছে, ব্যবসা সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা বেহালা বাজনার চেয়ে অনেক জরুরী।

শেলী অবশ্য এ নিয়ে কোন রাগ বা অভিমান করেনি। ওর সঙ্গে যাবার আশা সে করে বলেও মনে হয় না। আমি অন্য কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে পালাবো না বলে বিশ্বাসটুকু যখন আছে—তখন আমি বাড়িতে থাকলে ও খুশিই হয়।

সে যাকগে, আমি এখন বুঝতে পারছি আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ঝুঁকি অনেক। তবু খুব দ্রুত সব কাজ সারতে হবে। কোন অসুবিধের কাছেই থেমে থাকা যাবে না। একবার পথে নেমে আর ফেরা যায় না।

বৃহস্পতিবার। লাঞ্চে যাবার আগে মুন্সী ফজলুর রহমানকে ফোন করলাম।

'আগামীকাল রাতে একবার চৌধুরী ভবনে আসতে পারবে কি? নতুন ইনভেস্টমেন্টটা করার আগে নিরিবিলি বসে আলাপ করে নিতে চাই।'

'ঠিক আছে, আমি আসবো।'

'আর শোন, এ ইনভেস্টমেন্টটা হবে শেলীর জন্যে নতুন চমক। তাই তুমি যেন আগে এসো না। ও যদি বিন্দুমাত্র টের পায় তবে আর আমার পিছু ছাড়বে না। তাই ঠিক রাত নয়টা পনেরোতে আসবে। ও. কে?'

'ও. কে।'

ফোন রেখে মুন্না বেগমকে ডাকলাম।

'আমি লাঞ্চের পর আর ফিরবো না।'

চাইনিজ রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ সারলাম। তারপর সোজা এই সাগরতীরের বাংলোতে। গাড়িটা কিছুদূরের ঘন জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে রেখে এলাম।

তালা খুলে ঢুকলাম। জানালাগুলো খুললাম।

মিনিট সাতেক পরেই এলো পারভীন।

ঘরের ভেতর পা দিয়েই সে আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। কিন্তু আশ্চর্য, ওকে সে-মুহূর্তে কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে জাগলো না।

পারভীনের মুখটা বিবর্ণ।

'বেশি সময় হাতে নেই, পারভীন। এসো আমরা কাজ শুরু করি।'

পারভীন তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে তারের তৈরি একটা লম্বা চোঙ বের করে বললো,

'কাল রাতে তৈরি করেছি। তোমার হাতের কাজ এতে চলবে কিনা দেখো।'

চোঙটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলাম। ওতেই কাজ হবে। ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে জামাটা খুলে ফেললাম। জামার হাতার ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম চোঙটা। একটু বেঁকিয়ে হাতার মধ্যে সুন্দর ভাবে বসিয়ে দিলাম। একটা হাতল-ওয়ালা চেয়ার নিয়ে ওতে জামাটা রাখলাম। হাতটা বসালাম চেয়ারের হাতলে। তারপর চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে দুজনেই

কামিনী কাঞ্চন-২

দেখলাম। সুন্দর। ঠিক যেমনটি ভেবেছিলাম। ঠিক যেন একজনের হাত, চেয়ারের হাতলের ওপর রাখা।

একটা ছোট্ট তার বাঁকা করে আস্তিনের কাছে রাখলে ওতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ধরিয়ে দেয়া যাবে। সিগারেট দেখা যাবে না, কিন্তু ধোঁয়া উঠবে। তা দেখেই তারা মিয়া আর মুন্সী পুরোপুরি বিভ্রান্ত হবে।

'রাসেল, চিঠিগুলো টেপ করা হয়েছে?'

'হয়েছে। তার আগে এসো সবকিছু ঠিকঠাক মতো সাজিয়ে নিই। টেবিলটা একটু ধরো। চেয়ারের সামনে, হ্যাঁ, ঠিক এভাবে রাখতে হবে।'

দু'জনে মিলে আমাদের পরিকল্পনা মতো মঞ্চ সাজালাম। টেপরেকর্ডারটা টেবিলের ওপর রাখা। চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে দিলাম। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভাল করে দেখলাম। মনে হলো সব ঠিকই আছে।

টেপ চালালাম। দরজায় দাঁড়িয়ে টেপটা পুরো শুনলাম। ওদিকে চেয়ারের ওপর একটা হাত। সিগারেটের ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে ছাদের দিকে উঠছে। টেপে চলছে ডিকটেশন। মনে হচ্ছে ঘরে যেন সত্যি আরো একজন রয়েছে।

টেপ প্রায় মাঝামাঝি আসতেই ডিক্টেশন থেমে গেলো। সামান্য একটু বিরতি। তারপর একটু গলা চড়ানো আমার কথা 'একটু বসো মুন্সী, আমার বেশি দেরি হবে না।'

আমরা দু'জনেই চমকে উঠলাম। পারভীন শুনতে শুনতে ক্রমশঃ মিয়িয়ে এসেছে। কেমন যেন একটা ভীতি ওর

চেহারায় দানা বেঁধেছে। কাঁপছে। আমরা হাতে হাত রাখলাম। আমি হাসতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। দু'জনে গা-ঘেঁষা-ঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে টেপটা শেষ পর্যন্ত শুনলাম।

'চমৎকার। এতেই চলবে।' টেপটা বন্ধ করলাম। 'পারভীন।'

'বলো।' অনেক দূর থেকে যেন ওর গলার স্বর ভেসে এলো।

'তোমাকে এটা নির্ভুলভাবে চালাতে হবে। তাই মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত বারবার বাজাতে হবে। তুমি যদি ঠিক মতো চালাতে পারো তাহলে কোন সমস্যা দেখা দেবে বলে আমার মনে হয় না।'

যে সব চিঠি রেকর্ড করেছি সেগুলোর কপি ওকে দিলাম। সেই সাথে প্রতি চিঠির জন্যে যে সময় লেগেছে তারও হিসেব ওকে বুঝিয়ে দিলাম।

বললাম, 'এ থেকে তুমি সহজেই বুঝে নিতে পারবে কখন মুন্সীর জন্যে আমার কথাটা আসবে। সমস্ত পরিকল্পনার এটাই মূল বিষয়। আর এতে যদি ভুল করো, আমাদের কোন রেহাই নেই।'

চিঠিগুলো ধরে ধরে আবার বাজাতে শুরু করলাম। এভাবে বার বার, প্রায় দু'ঘণ্টা বাজালাম। তাতে পারভীন বিষয়গুলো কোন্‌টার পর কোন্‌টা আসছে তা ঠিক করে নিতে পারলো।

'তুমি সুন্দর মনে রাখতে পারছো কিন্তু, পারভীন। এবার

এসো, পুরো ব্যাপারটা আর একবার মহড়া দিই।'

আমি তারা মিয়ার ভূমিকা নিলাম। পারভীন পরিকল্পনা মতো যেমন যেমন করতে হবে তাই করলো। একবার... দুইবার...তিনবার...অনেকবার মহড়া দিলাম। সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, এমন কি হাঁটা চলা, কথা বলা—সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মহড়া হলো। যতক্ষণ পর্যন্ত নিখুঁত না হলো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তা চালিয়ে গেলাম।

পারভীন সমস্ত আগ্রহ ও ধৈর্য নিয়ে মহড়া দিয়ে গেল। করতে করতে যখন সব কিছু নির্ভুল হলো, আমার মনের সব সংশয় দূর হলো, তখন থামলাম। আমার পরিকল্পনা এমন সুন্দর ভাবে কার্যকরী হতে যাচ্ছে দেখে আশ্চর্য এক তৃপ্তি বোধ করলাম। এ নিয়ে কারো মনেই কোন প্রশ্ন জাগতে পারবে না, আমি নিশ্চিত। তারা মিয়া বা মুন্সীর কারোই বলার সাধ্য হবে না যে আমি তখন পড়ার ঘরের বাইরে ছিলাম।

শুধু ভয় পারভীনকে। আসল কাজের সময় যদি ঘাবড়ে গিয়ে উল্টো পাল্টা কিছু করে বসে, তাড়াহুড়ো করে ভুলে গিয়ে সময়ের গোলমাল করে, আচরণে যদি কোন অস্থিরতা প্রকাশ পায় এবং তা ওদের কারো নজরে পড়ে তবে সম্পূর্ণ অ্যালি-বাইটাই নড়বড়ে হয়ে যাবে। দেখা দেবে ফাটল, যার পথ ধরে ধূর্ত কবীর হোসেন সহজেই আমাদের ধরে ফেলতে পারবে। অর্থাৎ তখন আমরা নির্ঘাৎ ডুববো।

পারভীন শেলীকে খুন করতে যতই উৎসাহ দেখাক, সময়

মতো ওর মনের জোরের অভাব ঘটা বিচিত্র কিছু নয়। সেটাই আমার ভাবনা। একটা খুনের মধ্যে জড়িয়ে যাবার মতো সাহস কি ওর সত্যিই আছে ?

ওর পিঠে হাত রেখে বুকের কাছে টানলাম। দীর্ঘ সময় ধরে মহড়া দিতে দিতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এতক্ষণ একটানা শরীর ও মনের ওপর চাপ সহ্য করা একটা মেয়ের জন্যে সত্যি অসম্ভব। তাই বুকে চেপে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করলাম।

'কাজটা তো বুঝলে ? আর এর গুরুত্বটাও নিশ্চয় অনুধাবন করতে পেরেছো। এর জন্যে তোমার যা দরকার তা হলো মনের জোর। তা তোমার আছে তো, পারভীন ?'

শরীরের সমস্ত ওজন পারভীন আমার ওপর ছেড়ে দিলো।

'উ···।'

'আমাদের বাঁচা, আমাদের ভবিষ্যত, সবই তোমার হাতে, পারভীন। তুমি নিশ্চয় কিছুতেই চাইবে না আমরা সব কিছু হারাই।'

ও আমাকে জোরে আঁকড়ে ধরলো। বুঝলাম, ও ভেতরে ভেতরে কাঁপছে।

'এখনও যথেষ্ট সময় আছে—ভেবে দেখো। আমরা ইচ্ছে করলে যা করতে চাইছি তা থেকে ফিরে আসতে পারি। তুমি যদি সাহস না পাও, তবে আমি তোমার ওপর জোর করবো না। সমূলে ডোবার কোন মানে হয় না।'

আমার বুকের ভেতর খুব নড়েচড়ে উঠলো পারভীন। বললো, 'না, এটা আমরা করবোই। এতটা এগিয়ে এসে

আমি পিছিয়ে যেতে রাজী নই। আমি—আমি ঠিক পারবো, দেখে নিও।'

'আমিও তা চাই।'

ওর মুখটা তুলে ভাল করে দেখলাম ওকে। তারপর চুমো খেলাম।

'চলো এবার ফেরা যাক।'

'আমি আগে যাই। তুমি পরে এসো। একা একা যাওয়াই ভালো হবে।'

'তুমি চিঠির কপিগুলো ঠিক মতো সাজিয়ে নিয়ে যাও। পড়ে আবার ঝালাই করে নিতে পারবে।'

'তাই দাও। রাতে আবার পড়বো।'

শুক্রবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর। পাঁচটা তখনো বাজেনি। অফিস থেকে সোজা বাড়ি ফিরে এলাম।

এঘর ওঘর খুঁজে দেখলাম শেলী নেই। মনে হলো বাইরে কোথাও গেছে। গ্যারেজে এসে ওর গাড়িটাও দেখলাম না। চারদিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে গ্যারেজ থেকে একজোড়া অ্যাপ্রন নিলাম। আমার ডেস্কে লুকিয়ে রাখলাম। এটা ভীষণ দরকারে লাগবে। তা নাহলে গায়ের জামা কাপড়ে দাগ লাগা এড়ানো যাবে না। চাকা বদলাতে হবে। রাতের আঁধারে। ধুলোবালি নিয়ে নোংরা কাজ। তাছাড়া ঘরে ফিরে যখন মুণীর সাথে দেখা করবো তখন পরনের কাপড়ে

কোনরকম দাগ থাকা কিছুতেই চলবে না। পোশাকের ধুপ-ধুরস্ত ভাব থাকতেই হবে।

ফোন করলাম পারভীনকে।

'কে?'

'রাসেল বলছি। শেলী কোথায়?'

'কে এক বান্ধবী এসেছিল। জোর করে ওকে সিনেমায় নিয়ে গেলো।'

'ওর ফিরতে কত দেরি হবে?'

'হুঁ টো।'

'আমি এখনই তোমার ঘরে আসছি।'

'না এলেই কি নয়?'

'আসতেই হবে।'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখে নিলাম কেউ আছে কিনা। কেউ নেই। দ্রুত পায়ে পারভীনের ঘরের দিকে চলে গেলাম।

চুপচাপ বিছানায় বসে ছিলো পারভীন। চোখ মুখ যেন বসে গেছে। ফ্যাকাশে। ভয় পেয়ে সব আত্মবিশ্বাস কি ও হারিয়ে বসলো? এখনই যদি এই অবস্থা, আসল সময়ে না জানি কি ঘটিয়ে বসে।

'তোমার এ কি অবস্থা? মনে হয় ভুত দেখে ভড়কে গেছো।'

'আমাকে নিয়ে ভেবো না। সময় এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ঠিক হয়ে যাবে মানে? ঠিক তোমাকে হতেই হবে। মনে কোন দ্বিধা থাকলে, এখনো সময় আছে, বলো। বাতিল করে দেবো। কোনরকম ঝুঁকি নিয়ে একাজে হাত দেয়া

নিতান্তই বোকামী। পারভীন, তুমি বুঝতে পারছো না, সমস্ত ব্যাপারটা একমাত্র তোমার মনের জোরের ওপরই নির্ভর করছে। আর সে-মনের জোরেরই যদি অভাব ঘটে তবে আমাদের পিছিয়ে যাওয়াই ভালো।'

'তুমি অযথা চিন্তা করছো, রাসেল। আমি জানি আমার মনের অবস্থা। কাজের সময় দেখবে আমি ঠিক চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। সব কিছু নির্ভুল ভাবে করে যাচ্ছি। সবদিক সামাল দিয়ে ঠিকই তখন আমার ভূমিকা আমি পালন করে যাবো।'

কিন্তু ওর কথায় আমি স্বস্তি পেলাম না। আমার মাঝে অস্থিরতা বেড়ে গেলো। সিগারেট ধরালাম। পায়চারি করলাম। তীরে পৌঁছার আগেই কি তরী ডুবেবে?

'গাড়ি কি করেছো?'

'লাঞ্চের পরেই ওখানে রেখে এসেছি, 'আস্তে চালাও' বোর্ডটার উল্টো দিকে, একটা ঝোপের পেছনে। কিন্তু...'

'বলো।'

'এতক্ষণ গাড়ি ওখানে থাকতে দেখে কেউ আবার সন্দেহ করতে না শুরু করে।'

'তেমন সম্ভাবনা খুব কম। কারণ পায়ে হেঁটে লোকজনের যাতায়াত ওখান দিয়ে নেই বললেই চলে। যদি কেউ এসেও যায়, যেখানে রেখেছো, নজরে পড়বে বলে মনে হয় না। পড়লে ও ভাববে, কেউ হয়তো আশপাশেই আছে, বেড়াতে এসেছে।'

'তাই যেন হয়। গাড়িটা রেখে আসা অবধি আমি শুধুই ভাবছি, ওটার জন্যে না শেষ পর্যন্ত ফেঁসে যাই।'

পায়চারি করতে করতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আকাশ গুমোট। হালকা কালো মেঘ খুব দ্রুত ছুটে যাচ্ছে।

'বৃষ্টি হতে পারে পারভীন।'

'হতে পারে হয়তো।'

'হোক, বৃষ্টি হলে ভালোই হয়।'

'কিন্তু—'পারভীন যেন কেঁপে উঠলো, 'তুমি তাহলে কাজ করবে কিভাবে?'

'তা অবশ্য ঠিক। বৃষ্টির মাঝে চাকা বদল—এক জঘন্য ব্যাপার হবে।'

'বৃষ্টি হলে কি তবে কাজে হাত দেবে?'

'নিশ্চয়ই, পৃথিবী উল্টে গেলেও।'

'ভেজা মাটিতে পায়ের দাগ বসে যাবার কথা চিন্তা করেছো?'

'এ নিয়ে তুমি চিন্তা করে আসল কাজ ভুলো না। রাস্তাটা ওখানে বেশ শক্তই আছে।'

আর কি বাকী রইলো তাই ভাবছি। সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। তাই সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটাকে একবার চোখের সামনে মেলে ধরলাম। দু'জনে মিলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবার সবটা সাজালাম।

'এই যা, গোমেজের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম। তার ব্যাপারে ব্যবস্থা ঠিকমতো নিয়েছ কি?'

'ওটা আমার দায়িত্ব, আমি ঠিকই পালন করেছি।' পারভীন বিছানা থেকে নেমে কাপড় ঠিক করতে করতে বললো, 'ওষুধ ওর চায়ে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।'

'চমৎকার। আর আমি কি না ভাবছি তুমি ক্রমশঃ মনের জোর হারিয়ে ফেলছো। দুর্বলতা তোমাকে গ্রাস করছে।'

সামনে দাঁড়িয়ে ভালো করে আবার দেখলাম ওকে। ও মুখ তুলতেই হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইলাম। কিন্তু ও ধরতে দিলো না। আমার হাত ঠেলে সরিয়ে দিলো।

'এখন নয়, রাসেল। আমাকে ধরো না। আমার মন এখন শুধু ওই কাজটার জন্যেই প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

'ঠিক আছে, আমি তোমার প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না।'

ঘড়ি দেখলাম। ছটা বাজে বাজে।

'আমি তা হলে যাই। টেপ রেকর্ডারটা পড়ার ঘরে এক ফাঁকে রেখে এসো। আমি চেয়ার টেবিল ঠিকমতো সাজিয়ে এসেছি। তবু তুমি ঘরের সবকিছু এক নজর দেখে নিও।'

'তুমি এখন কি করবে?'

'সোজা বাগানে চলে যাবো। ওখানে বসে শেলীর জন্যে অপেক্ষা করবো। ফিরে এলেই সঙ্গ দেবো ওকে। যেন কিছুই টের না পেতে পারে।'

'ঠিক বলেছ। ষড়যন্ত্রের গন্ধ টের পেতে ওর কিন্তু দেরি হয় না।'

'কিন্তু আমার আদর ওকে সবকিছু থেকেই ভুলিয়ে রাখতে পারবে।'

'হায়রে আদর ··· !' মুচকী হাসলো পারভীন।

'পারভীন, আর মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা। তারপর ··· তারপর তুমি আর আমি, মুক্ত বিহঙ্গ।'

'ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে।'

'আমার কোন সংশয় নেই। সৌভাগ্য আমাদের দ্বার প্রান্তে।'

'তাই হোক।'

'আমি এখনই নিচে চলে যাচ্ছি।'

ঘর থেকে বের হবার আগে ওকে জড়িয়ে ধরে একটু চুমো খেতে খুব ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু ওর চেহারার কঠিন রূপ দেখে ইচ্ছেটাকে দমন করে নিলাম।

দরজা খোলার জন্যে হাতলের দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, 'তাহলে কাজটা তুমি করছো, পারভীন?'

'এখনও কি তোমার মনে বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'হচ্ছে। তবে বলছিলাম যে, পিছিয়ে যাবার সময় এখনও আছে। আর কিছুক্ষণ পর তা আর থাকবে না।'

'তুমি কি পিছিয়ে যাবার কথা ভাবছো?'

আমি তখন ভাবছি, কল্পনায় দেখছি, সব—সব টাকা আমার হাতে, আমি দ্বিধাহীন চিত্তে ওগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছি।

পারভীনের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে, ওকে পাওয়ার আনন্দে আমি আত্মহারা।

'মোটেও না।' গলার দৃঢ়তার সাথে সাথে মনটাকেও শক্ত করলাম।

আমারও ঐ একই কথা।'

'আমি চললাম।'

এদিক ওদিক একবার দেখে নিয়ে বারান্দা ধরে সোজা নিচে চলে এলাম।

বাগানে তখন মেঘলা বিকেলের আলো। নানা ধরনের ফুলের বাগানটা সত্যি মনোরম। হৃদয় ভরে যায়। এ ফুলের কাছ থেকে সে ফুলের কাছে হেঁটে বেড়ালাম। মনের অস্থিরতা দূর করে চোখে-মুখে প্রসন্নতা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলাম। ফুল,—ফুল আমিও ভালবাসি। বিশেষ করে ঐ রজনীগন্ধা। হাত বাড়িয়ে থোকায় থোকায় ফুটে থাকা রজনীগন্ধা ফুলে হাত বুলালাম। কত সুন্দর—ফুলগুলো মনের সুখে পাপড়ি খুলে প্রিয়াকে আহ্বান জানাবার অপেক্ষায় আছে।

গাড়িটা নিয়ে সরাসরি গ্যারেজে চলে গেল শেলী। তখন ছয়টা বেজে কয়েক মিনিট। গ্যারেজের দিকে কিছুটা এগিয়ে দাঁড়ালাম শেলীর আসার অপেক্ষায়।

শেলী সামনে এসে বললো, 'তুমি কখন এলে, রাসেল?'

'বেশ অনেকক্ষণ আগে। এসে দেখি তুমি নেই।'

'তোমাকে একা একা সময় কাটাতে হলো বলে আমি সত্যি দুঃখিত, রাসেল। কি করবো বলো, লায়লা কিছুতেই

ছাড়লো-না।'

'না, না, তাতে কি হয়েছে। ভালোই করেছ। সিনেমা-টিনেমায় আমি বলতে গেলে তো তোমাকে সঙ্গই দিতে পারি না। তা গোমেজকে নিয়ে যাওনি কেন?'

'তুমি তো জানই, মার্সিডিজটা আমি নিজে চালাতে খুব পছন্দ করি। আর ড্রাইভিং এর ব্যাপারে তুমি আমার ওপর কনফিডেন্স রাখতে পারো। চলো ঘরে যাই, আকাশ দেখছি মেঘে মেঘে ছেয়ে গেলো। বৃষ্টি আসতে পারে।'

'তার আগে চলো, বাগানে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়াই।'

'চলো।'

আমরা দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে বেড়ালাম। শেলী উচ্ছ্বসিত হয়ে অনবরত বকবক করলো। সিনেমার কথা, লায়লা নামের বান্ধবীটির কথা, আগে যে মালীটা ছিলো সে আরও সুন্দর বাগান করতো—আরও কত কি। কথা বলছে, আর আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। ওর কুৎসিত মুখটাতে উজ্জ্বল হাসি লেগেই আছে। হৃদয়ের সব আনন্দ যেন তার উপচে পড়ছে।

হঠাৎ হাতটা ধরে ও আমাকে থামিয়ে দিলো। আমার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে বললো, 'আমার কিন্তু খুব ভালো লাগছে, রাসেল। ···তোমার?'

ওর দিকে তাকালাম। ওর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে আমি বেশ বিব্রত বোধ করলাম। ওর চোখে সেই ভাল-বাসার দৃষ্টি। শাশ্বত এ ভালবাসা অপার। অমলিন।

'তুমি পাশে আছো বলে আমারও খুব ভালো লাগছে।'

'তুমি রোজ তাড়াতাড়ি এসে যেও। আমরা বাগানে এমনি হেঁটে বেড়াবো। সত্যি রাসেল, তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না—মনে হয়, তুমি আমার পাশে থাকলে আমি যেন জীবনের অর্থ খুঁজে পাই।'

আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না,—আর মাত্র তিন ঘন্টা বাকী আছে। আমি ওকে এ পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেবো। ফুরিয়ে যাবে ওর সব উচ্ছ্বাস, ভালবাসা। তার জীবনে আদৌ আর ফিরে আসবে না আগামী দিনের আলো। পূরণ হবে না তার কল্পিত স্বাদ আহ্লাদ।

'চলো ঘরে যাই, বৃষ্টি বোধ হয় এখনই এসে পড়বে।'

ওর ঘর পর্যন্ত এসে আমি দরজায় দাঁড়ালাম।

'কি হলো? ঘরে এসো, রাসেল।'

'তোমাকে কিন্তু খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তুমি বরং একটু বিশ্রাম নাও, আমি এখন যাই।'

'আমি ঠিকই আছি। আমার জন্যে কোন চিন্তা করো না।' আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। 'তোমাকে কিন্তু আমার ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।'

'উঁহু, আমার কাজ আছে। মুন্সী আসবে। কাগজ পত্র ঠিক করতে হবে।'

'এত পরিশ্রম না করলে কি তোমার হয় না?' ওর গলায় এবার অভিমান।

'নতুন কিছু করতে গেলে পরিশ্রম করতে হবে বৈকি।'

'এতকিছুর আর কি দরকার? খামোকা তোমার শরীরটা

খারাপ করছো।'

ওর লিকলিকে হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো—ঘটা করে আমাকে চুমো খেলো।

আর আমার মনে হলো, ভেতর থেকে বুঝি নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে আসবে। অনেক কষ্ট করে মনের ভাবটা সামাল দিয়ে একগাল হেসে ওর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

এতক্ষণের অবস্থাটা ভাবতে গিয়ে মনে হলো, আমি কি আদৌ ওকে খুন করতে পারবো?

নিজের মনকে নিজেই শাসন করলাম। আর দেরি না করে পড়ার ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

টেপ রেকর্ডারটা রেখে গেছে পারভীন। এবং ঠিক জায়গা মতই ওটা রেখেছে সে। চেয়ারটাও ঠিক জায়গা মতোই আছে—দরজার দিকে পেছন ফেরানো। ডেস্কের ওপর টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। অল্প আলোই ভালো। একটু আলো ছায়া, একটু লুকোচুরি ভাব।

জানালার পর্দাটা একপাশে ঠেলে দিলাম। এ জানালা দিয়েই আমি বাইরে যাবো, আসবো। জানালার অবস্থান এত সুন্দর জায়গায় যে, বাড়ির অন্য কোন অংশ থেকেই এর ওপর নজর পড়ার সম্ভাবনা নাই। জানালার নিচেই বেশ উঁচু একটা চৌবাচ্চা। বাগানের জন্যে পানি জমিয়ে রাখা হয় ওতে। নেমে যাওয়া বা উঠে আসার সুন্দর ব্যবস্থা। বৃষ্টি হলেও কোন চিন্তা নেই। কাদাতে পায়ের কোন ছাপ পড়বে না ওখানটায়।

ডেস্কের নিচের ড্রয়ার খুলে অ্যাপ্রন আর দস্তানা দুটো ভালো করে দেখে নিলাম। দেখে নিলাম বালি ভর্তি চটের থলিটাও। হাতে নিয়ে ওজনটাও বুঝে নিলাম। ডেস্কের ওপর ফাইল, চিঠি পত্র সবই ঠিক আছে। দরজার কাছে ছোট টেবিলটাও রাখা আছে। ঘরের চারদিকে চেয়ে নিয়ে বেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

পরিকল্পনা মতো সবই প্রস্তুত।

এখন বাকী শুধু সময়ের। কাজ শুরুর অপেক্ষা কেবল—রাত ন'টা পর্যন্ত।

ধীরে ধীরে আমাকে যেন এক শূন্যতা গ্রাস করে ফেললো। সে-শূন্যতার অতলে আমি তলিয়ে যাচ্ছি। লোপ পাচ্ছে আমার সমস্ত চেতনা। উপলব্ধি। হায়, এমন কেন হচ্ছে?

হঠাৎ তখনই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামলো। খোলা জানালার পথে উড়ে এলো বৃষ্টির কণা। সম্বিত ফিরে পেলাম।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকালাম।

ঠিক সে-সময়ই দরজায় টক্ টক্ শব্দ হলো।

ভীষণ চমকে উঠে দরজার দিকে ফিরলাম। তারা মিয়া ঘরে ঢুকলো।

'বিরক্ত করার জন্যে মাপ করবেন, স্যার। গোমেজ হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

'তার আবার কি হলো?'

'খুব মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। এখন যন্ত্রণায় শুধু কাতরাচ্ছে। একটু আগে বমিও করলো। কিন্তু এদিকে যে ওনার বাইরে

যাওয়ার কথা। ঠিক এসময়ে তাঁকে একথা বলা—'

'ঠিক আছে, শেলী নিচে আসবে এখনই। আমিই বলে দেবো।'

'সেই ভালো, স্যার।'

তারা মিয়া যেমন ঝড়ের গতিতে এসেছিল, তেমনি গতিতে আবার চলে গেলো। যাওয়ার সময় দরজাটা আগের মতোই বন্ধ করে গেলো। বড় লোকের বাড়ির চাকর—আদব-কায়দায় একদম কেতাদুরস্ত।

আর আমি,—আমার কথা ভাবতে পারেন? নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম। সমস্ত শরীর কাঁপছে—চমকে ওঠার কাঁপুনি। সেই সাথে ঘামছে কপাল। হৃৎস্পন্দন থেমে যায়নি। বুঝতে পারলাম, বুকের মাঝে প্রবল শব্দ শুনে। দুর্দম সে-শব্দ, শুনছি আর শুনছি।

দুই

শেলী নিচে নামার আগেই আমি কয়েক পেগ্ হুইস্কি গলায় ঢেলে নিলাম। শরীরের পেশীগুলোকে সতেজ করার জন্যে এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। আমার মাঝে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে তা আমি কিছুতেই শেলীকে বুঝতে দিতে চাই না।

ডিনার খেতে বসেও তেমন কিছুই মুখে দিতে পারলাম না। কিছু না খেলেই নয়, তাই একরকম জোর করেই সামান্য খেলাম।

বসার ঘরে শেলী তখন বার বার পর্দা সরিয়ে বৃষ্টি ভেজা রাত্রির অন্ধকার দেখছে। এক সঙ্গে কফি খাবো বলে আমিও সে-ঘরে ঢুকলাম।

'রাসেল, আর যাই বলো, এমন ধারায় বৃষ্টি খুবই বিরক্তিকর।' কথাটা এমন ভাবে বললো যেন বৃষ্টি হওয়ার জন্যে আমিই দায়ী। 'গত সপ্তাহ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে না, অথচ

দেখো দেখি, আমি যখনই একটু বাইরে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছি, আর তক্ষুণি বৃষ্টিটা এলো।'

'এটা সত্যি বিশ্রী-ব্যাপার। তাছাড়া ঘরের মধ্যে থাকলে ঐ বৃষ্টি আরও বেশি বিশ্রী মনে হয়। তবে আমার মনে হয়, বৃষ্টি এখনই থেমে যাবে।'

'আমি তেমন কোন লক্ষণ দেখছি না। এভাবে যদি বৃষ্টি হতেই থাকে, তাহলে আর আমি যাবো কি করে বলো? মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত আমার যাওয়াই হবে না।'

শেলী এ কথা বলবে জানি, কিন্তু তা শুনে আমার বুকটা ধড়ফড় করতে শুরু করলো।

তারা মিয়া আপন মনে কফি ঢালছে। আমি কথা বলতে খুব হিসেবি হলাম। সাক্ষী হিসেবে সে এসব কথারই বিবরণ দেবে সন্দেহ নাই। সুতরাং শেলীকে যাবার জন্যে আমি খুব পীড়াপীড়ি করেছি এমনটা তার মনে যেন কিছুতেই না জাগে। বরং এখন এর উল্টোটাই খুব প্রয়োজন।

'আমি বলি কি শোন, আজ রাতে টেলিভিশনে ভালো অনুষ্ঠান আছে। কি দরকার এই বৃষ্টির মধ্যে বের হওয়ার? তুমি বরং মিসেস জোয়ারদারকে টেলিফোন করে বলে দাও, তুমি যাচ্ছো না।'

'কিন্তু ওস্তাদ মতিলালকে কাছে থেকে দেখার যে খুব ইচ্ছে ছিলো। সামনা-সামনি বসে বাজনা শোনা—নাহ্, বৃষ্টিটা সব নষ্ট করে দিলো। বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাতে আমার একদম ভালো লাগে না।'

'তাছাড়া রাতে তোমার একা বের না হওয়াই ভালো।'

'একা আমি ভয় করি না, শুধু ঐ বৃষ্টিটাই,...' তারা মিয়ার দিকে তাকিয়ে আবার বললো, 'তুমি একটু দেখো তো, গোমেজের অবস্থা এখন কেমন। একটু সুস্থ হলে ওকে তৈরি হতে বলো।'

তারা মিয়া চলে গেলো।

'আমার যখন দরকার, তখন যদি সে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে, তবে সে ড্রাইভার দিয়ে আমার কি হবে?'

'নিশ্চয়ই রোজ এমন হয় না।' আমি হাসলাম। 'মানুষ মাত্রেই যে কোন সময় অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।'

একটু থেমে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

'আমি জানি, এরপর তুমি আমাকে কি বলবে।' বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো শেলী। 'বলবে, বৃষ্টির মধ্যে তো তুমি ভালো গাড়ি চালাতে পারো না। সুতরাং ওখানে যাবার ভাবনা ছেড়ে দাও।'

ঝট করে বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ ভাবে শেলী আমাকে দেখলো।

'কি ব্যাপার রাসেল, সন্ধ্যে থেকেই তুমি কেমন করে যেন তাকাচ্ছো আমার দিকে? কেন? কি ভাবছো বলো দেখি। তোমার চোখ দু'টো যেন...অস্থির...'

এইরে, এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম। স্নায়ুগুলিকে সতেজ করতে গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসলাম।

আমার চোখ মানে, আমি অস্থির হতে যাবো কেন? দুর! দুর! কি যে বলো তুমি?'

'রাসেল, আমার কাছে লুকাতে চেয়ো না। আমি খুব সহজেই অনুমান করতে পারি। সত্যি বলো, রাসেল, কেন এমন করছ?'

এধাক্কা কি বলে সামাল দেবো ভাবছি—তারা মিয়া ঘরে ঢুকলো।

'ম্যাডাম, এখনো সে অসুস্থ। বিছানায় শুয়ে ছট্ফট করছে।'

কফির কাপগুলো নিয়ে তারা মিয়া চলে গেল।

'এ অবস্থায় তুমি বরং যেও না, শেলী।' ওর অধৈর্য ভাবটা উসকিয়ে দিতে আবার বললাম, 'তোমার ঐ বেহালা বাদক ওস্তাদ লোকটির ভক্তের নিশ্চয় অভাব নেই। তারা সবাই নিশ্চয়ই ওস্তাদকে ঝেঁকে বসে আছে। ঐ সব ভক্তদের মাঝে তোমার অভাব তিনি টেরই পাবেন না।'

কথাটায় কাজ হলো। রেগে উঠলো শেলী।

'তুমি জানো না বলে একথা বলছো।'

'তোমার মতো ভক্ত না গেলে তার কি আসে যায়?'

'তা কিছু আসে যায় না সত্যি, কিন্তু আমি জানি, আমি না যাওয়া পর্যন্ত সে ছড় হাতে তুলবে না। আমাকে যেতেই হবে।'

'সে তোমার মর্জি, যা ভালো বোঝ করো। যদি যেতেই হয়, আর দেরি করো না, ন'টা প্রায় বাজে।'

'রাসেল, তুমি তো ভাল আছো। তুমি কি আমার সঙ্গে এখন যেতে পারো না?'

'আমি সত্যি দুঃখিত, শেলী। আর মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে মুন্সী ফজলুর রহমান এসে পড়বে।'

'বেশ, তাহলে আমাকে একাই যেতে হচ্ছে।' কাছে এসে বুকের ওপর জামার ভাঁজে হাত বুলাতে বুলাতে বললো, 'তুমি সত্যি বলছো তো, রাসেল, কোন,—কোন ব্যাপারেই তুমি চিন্তিত নও?'

'সব কিছুতেই তুমি বেশি রকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে যাও।' জড়িয়ে ধরলাম ওকে। আমার মুখটা ওর ঠোঁটে চেপে ধরলাম।

নরম ভিজে ঠোঁট দুটোর ওপর থেকে আমার মুখটা তুলে আনতেই শেলী দু'হাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো। শরীরটা একটু বাঁকিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'থাকগে, আজ আর গিয়ে কাজ নেই।'

ওর চোখে কামনার সেই নগ্ন দৃষ্টি।

'এমন রাতে আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি।'

'একসঙ্গে থাকার রাত তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না?' কথাটা বলা মাত্রই আমার মাঝে যেন কি একটা ঘটে গেল। মনে হলো আমি যেন আর আমাতে নেই। আমার চেহারা যেন পাল্টে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

'তুমি এখন যাও, লক্ষীটি। আমার মাথায় এখন রাত এগারোটা পর্যন্ত শুধু মুন্সীই চেপে বসে থাকবে।'

ও চুপ করে রইলো। আমিও। বিশ্রী এক নীরবতা দুজনকেই আচ্ছন্ন করে রাখলো।

দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে শেলী বললো, 'তাহলে কথা রইল …আজ রাতে রাসেল…এমন বাদল রাতে…'আশ্চর্য এক মাদকতা যেন ওর গলা থেকে ঝরে পড়তে লাগলো। ওর বুভুক্ষু মনে এত আকুলতা…

আমাকে ছেড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো। আর আমি,—আমি তখন আবার কাঁপছি। আমার কপাল আর হাতের তালু ঘেমে উঠলো।

ন'টা বাজতে এক মিনিট বাকী। আবার ফিরে এলো শেলী। গায়ে সাদা রেইনকোট। মাথায় ছোট কালো টুপি। হাতে চামড়ার দস্তানা।

'তুমি কি আমাকে গ্যারেজ পর্যন্ত এগিয়ে দেবে না, রাসেল?'

'তুমি যাও, লক্ষ্মীটি। মুন্সী আসার আগে আমার কয়েকটা চিঠি ডিক্‌টেট করে রাখতেই হবে।'

'তুমি লুকালে কি হবে, রাসেল, আমি নিজেই বুঝতে পারি, মাঝে মাঝে আমি তোমার কাছে খুবই বিরক্তিকর হয়ে উঠি।'

আমার দিকে তাকালো। ঠিক এ সময়ে ওর চোখ দুটো সত্যি খুব পীড়াদায়ক ছিলো।

'বাজে কথা বাদ দাও তো। এসো তাহলে।'

'সময়টা তোমার আনন্দে কাটুক।'

কথাটা বলা মাত্রই শব্দগুলো আবার আমার মাঝে আতঙ্কের সৃষ্টি করলো। আমাকে যেন একটা অদৃশ্য চেতনা গ্রাস করে ফেললো।

মুখটা আবার দ্রুত ঘুরিয়ে নিলাম। আমার চেহারার হঠাৎ পরিবর্তন ওকে দেখাতে চাই না। এমনিতেই যাও-য়ার ব্যাপারে ওর দোটানা ভাব, তার ওপর আমার এ চেহারা দেখলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

ও বাইরে নামার সাথে সাথে দরজাটা বন্ধ করে সোজা চলে এলাম পড়ার ঘরে। পেছন পেছন পারভীনও এসে ঢুকল।

দু'জনে দু'জনের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলাম।

ওকে বিবর্ণ দেখালেও চোখের দৃষ্টিতে রয়েছে প্রখরতা। এমনটা ওর মাঝে এর আগে কখনো দেখিনি।

'এই নাও, তোমার জন্যে একটা টুপি এনেছি। তোমার চুল ভেজানো চলবে না।'

ওর গলার স্বরে কিন্তু ওকে ভীত মনে হলো না।

'তুমি সত্যিই বুদ্ধিমতী মেয়ে।'

এক মুহূর্ত আর দেরি না করে জামাটা খুলে চেয়ারে ছুঁড়ে দিলাম।

'জামাটা রইলো। ঠিকমতো হাতলে বসিয়ে দিও।'

'আচ্ছা।'

ডেস্কের ড্রয়ার থেকে অ্যাপ্রনটা বের করে গায়ে চড়িয়ে নিলাম। হাতে দস্তানা পরলাম। টুপিটা এগিয়ে দিলো পারভীন।

'একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

'এ দিকটা নিয়ে কিন্তু আর আমি ভাববো না।'

'তোমার ভাবতে হবে না। সব ঠিক থাকবে।'

তাকালাম ওর দিকে। বুঝলাম ঠিকই থাকবে। ওর স্নায়ু আমার চেয়ে অনেক শক্ত মনে হলো।

হাত বাড়িয়ে ড্রয়ার থেকে বালির ব্যাগটা টেনে আনলাম। একটু পিছিয়ে গেলো পারভীন। বালির ব্যাগটা বাম বগলে লুকিয়ে নিলাম।

'দেরি করে ফেলছো, রাসেল।' ওর গলা কাঁপলো একটু। মনে হচ্ছে, বালির ব্যাগটা সমস্ত ব্যাপারটাকে হঠাৎ জীবন্ত করে তুললো।

'আমার ফিরতে আধ ঘন্টার বেশি লাগবে না, পারভীন। সে-সময়টা তুমি শুধু নিজেকে শক্ত রেখো। আমার জন্য ভেবো না। কাজ সমাধা করে ঠিক ফিরে আসবো।'

পারভীন এগিয়ে এসে জানালার কপাট খুলে দিলো। আমি জানালা দিয়ে শরীরটা বের করে পা দুটো নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে পেছন ফিরে তাকালাম।

জানালার একটু দূরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে পারভীন। একমনে আমাকে দেখছে।

পারভীনের ঠোঁট দুটো নড়লো, কিন্তু কোন শব্দ বের হলো না।

আমি আমার শরীরটা নিচের দিকে ছেড়ে দিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চৌবাচ্চার দেয়ালটায় পা ঠেকলো।

ওদিকে আমার মাথার ওপর জানালাটা বন্ধ হয়ে গেলো।

বৃষ্টির আর তেমন জোর নেই। অল্প ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। অবশ্য বাতাসের ঝাপটা তখনো আছে। তাড়াতাড়ি গ্যারেজের দিকে পা বাড়ালাম।

শেলী যে পথে গ্যারেজে আসবে, সেটা ঘুর পথ। একটু বেশিই হাঁটতে হবে। আমি শুধু লনটা পার হবো।

মেঘলা অন্ধকার রাত। আমি যেদিকটা দিয়ে এসেছি সেদিকে কোন আলো নেই। সুতরাং আমাকে কেউ দেখে ফেলার ভয় নেই।

একটু সামনের দিকে ঝুঁকে দৌড়ে লনটা পার হয়ে গেলাম। চোখে মুখে বৃষ্টির ঝাপটা লাগলো।

শেলী বাইরে বের হবে বলেই গ্যারেজে তালা লাগানো হয়নি। গ্যারেজের সামনের আলোটা এখানকার কিছুটা অন্ধকার দূর করেছে। আমি দেখে শুনে একটু আবছা অন্ধকার জায়গায় গিয়ে লুকালাম।

পরক্ষণেই শেলীকে নজরে পড়লো। আর দেখা মাত্রই আমার বুকে যেন হাতুড়ী দিয়ে কেউ ঘা মারতে শুরু করলো। পাঁজরগুলো যেন ভেঙে যাবে। মুহূর্তে গলা শুকিয়ে গেল। হাঁটু দুটো যেন শক্তিহীন হয়ে পড়ছে—শরীরের ভার রাখতে যেন অক্ষম। বালির ব্যাগটা শক্ত করে ধরলাম।

শেলী খুব তাড়াতাড়িই এগিয়ে আসছে। আসছে, হ্যাঁ, আমার প্রায় সামনে এসে গেছে। গুনগুন করে গান গাইছে। মনে হচ্ছে, ভেতরে ভেতরে সে ভয় পাচ্ছে। ভয় কাটাতেই

গুনগুন করছে। ডাইনে বাঁয়ে সে তাকালো না। আমার সামনে দিয়ে চলে গেলো।

ও গাড়ির কাছে পৌঁছতেই আমি প্রায় দম বন্ধ করে এগিয়ে গেলাম। পায়ে ক্রেপ সোলের জুতো। মেঝেতে কোন শব্দ হলো না।

শেলী মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে গাড়ির দরজার হাতলে হাত রাখলো। আমি তখন ঠিক ওর পেছনে।

ওর সহজাত প্রবৃত্তিই ওকে হয়তো সাবধান করে দিলো। হঠাৎ গুনগুনানি বন্ধ হয়ে গেলো। ঝট করে ফিরলো আমার দিকে। চিনতে পারলো? বালির ব্যাগটা ঘোরাতে ঘোরাতেই নজরে পড়লো, ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে মেয়েটা, চিৎকার দেবার শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই। রক্তশূন্য হয়ে গেছে রুগ্ন মুখ। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার হাতের বালির ব্যাগটা প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়লো ওর মাথায়। ভেলভেটের টুপিটা আঘাত থেকে ওর মাথাকে একটুও রক্ষা করতে পারলো না। আঘাতের সাথে সাথেই হাতটা গাড়ির হাতল থেকে ছিটকে ছুটে গেল। সমস্ত শরীরটা মুচড়ে শেলী পড়ে যেতে থাকলো। বালির ব্যাগটা মাথার ওপর তুলে সমস্ত শক্তি দিয়ে আবার প্রচণ্ড আঘাত করলাম ওর মাথায়।

একটা ঝাঁকুনি দিয়েই ঢলে পড়লো ওর শরীরটা। তাড়াতাড়ি বালির ব্যাগটা রেখে দিয়ে ওকে ধরে ফেললাম।

একটা পুতুলের মতো তখন ও আমার হাতের মধ্যে। গায়ের সঙ্গে চেপে ধরে গাড়ির দরজা খুললাম। পাঁজাকোলা

করে সামনের সীটে রাখলাম ওকে। তারপর ঠেলে দরজার সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দিলাম।

বালির ব্যাগটা এক ঝটকায় তুলে গাড়ির স্টিয়ারিং এর নিচে রাখলাম। সাথে সাথে মনে পড়লো গাড়ির চাবী তো আমার কাছে নেই।

সমস্ত শরীরে একটা প্রচণ্ড কাঁপুনি খেলে গেল। ঘেমে উঠলাম।

চাবীটা কি তবে ওর ব্যাগের মধ্যে? কিন্তু ব্যাগটা খুঁজে পেলাম না। চিন্তা করতে চেষ্টা করলাম, ও বের হবার সময় ওর হাতে কোন ব্যাগ ছিল কিনা। এমন আতঙ্কের মধ্যে কিছুই মনে করতে পারলাম না।

সময় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নামলাম। গ্যারেজের মেঝে ভাল করে দেখলাম। শেষ পর্যন্ত গাড়ির নিচ থেকে ব্যাগটা উদ্ধার করলাম। ব্যাগ নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। তারপর ব্যাগের ভেতরের আবর্জনার মাঝ থেকে গাড়ির চাবিটা বের করলাম।

ইঞ্জিন চালু করে ওর দিকে একবার তাকালাম।

গাড়ির দরজায় ঠেস দিয়ে কাত হয়ে আছে শেলীর অচেতন দেহটা। মাথাটা স্বস্থানে থাকতে পারছে না বলেই হয়তো ঝুলে পড়তে চাইছে। চোখ দুটো বোঁজা। ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। মাথার কালো টুপির ভেতর থেকে একটা সরু রক্তের রেখা কপাল বেয়ে নিচের দিকে নেমে এসেছে।

আস্তে আস্তে গাড়িটা চৌধুরী ভবন থেকে বের করে শেষে

গতি বাড়িয়ে দিলাম। নিচের রাস্তায় এসে বুঝতে পারলাম বৃষ্টি আর বাতাসের জোর অনেক বেশি।. প্রচণ্ড দাপটে বৃষ্টির ঝাপটা এসে গাড়ির কাঁচের ওপর আছড়ে পড়ছে।

এ অবস্থায় সামনের দিকে কিছু দেখা বেশ কষ্টকর। উইণ্ড-স্ক্রীন ওয়াইপারটা চালু করে দিলাম।

রাস্তার প্রথম বাঁকটার কাছে এসেই আলো নিভিয়ে দিয়ে গাড়ি থামালাম। ঠিক তখুনি দেখলাম, প্রায় মাইল খানেক দূরে একটা গাড়ির আলো এগিয়ে আসছে।

মুন্সী ফজলুর রহমান আসছে।

শেলীকে টেনে আমার কোলের ওপর আনলাম। সোজা করে বসিয়ে হাত দুটোকে স্টিয়ারিং হুইলের ওপর বিছিয়ে দিলাম। মাথাটা পেছন দিকে হেলে পড়লো। পিঠটা আমার শরীরের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখলাম। আমি যতটা সম্ভব নিচের দিকে সীটের সাথে প্রায় লেপ্টে রইলাম। গিয়ার দিয়ে এক্সি-লারেটরে পা রেখে চাপ দিলাম। গাড়িটা হেলেদুলে চলতে শুরু করলো। বাঁক ঘোরার সময় সামনের তীব্র আলো দুটো জ্বেলে দিলাম।

খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে আসছিল মুন্সী ফজলুর রহমান। আমিও গাড়ির গতি বাড়ালাম। শেলীর দেহটাকে ঐ অবস্থায় রেখে গাড়ি চালানো বেশ কষ্টকর।

আমাকে এখন ডান দিকে ঘুরতে হবে।

মুন্সী নিশ্চয়ই আমার গাড়ির আলো দেখতে পেয়েছে। কারণ সে তার গাড়ির আলো ডিপ করেছে।

নিয়ম মতো আমার গাড়ির হেডলাইট ডিপ করার জন্যে যেই সামনে হাত বাড়িয়েছি, তখনই নড়তে শুরু করলো শেলী।

আমি এমনভাবে চমকে উঠলাম যে আর একটু হলেই গাড়িটা রাস্তা থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে যেতো।

গোঙানীর মতো দীর্ঘশ্বাস ফেললো শেলী। ভয়ে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো। এমন ভয় আমি জীবনে কোন দিন পাইনি।

এদিকে গাড়ির চাকাগুলো রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে চলছে। অসমতল বলে ভীষণ ভাবে লাফাচ্ছে চাকাগুলো।

সামনেই দেখলাম সাদা রঙের বেড়া। ঐ বেড়াটা যে-কোন গাড়িকে প্রায় ন'শ ফুট নিচের খাদে পতন থেকে রক্ষার জন্যে। পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে আনতে আমার গাড়িটা বেড়ার একদম কাছে এসে গেলা।

গাড়িটাকে ঠিকমতো রাস্তায় উঠিয়ে শেলীর ঘাড়টা ধরে জোরে গাড়ির ড্যাশবোর্ডের ওপর ঠুকে দিলাম। কিন্তু স্টিয়ারিং হুইলে ওর বুকটা আটকে গেল। আঘাতটা তেমন জুতসই হলো না।

আবার দিলাম। জোর আঘাতে এবার সে জ্ঞান হারালো আবার।

মুন্সীর গাড়িটা আমাদের পাস করে যাবার সময় শেলীকে অনেক কষ্টে সোজা করে বসিয়ে রাখলাম।

ওদিকে মুন্সী গাড়ির স্পীড কমিয়ে দিয়েছে। আমি কিন্তু তখন বাড়িয়ে দিয়েছি স্পীড প্রায় চল্লিশে। আমার গাড়িটা

সাঁ করে ঝড়ের বেগে মুন্সীকে পার হয়ে এগিয়ে গেল।

হর্ন বাজালো মুন্সী। শেলীর গাড়ি চিনতে পেরেছে বলেই সে হর্ন বাজালো। আমি প্রতি উত্তরে বাজাতে পারলাম না। হাত দুটো ভীষণ ব্যস্ত ছিলো। এসব পাহাড়ী বাঁকে এমন প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চালানো বিপজ্জনক। সামান্যতেই ভুল হয়ে যেতে পারে। সামনেই বাঁকটা দেখে জোরে ব্রেক কষলাম। গাড়িটা স্লো করে একটু আড়ালে নিয়ে থামালাম। এই ঝড় বাদলের রাতে যদিও এ পথে কারো আসার সম্ভাবনা নেই, তবু তো সাবধানের মার নেই। চাকাটা বদলাতে আমার তো বেশ কিছুটা সময় লাগবে। শেলীকে কোল থেকে সীটের ওপর নামিয়ে দরজার সঙ্গে ঠেস দিয়ে রেখে গাড়ির বাইরে নামলাম।

বৃষ্টি আর দমকা হাওয়ার ঝাপটা এসে আছড়ে পড়লো গায়। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মুন্সীর গাড়ির পেছনের লাল আলোটা পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে পৌঁছে যাবে চৌধুরী ভবনে। তারা মিয়া ওকে নিয়ে গিয়ে লাউঞ্জে বসাবে। পারভীন এসে ওকে বসতে বলবে। আমিও ভেতর থেকে বলবো একটু বসতে। কিন্তু কুড়ি মিনিটের বেশি ওকে বসিয়ে রাখা যাবে না। তাহলে আমার হাতে আছে মাত্র পঁচিশ মিনিট। যে কাজগুলো আমার করার এখনো বাকী তা কি এই সময়ে সম্ভব হবে? চাকা বদলাতে হবে, শেলী সহ গাড়িটাকে খাদে ফেলতে হবে। তারপর এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পারভীনের গাড়িটা খুঁজে বের

করতে হবে। তারপর বাড়ি ফেরা। বাড়ি ফিরে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে অ্যাপ্রন খুলতে হবে। তারপর গায়ে জামা দিয়ে মুন্সীর সামনে উপস্থিত হতে হবে। ভাবটা যেন, সারা সন্ধ্যাই আমি আমার ডেস্কে বসে কাজ করছিলাম।

আমি নিজেই শিউরে উঠলাম। এর মাঝে কাজ সমাধানের সম্ভাবনা যেন খুবই কম। তাড়াহুড়ো করতে গেলেও কাজের মাঝে ফাঁক থেকে যেতে পারে। বিপদ তখন এড়াতে পারবো না। কিন্তু এখনই কি বিপদ আর এড়াতে পারছি ? আমার এ পরিকল্পনা কার্যক্ষেত্রে এমন রূপ নেবে তা যেন ভাবতেই পারিনি। এর জন্যে নিজেকে পাগল মনে হলো—জেনে শুনে যেন বিপদ ডেকে আনা। সময়মতো কাজ সমাধা না করতে পারলে পারভীনের জন্যেও সমস্যা দেখা দেবে। আমার দেরি দেখে ওর মনোবল ভেঙে পড়তে পারে। তখন শেলীর মৃত্যু সংবাদে সবাই আমাদের ওপর সন্দিহান হয়ে উঠতে পারে।

বৃষ্টি আর দমকা হাওয়ার মধ্যেও আমি ঘেমে উঠলাম। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে গাড়ির পেছনে ছুটে গেলাম।

ডালাটা খুলে খোল থেকে বাড়তি চাকাটা টেনে বের করলাম। আমার হাতের আঙুলগুলো দ্রুত গতিতে চাকার ফাটা জায়গাটা খুঁজে বেড়াতে লাগলো। পাচ্ছি না। আমার সারা শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। গোমেজ কি চাকাটা ফাটা দেখে তা বদলে রেখেছে ? চিন্তাটা মাথায় আসতেই হাত-পা অবশ হয়ে এলো। কথাটা আগে মোটেও মাথায় আসেনি। তার জন্যে নিজেই নিজেকে গালি দিয়ে উঠলাম। দু'হাতে

আরো পাগল হয়ে খুঁজলাম ফাটাটা। হঠাৎ বা হাতের মধ্যমাটা টায়ারের ফাটার গায়ে আটকে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

যন্ত্রপাতি সবকিছু বের করে চাকা বদলানো শুরু করে দিলাম। সময় এখন আমার পেছনে খাড়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

চাকা বদলানো যে কতটা জঘন্য কাজ তা আগে কখনো টের পাইনি।

আলো নেই। আলো জ্বালতেও সাহস পেলাম না। অন্ধকারেই সম্পূর্ণ আন্দাজের ওপর আমাকে কাজ করে যেতে হচ্ছে। বৃষ্টি-বাতাস না থাকলে অবশ্য কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ হতো। পরিকল্পনার সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা মোটেও ভাবা হয়নি।

চাকাটা ভালো করে ধরতে পারছি না। বার বার পিছলে যাচ্ছে। হাত দু'টোতেই কাদা লেগে গেছে। আর নাটগুলোও যেন সময় বুঝেছে। কিছুতেই খুলবে না। হায়, আমার কি হচ্ছে? কেমন একটা ভীতি যেন আমাকে ক্রমশঃ দুর্বল করে ফেলছে।

আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত চাকাটা খুলতে পারলাম। সেটাকে নিয়ে পেছনের খোলে রাখলাম।

ইলেকট্রনিক হাত ঘড়িতে সময় দেখে নিলাম—শুধু মাত্র চাকাটা খুলতেই সাত মিনিট চলে গেছে। মনে হচ্ছে, একটু তাড়াতাড়িই হলো। আর এ কথা মনে হতেই হঠাৎ যেন

কাজ করার শক্তি এসে শরীরকে কিছুটা চাঙ্গা করলো।

কিন্তু চাকাটা লাগানো আরো বেশি ঝামেলার কাজ হয়ে দাঁড়ালো। চাকার গর্তগুলো অন্ধকারে ঠিকমতো খুঁজে পাচ্ছি না। ফলে এক্সেলের সাথে খাপে খাপে চাকা বসাতেও পারছি না। এ যেন চাকার সাথে রীতিমত যুদ্ধ—অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চাকা লাগানো সত্যি দুরূহ ব্যাপার। মনে হচ্ছিল, কেন যে এসব কিছু করতে গেলাম! এত কষ্ট আর মানসিক যন্ত্রণার চাপ পোহানোর কোন মানে হয় না। টাকা আর ঐ মেয়েটার নেশা—আমার রিপু ক'টাকে এমন কাজের জন্যে আমাকে তাড়িয়ে এনেছে, বুঝতে পারলে আগেই সট্‌কে যেতাম। এখন চাকা লাগাতেই যদি মূল্যবান সময় সব শেষ হয়ে যায়, তবে কি কাজে লাগবে এত সব কষ্ট!

যা হোক, শেষ পর্যন্ত চাকাটা লাগাতে পারলাম। সব দম যেন এক চাকা লাগাতেই শেষ হয়ে গেল। হাঁপাচ্ছি। কিন্তু আবার বিপত্তি দেখা দিলো, চাকার ঢাকনিতে চাকা খুলে নাটগুলো রেখেছিলাম। এখন দেখছি পাঁচটা আছে, আরেকটা নেই। কোথায় গেলো? আশপাশে মাটিতে হাত বুলিয়ে খুঁজলাম। পেলাম না। দূর ছাই। একটা নাট খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করে শেষ পর্যন্ত সবই হারাবো? যা হয় হোক, ওই পাঁচটাই লাগিয়ে দিলাম। এখন সময় নষ্ট করা মানে বোকামী। নাটগুলো এঁটে চাকার ঢাকনিটা দ্রুত পরিয়ে দিলাম। ঘড়ি দেখলাম। আর মাত্র দশ মিনিট বাকী। এর মধ্যেই কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে যেতে হবে।

তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে গাড়ি স্টার্ট করার জন্যে হাত বাড়ালাম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। আমার হৃৎস্পন্দন যেন হঠাৎ থেমে গেলো।

শেলীকে দরজায় ঠেস দিয়ে যেখানটায় বসিয়ে গিয়েছিলাম, সে-জায়গাটা খালি।

ভোজবাজির মতোই অদৃশ্য হয়ে গেছে শেলী।

তিন

দমকা হাওয়া থাকলেও বৃষ্টি কিছুটা কমে এসেছে। আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢাকা। টিলাগুলোর সাথে বাতাসের দাপাদাপি। শোঁ-শোঁ শব্দ উঠছে চারদিক থেকে।

সম্বিত ফিরে পেয়ে আবার তাকালাম ডান দিকের সীটটার দিকে। অচেতন শেলীকে ওখানেই রেখেছিলাম। এখন নেই। আসন শূন্য। বুকের মধ্যে এবার ধুপ ধুপ শব্দ হচ্ছে। কোথায় গেল? পেছনের আসনের দিকেও তাকালাম। গেল কোথায়? তবে কি চাকা বদলের সময় ওর জ্ঞান ফিরে এসেছিল? তাই হবে। আর জ্ঞান ফিরে পেয়েই চুপচাপ গাড়ি থেকে নেমে গেছে।

গাড়ি থেকে নামলাম। পাগলের মতো গাড়ির চারদিকে ঘুরে দেখলাম। নাহ্, কিছুই নজরে এলো না।

চারদিকে যা অন্ধকার, তাতে একটু দূরেও কিছুই নজরে আসার কথা নয়। সব বুঝি এখন ভেস্তে যায়। কেন—কেন

এমন হচ্ছে? কিসের অভিশাপে আমি বার বার বাধাগ্রস্ত হচ্ছি? একধাপ এগুলে, দ্বিতীয় ধাপে এসেই বাধা পাচ্ছি? না, না, এ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে মুক্তি পেতে হবে।

ছুটে গিয়ে আবার গাড়িতে বসলাম। আলো দু'টো খেলে দিয়ে সন্ধানী দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকালাম।

হেড লাইটের আলো পেয়ে বৃষ্টি ভেজা পাহাড়ী পথটুকু ঝলমল করে উঠলো। দৃষ্টি এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে খাদের ধারে আসতেই চোখ দু'টো থেমে গেলো।

রাস্তা থেকে নেমে পাহাড়ের গা বেয়ে নিচের দিকে পায়ে হাঁটা পথ ধরে ধীরে ধীরে হাঁটছে শেলী। হাঁটা নয় যেন, টলছে। হাত দু'টো সামনের দিকে মেলে ধরে টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে। এ যেন কোন অন্ধের অপরিচিত পথ চলা।

বেশিদূর যেতে পারেনি। গাড়ি থেকে বড়জোর একশো গজ হবে।

কি করব এখন? কাঁচের ভেতর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে ভাবছি। শরীরে যেন আর জোর পাচ্ছি না। গাড়ি থেকে নামবো সে-শক্তিও যেন আমার মাঝে নেই।

আমি যেন ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে পড়ছি। দাঁতে দাঁতে বার কয়েক খট্ খট্ করে উঠলো। মনোবলও বুঝি আমার ফুরিয়ে আসছে। আর সময় তো শেষ হওয়ার পথে।

তবু শেষ চেষ্টা কি একবার আমি করবো না? তাহলে যে এখনই ওর পেছনে ছুটতে হয়।

আর দেরি করলাম না। গাড়ি থেকে নেমেই ছুটতে শুরু

করলাম। গাড়ির আলোয় আমার শারীরের দীর্ঘ ছায়া আমার সাথে সাথে এগিয়ে চললো।

চলন্ত ছায়া দেখে শেলী থেমে গেলো। ঘুরে দাঁড়ালো। আমাকে দেখতে পেয়েও দাঁড়িয়ে রইলো।

আমি দ্রুত পায়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম।

কাছে গিয়ে বুঝতে পারলাম, শেলী হাঁপাচ্ছে। হা-করে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে আর ফেলছে।

'রাসেল—মাই ডার্লিং, তুমি এসেছো? আমি জানি, আমাকে বাঁচাতে তুমি আসবেই।' কথা বলছে না, যেন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

আমি ভালো করে দেখলাম ওকে। কপালের রক্তের দাগটা বৃষ্টির ফোঁটায় ভিজে একটু ছড়িয়ে গেছে। কপালের ঠিক মাঝখানটায় মাংস ফুলে উঠেছে। চোখে মুখে তীব্র ভীতির ছায়া। কাঁপছে।

টলতে টলতে আমার দিকে এগিয়ে এলো শেলী।

'দুর্ঘটনায় রাসেল, আমার মাথাটা…'

দ্রুত কোনরকম চিন্তা করার আগেই শেলী আমার দু'হাতের সীমানায় এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মাথা এবং সমস্ত শরীর আমার ওপর এলিয়ে দিয়ে দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো।

'কি ভাবে কি ঘটলো, আমার কিছুই মনে আসছে না। কিছুই বলতে পারবো না। আমার মাথায় খুব লেগেছে, রাসেল।'

ও আমাকে আরও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো। মনে

হলো, কোন সাপের ঠাণ্ডা প্যাঁচ আমাকে ক্রমাগত পিষে ফেলতে চেষ্টা করছে। সারা শরীর আমার শিরশির করে উঠলো। তাড়াতাড়ি ওর হাত দুটো ধরে টেনে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম।

'এ কি, রাসেল, তুমি আমাকে অমন করে ঠেলে দিচ্ছ কেন?' কেঁদে উঠলো শেলী। ভেজা ভেজা চোখ দুটো থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো। 'রাসেল, কি হয়েছে—বলো? আমাকে তুমি—ওহ্ কি যন্ত্রণা...'

আমার বুকে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো শেলী।

একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। তখন আমি ছোট, গ্রামে থাকি। সে-ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই আমি দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম।

আমার বাবার একটা পোষা কুকুর ছিলো। বাবা কুকুরটাকে খুব ভালবাসতেন। কুকুরটাও ছিল তেমনি—প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা। আদর পাবার লোভে সারাক্ষণ শুধু বাবার পেছন পেছন ঘুরতো। ধমক দিলেও লেজ গুটিয়ে, শরীর বাঁকিয়ে বাবার পায়ের কাছে গিয়ে মুখ ঘষতে থাকতো। সেই কুকুরই একদিন পাগল হয়ে গিয়েছিল। আর ওটার পাগল হওয়ার প্রথম শিকার ছিলাম আমি—আমাকে কামড়ে দিয়েছিল। বাবা ভীষণ চটে গিয়ে একটা মোটা লাঠি দিয়ে কুকুরটাকে আঘাত করেছিলেন। বাবা ওটাকে একদম মেরে ফেলতে হয়তো চাননি—কারণ, খুব একটা ভালো তাক করে তিনি জোরে মারেন নি। কিন্তু আঘাতটা কুকুরটার মাথায় পড়ে গিয়েছিল।

আমি বিছানায় বসে জানালা দিয়ে দেখছিলাম। কুকুরটা ক্যাঁ শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল। মনে হলো, ওটার সামনের দিক বুঝি অবশ হয়ে গেছে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার কুকুরটা স্প্রিং এর মতো লাফিয়ে উঠে পড়লো। লেজ গুটিয়ে কোথায় পালাবে তা নয়, লেজটা পেছনের দুপায়ের মাঝে ঢুকিয়ে নাড়তে নাড়তে ঘাড় নুইয়ে বাবার পায়ের দিকে এগিয়ে এলো। বাবা লাঠি তুলে আরেকটা আঘাত করতে চাইছিলেন, কিন্তু পারছিলেন না—তাঁর হাত কাঁপছিল। তবু দ্বিতীয় আঘাতটা গিয়ে কুকুরের পিঠে পড়লো। মাটিতে পড়ে গেল কুকুরটা। কিন্তু একপাক মাটিতে গড়িয়েই ওটা আবার উঠে দাঁড়ালো। আবারও ওভাবে লেজ নেড়ে বাবার দিকে এগিয়ে এলো। বাবার এবারের আঘাতটা কুকুরটার মাথার মাঝে পড়লো। কুকুরটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। পা দু'টো তুলে গড়াগড়ি খেল। সঙ্গে সঙ্গে মরলো না। যন্ত্রণায় আর্তচিৎকার করতে করতে মাটিতে আছাড়ি পিছাড়ি খেলো। ওঠারও চেষ্টা করলো বার দু'য়েক, পারলো না। ধীরে ধীরে কুঁকড়ে এলো কুকুরটা। গলায় একটা মর্মন্তুদ গোঙানির শব্দ। ক্রমশঃ তা থেমে এলো। পা গুলো টান টান করে সমস্ত শরীরটা খিঁচুনী দিয়ে মরে গেল কুকুরটা। ভয়ঙ্কর সে মৃত্যু ওটাকে গ্রাস করতে সাত-আট মিনিট সময় নিয়েছিল। ঐ দৃশ্যটা আমি অনেক দিন পর্যন্ত ভুলতে পারিনি। স্মৃতিতে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে অহরহ ঘুরে বেড়াতো। প্রায়ই স্বপ্নের মধ্যে ওই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা আমাকে ভীষণ রকম চমকে দিতো।

মনে হলো সেই অতীত বুঝি এখন আমার সামনে। সে-দৃশ্যটা যেন আবার ঘটতে যাচ্ছে। এখন বাবা নেই, তার ভূমিকায় আমি অভিনয় করছি। আমার বাবা তার প্রিয় কুকুরটা মারার চেষ্টা করেছিলেন, এখন আমি—হ্যাঁ আমি চেষ্টা করছি একটা মেয়েকে মারতে। যে মেয়ে আমার বিবাহিতা স্ত্রী। আমার কাছে প্রেমের কাঙাল। আর সামান্য কিছু সময়ের মধ্যে যে মেয়েকে মৃত্যুর হিম শীতল ছোঁয়া এসে গ্রাস করবে, সে মেয়ে আমারই বুকে, পরম নিশ্চিন্তে আশ্রয় খুঁজছে। নির্ভয়ে আমার কাছে নিজেকে সঁপে দিচ্ছে।

আর আমি, আমার ইচ্ছে হচ্ছে, ওর বাঁচার তাড়নাটাকে এই মুহূর্তে দু'হাতে গলা টিপে শেষ করে দিই। কিন্তু না, আমি ওকে গলা টিপে মারতে চাই না। ওর মৃতদেহ আবিষ্কারের পর, ওকে গলা টিপে মারা হয়েছে এমনটা কেউ বুঝুক তা আমি হতে দিতে পারি না। ওর মৃত্যু হয়েছে গাড়িসহ নয়শো ফিট, নিচের খাদে পড়ে, থেঁতলে—তাই সবাইকে বোঝাতে হবে।

'তোমার কি হয়েছে, রাসেল? তুমি কোন কথা বলছো না কেন?' আমার বুকে মাথা ঘষতে ঘষতেই বললো শেলী।

'এ-এইতো, এইতো আ-রকি,' আমার ঠোঁট দু'টো শুধু কাঁপলো, কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না।

আমি তখন শুধু ওর দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, ওকে কিভাবে খুন করা যায়। খুব তাড়াতাড়ি—আর সময় নষ্ট না করে।

আমার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে শেলী ঘাড় তুলে আমার দিকে তাকালো। তারপর এক ঝটকায় আমাকে একটু ঠেলে নিজে সরে দাঁড়ালো।

গাড়ির পুরো আলোটা এসে তখন আমার ওপর এসে পড়ছে। তারই স্পষ্ট আলোয় শেলী আমাকে তীক্ষ্ণভাবে দেখছে। আমার চোখ-মুখের রেখাগুলো, আমার ভাবভঙ্গি সবকিছু দেখে হয়তো সে বুঝে ফেলেছে, তাকে আমি খুন করতে চলেছি। হয়তো বা গোপনীয় কিছু টের পাওয়ার চেতনাটা ওর নাকে এই মুহূর্তে জেগে উঠেছে।

হঠাৎ ও একটা অমানুষিক ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠলো। আর সাথে সাথেই পেছন ফিরে ভীত সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে গাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করলো।

কিন্তু আমি যেন নড়তে পারলাম না। আমার পা দু'টো যেন গেঁথে আছে। ভারী জগদ্দল পা দু'টোকে টেনে তুলে ওর পেছনে ছোটার সব ক্ষমতাই যেন আমার শেষ হয়ে গেছে। স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার নিঃশ্বাস আমি শুনতে পাচ্ছি। এ যেন কান্না জড়ানো ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস—দমকা হাওয়ায় শুধু কাঁপছে।

অসহায় ভাবে তলিয়ে যেতে যেতেও আমি শেষ পর্যন্ত ছুটলাম ওর পিছু। পারছি না—তবু ছুটতে হচ্ছে। আমার পা দু'টো যেন অসাড়, থেকেও নেই। তবু টেনে টেনে, ধীরে, লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলাম ওর পিছুপিছু।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো শেলী। দেখলো—আমি ওর পেছনেই

ছুটে আসছি। আতঙ্ক ওকে যেন আরও পেয়ে বসলো। গলা থেকে বের হয়ে এলো ভয়ার্ত অস্ফুট আর্তনাদ। আর সেই সাথে ছুটলো আরো জোরে। কিন্তু পারলো না। সামনেই একটা পাথরে হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। মনে হলো পা মচকে গেছে।

গাড়ির জ্বলন্ত দুটো আলোর সামনে হাঁটু দুমড়ে পড়ে আছে শেলী, সেই অবস্থাতেই ও আমার এগিয়ে আসা দেখছে। আমি কাছে আসতেই ওর মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেল। কুৎসিত চেহারাটা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে আরও যেন কুঁকড়ে গেল।

ওর কাছাকাছি পৌঁছে ডানদিকে তাকিয়ে একটা বড় পাথরের টুকরা পড়ে থাকতে দেখলাম। পাথরটা কুড়িয়ে নিলাম।

পাথর হাতে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'রাসেল, এ তুমি কি করছো। তুমি কি ঠিক আছো, রাসেল? দোহাই তোমার, আমাকে দয়া করো—পাথরটা ফেলে দাও।' আকুতি ভরা দৃষ্টি মেলে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো শেলী। 'রাসেল—রাসেল, আমি তোমাকে ভালোবাসি, রাসেল। আমাকে তুমি মেরো না। তোমাকে আমি আমার সবকিছু দিয়ে দেবো—তবু, তবু তুমি আমাকে মেরো না। তোমার পায়ে পড়ি, রাসেল।'

একটু ঝুঁকে ওর ডান হাতের কব্জিটা জোরে চেপে ধরলাম। কিন্তু আমার তখন পা থেকে মাথা পর্যন্ত থরথর করে কাঁপছে। পাথরটা এমন ভারী ঠেকছে যেন আর হাতে রাখতে

পারছি না। পাথরটা তখন ওর মাথার ওপর তুলে ধরেছি।

'রা-সে-ল··· !'

কমিশনার সাহেব, বিশ্বাস করুন, প্রচণ্ড গরমে বেলাভূমির এই বাংলোটায় বসে এখনও আমি সেই চিৎকার শুনতে পাচ্ছি।

মৃত্যু মুহূর্তের এমন আতঙ্কিত চিৎকার, আমি জীবনে আর কখনো শুনিনি।

চোখ বুঁজে ফেললো শেলী। হাত দিয়ে মাথাটাকে বাঁচাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলো না। উপায়হীন কোন জন্তু যেন মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে। হাঁটু গেড়ে, নিশ্চল হয়ে বসেই রইল শেলী।

মাথার ঠিক মাঝখানটায় মারলাম পাথরটা দিয়ে।

আমার মাথাটা ভোঁ করে ঘুরে উঠলো। হাত থেকে পাথর ফেলে দিলাম। সাথে সাথেই আমার সারা শরীরে আবার থরথর করে কাঁপুনি এলো। আমি একটু পিছিয়ে গেলাম।

রাস্তার ওপর ঢলে পড়েছে শেলী।

বাবার পোষা কুকুরটা শেষ আঘাতের পর যেমন করে এক পাক ঘুরে আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে বাবার পায়ের কাছে এসে ঢলে পড়েছিল—ঠিক তেমনি। আর আমি···আমি বুঝতে পারছিলাম, শেলী মরে যাচ্ছে।

ওকে তুলে নিতে কাছে গিয়েও তুলে নিতে পারলাম না। এত রক্ত ছিল ওই দেহে, বিশ্বাসই হতে চায় না।

ওর একটা কব্জি ধরে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে গাড়ির কাছে নিয়ে এলাম।

গাড়ির দরজা খুলে বস্তার মতো ওকে ভেতরে ঠেলে দিলাম। ওর গায়ে হাত লাগাতেই টের পেলাম, ওর পেশীগুলো তখনো থরথর করে কাঁপছে।

আমার শরীরটাকে বাইরে এনে দরজাটা সজোরে বন্ধ করলাম। তারপর বেশ জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনের দুর্বলতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলাম।

আমার কাজ শেষ। এ পৃথিবী থেকে শেলী বিদায় হলো। আর ঠিক তখনই মনে পড়লো—আমার জীবনটাও এ মুহূর্ত থেকে বিপদের মুখে পড়লো।

শেলী যে জায়গাটায় ঢলে পড়েছিল, রাস্তার সে-জায়গাটায় নজর দিলাম। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো রক্ত জমাট বাঁধার আগেই রাস্তা থেকে ধুয়ে ফেলছে। পাথরটার দিকে চোখ পড়তেই ছুটে গেলাম ওটার কাছে। তুলে ফেলে দিলাম অন্ধকার পাহাড়ের ঢালুতে।

তারপর গাড়ির কাছে এসে আবার দরজা খুললাম। ভেতরে ঝুঁকে ইঞ্জিন চালু করলাম। শেলীকে আরেকটু টেনে স্টিয়ারিংটার সামনে ঠেস দিয়ে বসালাম। দরজার কাঁচটা দেখলাম—ওঠানোই আছে। গাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এলাম পাহাড়ের টিলার ঢালু পথটায়। গাড়িটা ধীরে ধীরে ঢালুতে গড়াতে শুরু করলো। গতিটা একটু বাড়তেই স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ঐ সাদা বেড়াটার দিকে মুখ ফিরিয়ে দরজাটা এক ঝটকায় বন্ধ করে গাড়িটা ছেড়ে দিলাম।

গাড়িটা বেশ জোরে ছুটছে। গাড়ির সামনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো সাদা বেড়াটা—যে বেড়া পথে চলা-চলকারী. যে কোন গাড়িকে নিচের খাদে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে দাঁড়িয়ে আছে।

বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি লক্ষ্য করলাম, গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর নেমেই লাফিয়ে উঠলো। তারপর পরই জ্বলন্ত আলোটা সজোরে বেড়ার গায়ে ধাক্কা খেয়ে ঝনাৎ করে শব্দ করে কাঁচগুলো গুঁড়ো হয়ে গেল। বেড়াটা ভেঙে গাড়ির অর্ধেক এগিয়ে গিয়েই নিচের দিকে বাঁকা হয়ে গড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে নিচে পট্‌পট্‌ গাছপালা ভাঙার শব্দ শুনলাম। মুহূর্তের মধ্যে গাড়িটা খাদের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

গাড়িটা উল্টেপাল্টে পাহাড়ের গায় আছড়ে পড়ার শব্দ শুনলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সব শেষে কানে এলো একটা বিকট শব্দ।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ভাঙা বেড়ার ঐ পথটা দিয়ে নিচের দিকে তাকালাম।

গাড়িটা প্রায় দু'তিনশ ফুট নিচে পাহাড়ের একটা খাঁজে আটকে আছে। আমি দেখলাম গাড়িটা, অন্ধকারে, একটা লক্‌লকে আগুনের শিখা গাড়ির গা থেকে ঝলসে উঠলো। দেখতে দেখতে কয়েক মুহূর্তে বিরাট একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো গাড়িটা।

জানালার চৌকাঠে যখন পা রাখলাম, শুনলাম আমার গলা বলছে, "টেলিফোনে আমাদের পূর্বের আলোচনা ও আজকের তারিখে আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমরা আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রিকে আরও বাড়াবার ক্ষেত্রে আপনার পরিকল্পনা বিবেচনা করবো। তবে আপনার পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত এবং এর সার্বিক মুল্যায়ন সমীক্ষা জানার অপেক্ষা করছি···"

আঃ! মনের সাহস ফিরে পাবার জন্যে দারুণ কাজ দিল এই কথাগুলো।

ডেস্কের একপাশে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছে পারভীন। বিস্ফারিত ওর দু'চোখে যেন স্বস্তি ফিরে আসছে। ধীর স্বচ্ছন্দ গতিতে টেপ রেকর্ডারের ফিতেটা এখনো চলছে, আর বের হচ্ছে আমার নির্বিকার গলার স্বর। এই গলার স্বরই আমার অ্যালিবাই—একদম পাকাপোক্ত ভাবে প্রমাণ করবে আমি ঘরেই ছিলাম।

লাফিয়ে ঘরে নামলাম। গায়ের অ্যাপ্রনটা ভিজে, চুপসে গেছে। পায়ের জুতোয় কাদা। হাত দুটো বেশ নোংরা।

একটা বড় তোয়ালে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলো পারভীন।

'তাড়াতাড়ি করো। মুন্সী বসে আছে. আধ ঘণ্টারও বেশি হবে। আর এদিকে টেপও প্রায় শেষ—বড়জোর দু' তিন মিনিট চলবে।

গায়ের অ্যাপ্রন একটানে ছিঁড়ে গা থেকে খুলে ফেললাম। তোয়ালে দিয়ে দ্রুত হাতমুখ-গা মুছলাম।

'পারভীন, ঠিক আছে কিনা দেখো ?'

'ঠিকই আছে। তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দাও।'

জামাটা চেয়ারের ওপর থেকে তুলে এগিয়ে দিলো পারভীন। ওর হাত থেকে জামাটা ছোঁ মেরে নিয়ে গায়ে চাপালাম।

ডেস্কের নিচের ড্রয়ার থেকে আমার চপ্পলটা বের করে দিলো পারভীন।

'জুতোটা বদলে নাও। ওটা কাদায় একদম একাকার হয়ে গেছে।'

জুতোটা খুলে অ্যাপ্রনে পেঁচিয়ে পোঁটলা করে ফেললাম।

পারভীনের হাত থেকে চিরুণীটা নিয়ে মাথার চুলগুলো ঠিক করে নিলাম। করছিলাম সব কিছুই, কিন্তু এদিকে আমার পা'টা ক্রমশঃ ভারী হয়ে এলো। কোনমতে যেন দাঁড়িয়ে আছি। অবশ পা দুটো টেনে টেনে এখন ঘরের বাইরে গেলে যে কারো মনে সন্দেহ জাগতে পারে। তার ওপর রয়েছে একটা অজানা কাঁপুনি—আমার সমস্ত শরীরটা যেন দখল করে নিয়েছে। এ কাঁপুনি আমাকে নির্ঘাৎ ডোবাবে।

ঠিক তক্ষুণি পারভীন আধগ্লাস নির্জলা হুইস্কি বাড়িয়ে ধরলো আমার সামনে।

আমি সপ্রশংস দৃষ্টিতে চোখ তুলে পারভীনের দিকে চাইলাম। মেয়েটার বুদ্ধি আছে বটে। সবকিছু চিন্তা করে একদম ঠিকঠাক রেখেছে। এমন একটা দুরূহ কাজে সুযোগ্য সহযোগী, সন্দেহ নেই।

নির্জলা হুইস্কিটা গলার পথে নামার সময় তীব্র জ্বালা

ধরিয়ে দিয়ে গেল। চোখ বুঁজে সে-জ্বালা থেকে নিজেকে ধাতস্থ করে নিলাম। একটা সতেজ ভাব ফিরে পেলাম। মাংসপেশীর কাঁপুনি নিমেষের মধ্যে দূর হয়ে গেল।

'মুখটা মুছে নাও,' আরেকটা পরিষ্কার তোয়ালে এগিয়ে দিল।

মুখ মুছলাম। ঠোঁটের কাছে একটা সিগারেট এগিয়ে দিল পারভীন। তারপর নিজেই দেশলাই জ্বালালো। আমি একটু ঝুঁকে সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

'এখন নিশ্চয়ই শরীর ঠিক লাগছে তোমার?'

'হ্যাঁ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, পারভীন। এ মুহূর্তে তোমার পরিচর্যা সত্যি ভুলবার নয়।'

'তুমি এখন বরং মুন্সীর সঙ্গে দেখা করো।'

'এখানের অন্য সবকিছু পরিকল্পনা মতো ঠিক আছে?'

'সব ঠিক আছে। আমিই শুধু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম দেরি দেখে। তাছাড়া আর সবকিছু যেমন যেমন ঠিক করা ছিল, সেভাবেই হয়েছে। এখন আবার তোমার পালা।'

আমার ভেতরে জয়ের আনন্দ-ঢেউ বয়ে গেল। খুব সহজ ভঙ্গিতে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম।

'ঠিক আছে, কিছু ভেবো না। আমি প্রস্তুত।'

তোয়ালে দুটো অ্যাপ্রনে টুপি আর কাদা মাখানো জুতো জোড়া—সব একটা বাণ্ডিল করে ডেস্কের নিচের ডালায় ঢুকিয়ে রাখলো পারভীন, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে যাবার সম্মতি দিলো।

'যাও, আমি বন্ধ করে দিচ্ছি।' হাত বাড়িয়ে টেপ রেকর্ডারটা

বন্ধ করে দিলো পারভীন। হঠাৎ করেই ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

দরজা খোলার আগে লম্বা করে শ্বাস টেনে নিলাম। বাইরে পা রেখেই সরাসরি মুন্সীর দিকে তাকালাম। মুন্সী বসে বসে আপন মনে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলো।

'তোমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখতে হবে ভাবতে পারিনি। হাতের কাজটা শেষ করতে দেরি হয়ে গেল। কিছু মনে করো না, মুন্সী।'

'না না তাতে কি।' এতক্ষণ অপেক্ষা করার ক্লান্তি ওর কথায় স্পষ্ট বোঝা গেল। তবু মুখে বিষণ্ণ হাসির রেশ টেনে আবার বললো, 'তুমি দেখছি বাড়িতেও বেশ কঠিন পরিশ্রম করো।'

'হঠাৎ করেই হাতে বেশ কিছু কাজ জমে গিয়েছিল। চলো, ঘরে গিয়ে বসি।'

দু'জনে গিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকলাম। পারভীন আমাদের কারো প্রতিই কোন আগ্রহ প্রকাশ না করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বাইরে নজর করে দেখলাম, লাউঞ্জ পেরিয়ে হল ঘরের দিকে যাচ্ছে পারভীন।

'চলবে নাকি একটু?' আমি ডেস্কের এক কোণায় রাখা হুইস্কির বোতলটার দিকে মুন্সীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

'দাও, একটু খাওয়া যাক,' ডেস্কের একপাশে রাখা চেয়ারে মুন্সী বসে পড়লো। 'তোমার এখানে আসার সময় তোমার স্ত্রীকে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখলাম। সে কি চালানো, ওরে

বাব্বা, ওনার জোরে গাড়ি চালানো দেখে আমার রীতিমত বুক কাঁপছিল।'

মার্সিডিজটা জোরে চালিয়েই নাকি সে আনন্দ পায়। তাছাড়া এই পথের আঁট-ঘাট ওর খুবই জানা।'

'সে তুমি যাই বলো না কেন,' মুন্সীর বলার ধরনটা খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ, 'উনি কিন্তু ভীষণ জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন।'

আমি ওর কথায় খুব আগ্রহ প্রকাশ করলাম না। দু'টো গ্লাসে হুইস্কি ঢাললাম। ওর দিকে একটা গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'তুমি এমন ঝড়-বাদলের রাতে আসবে তা কিন্তু ভাবিনি। সত্যি বলতে কি, তুমি আসাতে আমার খুব আনন্দ লাগছে।'

'আমারও তোমার এখানে আসতে পেরে ভালো লাগছে। আশা করি, আমার জন্যে নিশ্চয় কোন ভাল সংবাদ তুমি রেখেছ।'

'মার্কেটের নতুন কোন খবর রাখো নাকি ?'

'রহমান ট্রেডিং টিক্ কাঠ স্টক করছে, শুনেছ নিশ্চয় ?'

'শুনেছি। ওরা একটা বিরাট দাঁও মারবে দেখো। এখন বলো দেখি, তুমি আর আমি যদি…'

আমাকে ভীষণ রকম চমকে দিয়ে টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠলো।

বিদ্যুৎ চমকের মতো শেলীর কথা আমার মনে ভেসে উঠলো।

টেলিফোন তুলে বললাম, 'কে ?'

'মিসেস জোয়ারদার ফোনের ও প্রান্তে আছেন,' পারভীন ফিস ফিস করে বলে গেলো, 'তিনি শেলীর কথা জানতে চাইছেন। আমি বলেছি, সে রওনা হয়ে গেছে। তবু মিসেস জোয়ারদার তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

মিসেস জোয়ারদার! গোলমাল বুঝি এখনই পাকাবে। বুকটা আমার কেঁপে উঠলো। সেই সাথে টেলিফোন ধরা হাতটাও। বললাম, 'লাইনটা দাও।'

টেলিফোন লাইনে ক্লিক করে শব্দ হতে শুনলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই মিসেস জোয়ারদারের গলা খলখলিয়ে উঠলো, 'মিস্টার রাসেল?'

'বলছি। কি ব্যাপার মিসেস জোয়ারদার··· ?'

'আমি শেলীর কথা বলছিলাম। মিস পারভীন জানালো, সে নাকি আধ ঘণ্টা আগেই বের হয়েছে। সোজা আমার এখানেই আসবে। কিন্তু এখনও এসে পৌঁছুলো না, কিছুই যে বুঝতে পারছি না।'

'আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে নিশ্চয়, 'হঠাৎ খেয়াল হলো মুন্নী আমার কথা শুনছে, লক্ষ্যও করছে। আমি একটু সচেতন হয়ে উঠলাম। 'ঝড়-বৃষ্টির রাত, হয়তো একটু সাবধানেই গাড়ি চালাচ্ছে।'

'ড্রাইভার নেই?'

'না।'

'কিন্তু আমার বাড়ি পৌঁছুতে কুড়ি মিনিটের বেশি লাগার কথা নয়—তা যত আস্তেই চালাক না কেন। কিন্তু এর মধ্যে

আরো যে কুড়ি মিনিট হয়ে গেল, তাই তো চিন্তা লাগছে।

'আপনি কোন চিন্তা করবেন না। ও হয়তো এখনই আপনার ওখানে পৌঁছে যাবে। মনে হয় বের হতে ওর একটু দেরি হয়ে গেছে। আমি এখন ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে খুব ব্যস্ত আছি... '

টেলিফোন রেখে দেয়ার জন্যে ভদ্র ভাবে আর কি বলা যায় বুঝতে পারলাম না। শেলী পৌঁছেনি বলে মিসেস জোয়ারদারের যে স্বাভাবিক শঙ্কা, তা দূর করতে আমার নির্বিকার ভাব দেখানোই একমাত্র পন্থা ভেবেছিলাম। কিন্তু ঐ বিচ্ছুটা কিছুতেই আমার কথা সহজ ভাবে নিতে চাইছে না। বরং ওর গলার স্বর আরও বেশি তিক্ত মনে হলো।

'কি জানি কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসেছে কিনা। ওস্তাদ মতিলাল আসার আগেই শেলী চলে আসবে বলেছিল। তা নয়, ওর জন্যেই আমরা এখন অপেক্ষা করছি। ওদিকে রাস্তাটাও বলতে গেলে খুবই বিপজ্জনক। তার ওপর সে একা, ড্রাইভার নেই। মিস্টার রাসেল, ওর জন্যে আমরা ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছি। পুলিশে খবর দেয়াটাই উচিত নয় কি?'

বুকটা আচমকা মোচড় দিয়ে উঠলো। ডেস্কের নিচের ডালায় এখনও অ্যাপ্রন, জুতো, তোয়ালের পোঁটলাটা রয়েছে। পারভীনের গাড়িটাও ভিজে আর কাদা মাখানো—রেডিয়েটারটা নিশ্চয় এখনও ঠাণ্ডা হয়নি। আর রাস্তার ওপর ঐ রক্তের দাগ—এতক্ষণে কি বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে? না যদি গিয়ে থাকে, তবে সব মিলিয়ে আমার সর্বনাশ কেউ রোধ করতে পারবে

না। পুলিশ সব প্রমাণ হাতেনাতেই পেয়ে যাবে। ওই হাড়-বজ্জাত সাক্ষাৎ ডাইনিটা এখনও টেলিফোন ছাড়ছে না কেন? সে কি এখনই পুলিশ ডেকে এনে আমার প্রাণটা বেঘোরে যাবার বন্দোবস্ত করবে? কাজটা শেষ করে বাড়ি এসেই সোসাইটির খুঁতখুঁতে ওই মেয়েলোকটার পাল্লায় পড়তে হবে জানলে···

'কি হলো, মিস্টার রাসেল? চুপ করে যে, কিছু বলুন?'

'আমার মনে হয় আপনি মিছেমিছেই এতটা চিন্তা করে কাতর হচ্ছেন,' প্রত্যয় ভরা গলায় বললাম। 'আরও মিনিট কুড়ি দেখুন, যদি না পৌঁছায়, আমাকে আবার ফোন করবেন।'

'শেলী ততক্ষণে আহত হয়ে পড়ে থেকে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করুক? আপনার যেমন কথা,' মিসেস জোয়ারদারের গলায় ধারালো স্বর বেজে উঠলো, 'আমি জন্মেও শুনিনি। বলিহারি স্বামী বটে আপনি!'

'আহ্, আপনাকে আর তা বলতে হবে না। আমিও আপনার চেয়ে কম উদ্বেগ বোধ করছি না। আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি, শেলী কোন বিপদে পড়েছে কিনা দেখে আসবো।' মনের প্রচণ্ড রাগ নিজের মধ্যেই চেপে রাখলাম। এ সময়ে রাগটা আমার বিপক্ষেই যাবে। 'ও যদি এর মধ্যেই পৌঁছে যায়, তবে টেলিফোনে জানিয়ে দেবেন। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ নিয়ে আপনার অতটা চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই।'

'কিছু মনে করবেন না, মিস্টার রাসেল,' আমাকে টেলিফোন ছাড়ার কোন সুযোগ না দিয়েই মিসেস জোয়ারদার আবার

বলতে শুরু করলো, 'স্বামী হিসেবে আপনার উদ্বেগ খুবই স্বাভাবিক। আশা করি ওর কোন বিপদই হয়নি, তবু রাস্তাটার কথা একবার ভেবে দেখুন। আমি জানি ও গাড়ি ভালো চালায়, তবু ঐ রাস্তায় বিপদ ঘটতে কতক্ষণ...'

'আপনি দয়া করে আবার ফোন করবেন।' ওকে এক-রকম জোর করে থামিয়ে দিয়ে ফোন রেখে দিলাম।

টেলিফোনে কথা বলার প্রথম থেকে মুন্সী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে ছিলো। আর এদিকে ভেতরে ভেতরে আমি ঘেমে উঠেছি। নিজেকে যতটুকু সংযত রাখার চেষ্টা করছি ততটুকু পেরে উঠছি না। শরীর ও মনের ওপর এতটা চাপ সহ্য করে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ঠিক রাখা সত্যি কষ্টকর।

নিজের বেসামাল অবস্থাটা সামাল দিতেই হয়তো, মুন্সী কোন কথা জিজ্ঞেস করার আগেই বললাম, 'সেই যে বুড়ি জোয়ার-দার—সেজেগুজে এখনও যে সোসাইটির মধ্যমণি হয়ে থাকে, শেলীর চিন্তায় একদম ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। কারণ, ও পৌঁছায়নি। বেহালা বাজনার আসর বসবে, তাই ওর বাড়িতেই যাবার কথা। শেলীর দেরি দেখে সে মনে করছে পথে কোন দুর্ঘটনা হয়েছে শেলীর। দেখো দেখি, যত্তোসব বাজে ব্যাপার, অলুক্ষণে চিন্তার যেন আর সময় পেলো না। শেলী ওর বাড়িতে যাবার উদ্দেশ্যেই রওনা হয়েছে সত্যি, তবে পথে যদি কোন কারণে মত বদলে সিনেমায় বা আর কোন বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে ঢোকে, আমি আশ্চর্য হবো না।'

কিন্তু মুন্সীর চেহারা দেখে আমি যেন আরো ঘাবড়ে গেলাম।

আমার কথায় সে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো।

'রাসেল, কথাটা একদম উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না। রাস্তাটা যে সত্যি খুব বিপজ্জনক, তা তো তুমি নিজেও জানো। আরো—আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, উনি অস্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন।'

'প্লিজ, তুমিও আবার ওই একই কথা শুরু করো না। নিচের রাস্তা সম্পর্কে শেলী অজ্ঞ নয়। তাছাড়া আমি ওকে যতটুকু জানি, ও কোনরকম ঝুঁকি নেবার মেয়েই নয়।' আমি ডেস্কের ওপর রাখা একটা কাগজ টেনে নিলাম। আগে থেকেই নানারকম হিসেব আমি করে রেখেছিলাম। 'রাখো ওসব, এখন কাজ শুরু করা যাক। তুমি আমার হিসাবটা একবার দেখে নাও।' মনে হলো, মুন্সী হিসাবের ব্যাপারে কোন উৎসাহ বোধ করছে না। তবু হাত বাড়িয়ে নিলাম কাগজটা।

'রাসেল, ব্যাপারটা আরেকবার আমাদের চিন্তা করে দেখা দরকার। সত্যি যদি উনি কোন বিপদে পড়ে থাকেন? এ অবস্থায় আমাদের একবার বাইরে গিয়ে দেখে আসা দরকার। তুমি কি ...'

'শেলী নিশ্চয়ই সিনেমায় গেছে। যে রকম যাচ্ছে-তাই বৃষ্টি, পথেই মত পাল্টে চলে গেছে সিনেমায়।'

'তোমার স্ত্রী, তুমিই ভালো বোঝো।' মুন্সী ওর মুখটা কঠিন করে আমার দিকে তাকালো।

'ছাড়ো ওসব বাজে কথা। এসো কাজে মন দিই।'

হিসাবটার মধ্যে ডুবে যেতেই দেখলাম মুন্সী শেলীর

কথা ভুলে গেলো। জাত ব্যবসায়ী বটে। একটানা কুড়ি মিনিট আমরা ব্যবসার খুঁটিনাটি নিয়ে আলাপ আলোচনা চালালাম। আলোচনা থেকে এমন কিছু কথা বেরিয়ে এলো যা আমি আদৌ জানতাম না। আমার ধারণাগুলোকে সে তার ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার যুক্তিতে খণ্ডন করে দিলো। ফলে ওর যুক্তিগুলোকেই গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিলাম।

টেলিফোনটা আবার আমাদের দু'জনের মনোযোগ কেড়ে নিল।

মুন্সী যেন টেলিফোনের শব্দে ঝট্ করে আবার শেলীর চিন্তায় ফিরে গিয়ে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।

আর আমি, আমি যেন টেলিফোনটার ধাওয়া খাওয়ার জন্যই তৈরি ছিলাম। ফোন তুলে নিলাম।

'আমি কবীর হোসেন বলছি। আপনার স্ত্রীর কোন খবর পেলেন?'

আমার গলা শুকিয়ে গেলো। টের পেলাম, আমার মনের আদলও বদলে যাচ্ছে। মুন্সী যাতে আমার চোখ মুখের এ ভাবটা দেখতে না পায় সেজন্যে একটু ঘুরে হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিলাম।

'না তো! ও গেছে মিসেস...'

'আমি মিসেস জোয়ারদারের বাড়ি থেকেই বলছি।' একটু থেমে কবীর হোসেন আবার বললেন, 'চল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেলো, কিন্তু আপনার স্ত্রী এখনও এসে পৌঁছাননি। আমি এখনই আপনার ওখানে আসছি 'মিষ্টার রাসেল।'

'আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি নিজেই গাড়ি নিয়ে…'

কথা শেষ করতে পারলাম না, কবীর হোসেন ফোন ছেড়ে দিলো।

ফোনটা যথাস্থানে রেখে মুন্সীর দিকে তাকালাম। মুন্সীও ঠায় তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বুঝতে পারলাম, কথা বলতে গেলেই এখন গলা কাঁপবে। তবু যথাসম্ভব সামাল দিয়ে বললাম, 'মুন্সী, আমি খুবই দুঃখিত। কাজ আর এগোনো গেলো না। আমাকে এখনই বের হতে হবে। শেলী এখনও ওখানে পৌঁছায়নি। এখুনি পুলিশ এসে পড়বে।'

'পুলিশ?' মুন্সী যেন হঠাৎ চমকে উঠলো।

'পুলিশের গোয়েন্দা কবীর হোসেন, মনে হচ্ছে, মিসেস জোয়ারদারের বাড়িতে তিনিও ছিলেন। সিগারেটের প্যাকেটটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। আমিও একটা নিয়ে ধরালাম। আমার হাত ভীষণ রকম কাঁপছে। কবীর হোসেন শেলীদের পারিবারিক বন্ধু। গাড়ি নিয়ে আমি এখনই বাইরে যাচ্ছি। দেখতে হয় কিছু ঘটেছে কিনা। তবে আমার বিশ্বাস, ওরা অযথাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে। আর…ব্যাপারটা তাই যেন হয়।'

'আমার গাড়ি তো বাইরেই আছে। চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। এ সময়ে তোমাকে একা ছাড়া ঠিক হবে না।'

লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে হলঘরের দিকে যাচ্ছি,—পারভীনকে দেখতে পেলাম।

তাকে ডাকলাম। কাছে আসতেই বললাম, 'মিসেস জোয়ার-

দার মনে করছেন শেলী কোন দুর্ঘটনায় পড়েছে। কবীর হোসেনও মনে হচ্ছে এখুনি এসে পড়বেন। আমি নিচের দিকে যাচ্ছি। দেখি, কিছু দেখতে পাই কিনা।'

পারভীনের মাঝে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলো না।

'খারাপ কিছু ঘটেনি বলেই আমার বিশ্বাস। মিসেস শেলী গাড়ি চালাবার ব্যাপারে খুব সতর্ক।' নির্বিকার পারভীনের কণ্ঠস্বর।

'সে যাই হোক, আমি একবার যাচ্ছি।'

'আমার আসার দরকার আছে ?'

'আপনি– আপনি বরং দয়া করে আমার পড়ার ঘরে রাখা কাগজ-পত্রগুলো গুছিয়ে রাখবেন। ওখানে অনেক জরুরী কাগজ-পত্র ফেলে এসেছি।'

পলকের মধ্যে আমাদের চোখে চোখে কথা হয়ে গেলো। আমার কথার ইঙ্গিতটুকু সে ভালো করেই বুঝেছে। সাংঘাতিক এ কাজটা করতে গিয়ে ওকে ভালো করেই বুঝেছি—ওর ওপর ভরসা করা যায়। অ্যাপ্রন আর তার মাঝে প্যাঁচানো আলামত-গুলোর ব্যবস্থা সে ঠিক ঠিকই করে ফেলতে পারবে।

মুন্সী এর মধ্যেই একটু এগিয়ে গিয়ে হল পেরিয়ে বাইরের দরজা খুলে ফেলেছে। একরাশ অসহিষ্ণুতা নিয়ে সে বারবার পেছন ফিরে আমাদের দেখছে।

আমি সামনের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে পারভীনকে ফিস ফিস করে বললাম, 'গাড়িটা। ভিজে আছে। ব্যবস্থা করো।'

বাইরের দরজার দিকে দ্রুত হেঁটে গেলাম। আমি কাছে

পৌঁছতেই মুন্সী নিচে নামলো। আমিও ওর পিছু পিছু নামলাম।

'ওহ্, যাচ্ছে তাই রকমের বৃষ্টি দেখছি, এসো তাড়াতাড়ি। গাড়িতে পৌঁছতে মনে হচ্ছে ভিজেই যাবো।'

কোন কথা না বলে আমি ওকে অনুসরণ করলাম।

চার

বৃষ্টি আর বৃষ্টি। অবিরাম ঝরছে বৃষ্টি। তার মধ্যেই অনবরত কাজ করে যাচ্ছে ওরা। একটা গাড়ির মাথায় হু'টো সার্চলাইট বসানো। সার্চলাইটের দৃষ্টি খাদের দিকে। তবু আলোর ছটায় চারদিকটা মোটামুটি আলোকিত। পুলিশ আর দমকল কর্মী মিলিয়ে প্রায় জনা ত্রিশেক লোক অক্লান্ত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তারা একসময়, অতিকষ্টে, শেলীর দেহটা খাদ থেকে তুলে আনলো।

বৃষ্টি-ঝরা এমন রাতে কাজটা যথেষ্ট বিপজ্জনক। কিন্তু দমকল কর্মীদের তৎপরতা, তাদের কাজে একাগ্রতা, সব বিপদ-কেই তুচ্ছ করে দিলো। তিনজন দমকল কর্মীকে চেয়ারে দড়ি বেঁধে একে একে নিচে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। প্রায় হু'শো আড়াইশো ফুট নিচে বিরাট হুটো গাছের গুঁড়ির সাথে আটকে ছিলো গাড়িটা। কিন্তু সেখানে পৌছার প্রতিটা ধাপ অত্যন্ত ভয়াবহ—সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাতছানি। বৃষ্টিতে ভিজে

টিলার গায়ের বড় বড় মাটির চাঁই আলগা হয়ে ধ্বসে পড়ার অপেক্ষায় আছে। এ অবস্থায় ওদের তিনজনের কাজটাকে দুঃসাহসিকই বলতে হবে।

আমি মুন্সীর গাড়ির ষ্টিয়ারিং হুইলে হাতের কনুই দু'টো ঠেকিয়ে ঝিম মেরে বসে আছি। আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট। জ্বলছে, ক্রমাগত জ্বলছে। আর আমার শরীরটা ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ভেতরটা কাঁপছে থরথর করে।

মুন্সী ফজলুর রহমান বসে আছে আমার পাশে নির্বিকার। কোন কথা নেই—একদম চুপচাপ। শুধু একের পর এক সিগারেট টানছে আর বৃষ্টি ভেজা কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখছে—শেলী উদ্ধারে পুলিশ আর দমকল কর্মীদের কর্মব্যস্ততা।

একটু আগেই এসেছে পারভীন। ঠিক আমাদের পেছনেই ওর গাড়িটা। পারভীন সত্যি ভীষণ তৎপর। চতুর। গাড়িটা নিয়ে এর মধ্যে বেরিয়ে আসাতেই এ কথার প্রমাণ মেলে। গাড়িটা এখন কাদা বা ভিজে থাকলেও কিছুই এসে যাবে না। ওটা এখন সন্দেহের একদম বাইরে। অথচ ওটা নিয়েও আমার চিন্তার শেষ ছিলো না।

ওর কাছে যদি এখন যাওয়া যেতো! ওর উষ্ণ সান্নিধ্যে হয়তো কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যেতো। এমনি একটা প্রবল ইচ্ছা আমার মাঝে বারকয়েক ঘুরপাক খেলো। কিন্তু জানতাম, কাজটা নিরেট বোকামী ছাড়া আর কিছুই হবে না। অবশ্য এ সময়ে আমার মাঝে কোন বুদ্ধি কাজ করছে বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমাকে এখন কেউ বেমক্কা ফাঁদে ফেলে দিতে চাইলে

আমি নির্ঘাৎ তাতে পড়ে যাবো।

চুপচাপ বসে খবরটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি, আর ভাবছি নিজের কথা। ভাবছি বাড়ির কথা। ছোট বোনটার বিয়ে হয়ে গেছে। টাকার জোরে ভালই বিয়ে হয়েছে। এর পরের পাঠানো টাকায় বাবা আবার নতুন করে জমি কিনেছে। সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। রিতা জানি এখন কোথায়? অনেকদিন হলো ওর কোন খোঁজ খবর নিই না। রিতা কি ক্লিনিকে গিয়েছিল? আশ্চর্য, শেলী কিন্তু বিয়ের এ ক'মাসের মধ্যে একদিনও সন্তানের কথা কখনো বলেনি। আর কোনদিনই ওকে বলতে হবে না। ভালবাসার কাঙাল শেলী এখন সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কতক্ষণ হলো? তিন ঘণ্টার কিছু বেশি। শেলী আর জানাবে না করুণ মিনতি—আমাকে দয়া করো, রাসেল।

ঘুরে ফিরে ভাবনাগুলো আবার এ ঘটনাতেই ফিরে এলো। পাথরটা তো ফেলেই দিয়েছি। রাস্তার ওপর রক্ত—না থাকার কথা নয়। যা জোর বৃষ্টি। পারভীনের গাড়িটাও সন্দেহের বাইরে। অ্যাপ্রনের ব্যবস্থা নিয়েও ভাববার কিছু নেই। এমনি সব খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আমার চিন্তায় বারবার আসছে। নিজের মনেই সেগুলোর পর্যালোচনা করছি আর মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি—কোন ভুলই আমার হয়নি। কোন প্রমাণই দাঁড় করানো যাবে না আমাকে ধরার জন্যে।

একটা দীর্ঘ অস্পষ্ট ছায়া বৃষ্টির মধ্যে থেকে বের হয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে এলো।

'মিঃ রাসেল, আপনার জন্যে সংবাদ,' কবীর হোসেন গাড়ির গায়ে হাত ঠেকিয়ে ঝুঁকে জানালা দিয়ে আমাকে বললো, 'শেলী মারা গেছেন। ওর দেহটা এইমাত্র খুঁজে পাওয়া গেলো।'

'ওহ্ আল্লাহ্, আমার শেষ পর্যন্ত এ কথাও শুনতে হলো!' কথাটা বলে আমি চোখ বুঁজে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর একরকম জোর করে কবীর হোসেনের কঠিন দৃষ্টির দিকে তাকালাম, 'আমি, আমি কি শেষবারের মতো ওকে একবার দেখতে পারি?'

'না। আগুনে ঝলসে সে-দেহ আর দেখার মতো নেই। লাশটা এখন হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হবে।' আমি স্পষ্ট অনুভব করছি, তার দৃষ্টি আমাকে বিঁধে ফেলেছে। 'আপনি বরং বাড়ি চলে যান, এখানে আপনার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি নিশ্চিন্তে আমার ওপর সবকিছু ছেড়ে দিতে পারেন।'

'তা যে হয় না, কবীর সাহেব?' আমি একটু মনের যন্ত্রণা প্রকাশ করতে চাইলাম।

'আপনি অযথা বিচলিত হবেন না।' কবীর হোসেনের দৃষ্টিটা এখন মুন্সীর ওপর। 'উনি কে, মিঃ রাসেল?'

'ইনি মুন্সী ফজলুর রহমান, আমাদের ব্রোকার। রাত্রে ও-ই আমার সঙ্গে ছিলো।'

কথাটা বলে ফেলেই নিজের জিভ কামড়াতে ইচ্ছে করলো। এ সময়ে এমন ভুলও কি করতে আছে? শুধু ভুলই নয়, মারাত্মকও বটে। নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে বসলে বুঝি এমনটাই হয়। আমি নিজেই যেন নিজের পায়ে কুড়াল মারছি। আমার কাছে কোনকিছু জানতে চাওয়ার আগেই, নিজে থেকে আগ

বাড়িয়ে কোনরকম অজুহাত দেখানো ঠিক নয়। সম্পূর্ণ কাজটা এমন নিখুঁত ভাবে করে এসে নিজেই নিজেকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। এ যেন, ঠাকুর ঘরে কেরে আমি কলা খাই না, অবস্থা আমার।

মাথা ঝাঁকিয়ে কবীর হোসেন পিছিয়ে দাঁড়ালো।

'এখন আসুন, মিঃ রাসেল। কাল সকালে চৌধুরী ভবনে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।'

'ঠিক আছে, আমি আপনার অপেক্ষায় থাকবো।'

কবীর হোসেন দীর্ঘ পা ফেলে খাদের দিকে চলে গেল।

'রাসেল, তুমি বরং এদিকে এসো, আমি নাহয় গাড়ি চালাই?' মুন্সী আমার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো।

'না—আমি ঠিকই পারবো।'

গাড়িটা একটু সামনে বাড়িয়ে ঘুরিয়ে নিলাম। পারভীনের গাড়ির পাশে আসতেই থেমে বললাম, 'এখানে আমাদের কিছুই করার নেই। শেলী বেঁচে নেই। আমি ফিরে যাচ্ছি। আপনিও বরং তাই করুন।'

পারভীন জানালার কাঁচ নামিয়ে কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু মুন্সী তা শুনুক আমার ইচ্ছে ছিল না। তাই তাড়াতাড়ি গাড়িটা ছেড়ে দিলাম। বাকী পথটা দু'জনে চুপচাপ কাটালাম।

মুন্সী আর ভেতরে এলো না। গাড়ি থেকে নেমে লৌকিক কিছু সহানুভূতির কথা বললো, নতুন কাজটা নিয়ে আমাকে এখন মাথা ঘামাতে বারণ করলো—ওটা তার ওপরেই ছেড়ে

দিতে বললো। সময় মতো আবার যোগাযোগ করবে বলে চলে গেল।

আমি সোজা পড়ার ঘরে এসে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লাম। আমি যেন পায়ের ওপর ভর করে চলতে পারছি না। ও দু'টোতে যেন কোন জোর নেই। এদিকে মনের বলও যেন আর অবশিষ্ট নেই। একটা চাপা অস্বস্তি আমার মনটাকে পুরোপুরি দখল করে রেখেছে।

গ্লাসে হুইস্কি ঢালতেও হাতটা ভীষণ কাঁপছে। কাঁপা হাতে যতটুকু ঢালতে পারলাম, ততটুকুই একটানে গিলে ফেললাম।

ঠিক তক্ষুণি পারভীন ঘরে ঢুকলো। দরজা বন্ধ করে দিলো।

'অ্যাপ্রনটা কি করেছো?' সাগ্রহে জানতে চাইলাম।

'আমার ঘরে শুকোচ্ছে। সকালে প্রথম সুযোগেই ওটা গ্যারেজে রেখে আসবো।'

'তোয়ালে দুটো?'

'শুকোচ্ছে।'

'কাদা মাখানো জুতো জোড়া?'

'এ বাড়ির ত্রিসীমানার বাইরে—খুঁজে পাবার সম্ভাবনা নেই।'

টুপি?'

'যথাস্থানে। ওটা ধরার মধ্যে আসবে না।'

'আমি যে এ ঘরে বসে চিঠি ডিক্টেট করছিলাম সে-ব্যাপারে তারা মিয়া আর মুন্সীর বিশ্বাস সম্পর্কে তুমি নিঃসন্দেহ?'

'একদম হাণ্ড্রেড পারসেন্ট। সমস্ত কাজটা এমন সুষ্ঠুভাবে হয়েছে যে, তা আমার বিশ্বাসেই প্রায় ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিল।

আমার মনে হচ্ছিলো তুমি ঘরেই আছো।'

'সত্যি ?'

'তবে আর বলছি কি ?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। টলছি। আমার দেহটা এখন ওর দু'হাতের মাঝে সুখ পেতে চাইছে। সুখের কামনাতেই বুঝি এতক্ষণ আমার দেহ-মন উদ্বেলিত ছিল।

'আমরা এখন মুক্ত পারভীন। তুমি কি মুক্তির সে-সুখ অনুভব করতে পারছো ?'

ওর ভাবলেশহীন মুখে, চশমার আড়ালে চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠলো। 'হ্যাঁ।'

আমি টলতে টলতে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। 'আমি দেরি করতে চাই না, কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা বিয়ে করে ফেলবো।'

'কাছে এসো না, আমার কাছ থেকে দূরে থাকো।'

ওর কথা শুনে আমি থমকে গেলাম। আমার সমস্ত কামনা বাসনা অনুভূতি নিয়ে পাথরের কোন দেয়ালে বুঝি ধাক্কা খেলাম।

'অমন করে বলছ কেন ? এ ঘরে তো আমরা নিরাপদই।'

'শুধু এ ঘরেই নয়, কোথাও আমরা নিরাপদ নই। আহ্, আর এগিয়ো না, সরো। তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি কি একদম ফুরিয়ে গেলো ? কবীর হোসেন যদি একবার বুঝতে পারে যে আমাদের দু'জনের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে, তবে ব্যাপারটা তার কাছে খুব সহজ হয়ে যাবে, কোন সন্দেহ থাকবে না যে

পরিকল্পনাটা আমরাই করেছিলাম।' গলা একটু খাটো করে প্রায় ফিসফিস করে বললো, 'আর সেজন্যেই আমি তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাই, রাসেল। বুঝলে কিছু ? তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে।'

আমার শিরদাঁড়াতে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল।

'তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে, কি বলছো তুমি ? তুমি—তুমি আর ক'দিনের মধ্যেই আমাকে বিয়ে করতে চলেছ, অথচ···?'

'তুমি যদি পৃথিবীর শেষ জীবিত পুরুষও হতে, তাহলেও—এখন আর তোমাকে বিয়ে করতাম না। আমি তোমার হাত থেকে মুক্তি চাই।' ও এমন ভাবে তাকালো যেন ওর চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমাকে জ্বালিয়ে দেবে।

'তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে!'

'সে-প্রতিজ্ঞা আর আমি মনে করতে চাই না। ভয় আমাকে তাড়া করছে। পুলিশ আমাদের সম্পর্ক থেকে বুঝুক কাজটা আমরাই করেছি—তা আমি হতে দিতে চাই না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি এ বাড়ি ছেড়েও চলে যাবো। তোমার সঙ্গে আবার দেখা না হওয়াই আমাদের দুজনের জন্যে মঙ্গলজনক।'

'কিন্তু যতই মঙ্গল চাও, এ থেকে রেহাই তুমি পাবে না।' প্রচণ্ড রাগে আমার শরীর কেঁপে উঠলো। তাড়াতাড়ি ডেস্কের ওপর হাতের ভর রেখে বললাম, 'আমার কথা কি তোমার মনে নেই ? আমি বলেছিলাম, আমাকে যদি বিয়ে না করো, আমি পুলিশের কাছে ধরা দেবো। সেই সঙ্গে তোমাকেও ধরিয়ে দেবো।'

'ধরিয়ে দেবে ? ঠিক আছে, তাই করো দেখি—তুমি এগিয়ে যাও। আমাকে তুমি ধোকা দেবে তেমন বোকা মেয়েটি পাওনি, রাসেল। এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে জড়িত হতে পারি, কিন্তু শেলীকে খুন করেছে কে ? সে-তুমি। আর তাইতো বলছি, এগিয়ে যাও। বুকে যদি এতটা সাহস থাকে তবে গিয়ে বলো ওদের কাজটা তুমিই করেছ। আর সেই সাথে আমিও বলছি, ভালো করে শোন, তুমি খুনী, আমার কাছে তুমি এসো না।'

সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা ঢেউ খেলিয়ে সবেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেল পারভীন।

আর আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার সমস্ত বিশ্বাসে ও যেন এক প্রচণ্ড আঘাত করে গেল। 'ওর কথাগুলো কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ? এমনিতেই আমি ভীষণ ক্লান্ত, তার ওপর ওর কথা শুনে বুকটা লাফাচ্ছে। পা দুটো ভেঙে পড়তে চাইছে—আমি বসে পড়লাম।

আমার মাথায় কোন চিন্তাই এলো না। ব্যাপারটা কি হতে পারে ? হঠাৎ পারভীন অমন বদলে গেলো কেন ? যে মেয়ে সমস্ত পরিকল্পনার মাঝে এমন সততার সাথে সহযোগিতা করে গেছে সেই কিনা এখন উল্টো কথা বলছে ? এ কি নিতান্তই ওর মনের ভয়, না অন্য কিছু ? এই হাওয়া বদলানোর পেছনে অন্য কিছু আছে—যার কিছুই আমি জানি না ?

ঝট করে শাহেদ খানের কথা মনে পড়লো। সে তো এর

মধ্যে এমন কিছু করেনি, যাতে ওর মনটা হঠাৎ বদলে গেল ?

হয়তো এতসব কিছুই নয়। নিতান্তই ধরা পড়ার ভয়ে সে নিজেকে একটু গুটিয়ে রাখতে চাইছে। তাতে এমন কিছু এসে যায় না—একটু সময় দিলেই ও আবার মনের জোর ফিরে পাবে।

এখন ও কয়েকদিন একা থাক। মনের ভয়টা থিতিয়ে যাক। সুযোগ তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না। তখন ওর সাথে আবার কথা বললেই হবে।

মোদ্দা কথা—যে কোন ভাবেই ওকে হারাতে আমি রাজী নই।

কোনমতে শরীরটাকে টেনে টেনে শোবার ঘরে এলাম। দরজা বন্ধ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

সে-রাত্রে আমার ঘুম হয়নি।

আপনাকে বলতে আর বাধা নেই, এ ঘটনার পর কারোই ঘুম হবার কথা নয়। বাতাস আর বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বাতাস—তার মাঝে শেলীর মর্মন্তুদ মরণ চিৎকার—পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে, করুণ সে মৃত্যু—সবই অনবরত ঘুরপাক খেতে থাকলো আমার মাথায়। বিছানায় শুয়েও মনে হয়েছে, আমি যেন বিছানায় নেই—পথের ওপর জমে থাকা রক্ত নিজের হাতে বৃষ্টির পানিতে ধুচ্ছি। খুনের সব চিহ্ন মুছে আমি বাঁচতে চাইছি।

তার ওপর আবার পারভীনের হাত ফসকে সরে যাবার চিন্তাটা—সে-চিন্তা একক ভাবেই আমাকে সারা রাত জাগিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি ক্রমেই উপলব্ধি করছি, আমি

ভীত হয়ে পড়ছি। এ ভয়, জীবন ভর পাওয়া অন্যান্য সব ভয়ের চেয়ে অনেক—অ-নে-ক বেশি।

ক্রমেই আমার মনে হতে থাকলো, পুলিশ এসে এ বাড়ি থেকে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে। ফাঁসীতে ঝোলাবার আগ পর্যন্ত হাজতে আটকে রাখতে পারে। তখন মৃত্যু হবে আমার নিত্য সঙ্গী—শেলীর মতো হাঁটু গেড়ে বসে অপেক্ষা করতে থাকবো মৃত্যুর জন্যে—হে মৃত্যু এসো,—এসো, আমার ভালবাসার মৃত্যু তুমি এসো।

এমন একটা সাংঘাতিক কাজ করতে গিয়ে যদি কোনরকম ভুল করে থাকি, সে-ভুলের পথ ধরে তো ওরা এখুনি আমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে। আর এটাও ঠিক, কোথাও ভুল করেছি কিনা তা আর জানার বা যাচাই করে খুঁজে বের করার কিম্বা শুধরে নেবার আর কোন উপায় আমার নেই।

সে রাতে সত্যি আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। আর ভয় মানুষকে অত্যন্ত দুর্বল করে দেয়। আমার মনের অবস্থা এমন হলো যে, পারভীনের চিন্তা পর্যন্ত একসময় দূর হয়ে গেল আমার মাথা থেকে।

পরদিন সকাল। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমিও উঠেছি। আমার জীবনে এ এক নতুন সূর্য। নতুন সকাল।

পড়ার ঘরে বসেই অপেক্ষা করছি। মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছি একটা কিছু ঘটবে বলে। কবীর হোসেন বলেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তারই অপেক্ষায় আমি বসে থাকতে

থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। অথচ তার আসার কোন লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি না। এগারটা বাজলো। মনে হলো, সে হয়তো আর আসবে না। একাকী আর বাড়িতে বসে থেকে কি হবে, অফিসে চলে যাই।

যদিও এই বিরাট বাড়িটাতে কোন সময়ই তেমন কোন হৈ-চৈ থাকতো না, তবুও আজ সকাল থেকেই সমস্ত বাড়িটাকে অস্বাভাবিক রকম শান্ত মনে হচ্ছে। ডাইনিং হলে নাস্তার সময় এক পলকের জন্যে তারা মিয়াকে দেখেছিলাম। দেখে মনে হয়েছিল, এক রাতেই সে যেন অনেক বুড়িয়ে গেছে—মুখটাও শুকনো। আমার দিকে তাকানোর কোন প্রয়োজনই সে বোধ করেনি, আমিও ডেকে কোন কথা বলিনি।

দু'জন চাকরানী আমাকে খাবার দিচ্ছিলো। মনে হলো সারা রাত ভর ওরা কেঁদেছে। চোখগুলো তাদের লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।

শেলীর মৃত্যুর জন্যে দুঃখ যে কতো স্বাভাবিক, তা শুধুমাত্র তাদের দিকে তাকালেই ধারণা করা যায়।

অফিসে রওনা হবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। চেয়ার টেনে আবার বসে ফোন তুললাম।

'হ্যালো, কে— ?'

'রাসেল ?' মুন্সীর ভরাট গলা। 'রাসেল, তোমাকে ফোন করা উচিত বলেই মনে হলো। ডিটেকটিভ কবীর হোসেন আমার অফিসে, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। সে

অনেক কথা, নানা রকমের প্রশ্ন ওর। সকালে তোমার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিলো, দেখা হয়নি এখনও?'

'না।' আমার সমস্ত শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে উঠলো। 'কি ধরনের প্রশ্ন করলো, মুন্নী?'

'আরে সে আর বলো না, যত্তোসব আজে বাজে প্রশ্ন। এতসব প্রশ্ন আর বলার ধরন দেখে মনে হচ্ছিল, সে পুরোপুরি সন্দেহ করছে যে, তোমার স্ত্রীর মৃত্যুতে তোমার হাত রয়েছে।'

আমি যেন মুহূর্তে কাঠ হয়ে গেলাম। কিছু বলতে গিয়ে হয়তো হাঁ করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না। মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। গলা শুকিয়ে গেছে—গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না।

নিজেকে সংবরণ করে নিলাম। জোরে ফোনটা ধরে রাখায় আঙ্গুলগুলো রক্তশূন্য সাদা হয়ে উঠলো।

'মুন্নী, তুমি যেন কি বলছিলে? আরেকবার বলো—আমি ঠিক শুনতে পাইনি।'

'বলছিলাম, কবীর হোসেনের কথা শুনে মনে হলো, সে তোমাকে সন্দেহ করছে। তোমার স্ত্রীর মৃত্যুর পেছনে তোমার হাত আছে। আমি তাকে বলেছি...'

'কি বলেছ?'

'বলেছি সে পাগল।'

'আর কি ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো?'

'সে শুধু একই কথা বারবার ঘুরে ফিরে জানতে চাইছিলো। রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে তুমি বাইরে গিয়েছিলে কিনা।

আমি তাকে বারবারই বলেছি, ঐ সময়টা আমরা দু'জনে একসঙ্গে ঘরে বসে কাজকর্ম করছিলাম। তবু সে একই প্রশ্নের ভেতর আবার যাচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত আমি বিরক্ত হয়ে জানতে চাইলাম, এ দিয়ে সে কি বলতে চাইছে—সে কি বললো জানো? সে বললো, কোন স্ত্রী যখন সন্দেহজনক ভাবে মারা যায়, তখন স্বভাবতঃ স্বামীই প্রথম সন্দেহভাজন হয়।'

'যত্তোসব রাবিশ! এ নিয়ে তোমাকে এত উত্যক্ত করার কোন মানে হয়!' আমার গলা যেন না কাঁপে সেজন্যে খুব সাবধানে কথা বলছি। মুন্সী এ সময়ে আমার মুখটা দেখতে পাচ্ছে না তাই রক্ষে। আমি বুঝতে পারছি, ওর কাছ থেকে টেলিফোন পাওয়ার পর আমার মুখের অবস্থা যা হয়েছে, সেটাই আমাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। 'শেলী রহস্যজনক ভাবে মারা যায়নি। গাড়ি দুর্ঘটনায় খাদে পড়ে মারা গেছে।'

'সে কথা আমিও তাকে বলেছি। তাকে এও বলেছি, তুমি ঐ সময়ে পড়ার ঘরে বসে কতকগুলো চিঠি ডিক্টেট করছিলে। আমার কথায় যদি তার বিশ্বাস না হয়, তবে সে মিস পারভীন বা তারা মিয়াকে এ কথা জিজ্ঞেস করে নিতে পারে—এ কথাও তাকে বলে দিয়েছি।...শোন, একটা কথা তোমাকে বলে রাখা ভালো। আমার যা মনে হয়, কবীর হোসেন তোমাকে পছন্দ করে না।'

'শেলীদের পরিবারের সাথে ওর দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা ছিলো। স্বভাবতঃই এ মৃত্যু ওর জন্যে বেদনাদায়ক।'

'তা হয়তো ঠিক। তবে কথাটা তোমাকে জানানো উচিত

বলেই বলছি, মনে হচ্ছে, সে খুব কাজ দেখাতে চাইছে। তাকে আমি বলেছি, মিসেস শেলী খুব জোরে, ঐ পথে অস্বাভাবিক ভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁর গাড়ি আমি অতিক্রম করে আসার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে নিশ্চয়। আর জানো, রাসেল, এ কথাটা মনে হতেই আমার খারাপ লাগছে। আমি যদি তখন···'

'তোমার কিছুই করার ছিলো না, মুন্সী, এ সবই ভবিতব্য। এ নিয়ে অহেতুক তুমি মন খারাপ করো না। সে যাকগে, ফোন করার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। এ নিয়ে চিন্তা করে আর কোন লাভ নেই। তুমি, আমি—আমরা দু'জনেই জানি, শেলীর মৃত্যুর ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই। এমনও হতে পারে, তোমার সঙ্গে কথা বলার পর, কবীর হোসেন হয়তো ওর ধারণাটা বদলে নেবে।'

'আমিও তেমনটাই আশা করছি। আরেকটা কথা তোমাকে আমি বলে রাখতে চাই, তোমার যে কোন প্রয়োজনে যে কোন সময় আমাকে তোমার পাশেই পাবে—এ বিশ্বাস আমার ওপর তুমি নিশ্চিন্ত মনে রাখতে পারো।'

ওকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিলাম। হঠাৎ মনে হলো, আমার কোন কিছুই করার নেই। তাই জানালার কাছে গিয়ে নিচের বাগানটা দেখতে থাকলাম।

কিছু একটা ঘটবে বলে সেই সকাল থেকে আমি বাড়িতে বসে আছি—আর এখন শুনলাম, এর মধ্যেই বেশ কিছু ঘটে গেছে। তাহলে···দেখা যাচ্ছে, শেলীর মৃত্যুর ব্যাপারে যে

আমার হাত থাকতে পারে—কবীর হোসেন এর মধ্যেই এটা ভেবে নিয়েছে। বেশ ঝানু লোক বলতেই হবে। আমি কেন যে ওকে প্রথম থেকে খুব একটা গুরুত্ব দিইনি, বুঝতে পারছি না। আর সে-কথাটা ভেবে কেন অস্বস্তি বোধও করছি এখন।

ঠিক আছে, কবীর হোসেন সন্দেহ করেছে করুক। কিন্তু এ সন্দেহ নিয়ে খুব সহজে সে এগোতে পারবে না। কিছুটা নাড়াচাড়া করলেই সে দেখতে পাবে তার সামনে একটা শক্ত দেয়াল গজিয়ে উঠেছে। এ দেয়াল অতিক্রম করে আমার কাছে পৌঁছা তার পক্ষে অসম্ভব। বেশি কিছু নয়, তারা মিয়া আর পারভীনের সাথে আলাপ করলেই সে বুঝতে পারবে, আমার গায়ে আঁচড় কাটা সম্ভব নয়।

বারোটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী। বাগান থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘরের ভেতর চলে আসার আগে একবার বাইরের দিকে তাকালাম। দেখলাম বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। ভেতর থেকে নামছে একজন পুলিশ অফিসার।

তুমুল আলোড়ন হলো বুকের ভেতর। ধড়াস্ ধড়াস্ করে লাফাতে শুরু করল হৃৎপিণ্ড।

পুলিশের স্বনামধন্য গোয়েন্দা কবীর হোসেন এসে গেছেন।

আমি আমার ডেস্কে ফিরে এসে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

টের পেলাম, ধীরে ধীরে নিজের ওপর আস্থা ফিরে পাচ্ছি। এ এক জীবন মরণ সমস্যা। নিজেকে যদি শক্ত রাখতে না পারি, মনকে যথাযথ সংযত রাখতে না পারি—তবে নির্ঘাৎ ডুবে

যাবো। আমার ডুবে যাওয়া কেউ তখন রোধ করতে পারবে না। নিজেকে চাঙ্গা রাখতে গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে গিলে ফেললাম। তারপর হাতের কাছে কিছু কাগজ পত্র টেনে নিলাম।

কাজে মন দিতে চেষ্টা করছি বটে, কিন্তু বৃথাই সে-চেষ্টা। কাগজের ওপর আমার দু'চোখ শুধু ঘুরে ফিরে টাইপ করা অক্ষর-গুলোই দেখছে, কিন্তু সবই যেন অর্থহীন। অসংলগ্ন এলোমেলো শব্দরাজি। বসে বসে কাগজের দিকে তাকিয়ে কবীর হোসেনের আসার অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পর সে এলো, দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকলো ঘরে।

'আসুন, কবীর সাহেব,' আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানালাম, 'একদম ভেতরে চলে আসুন। বসুন। একটু হুইস্কি চলবে নাকি?' আমার গলার অমন অবিচল স্বর শুনে আমি নিজেই অবাক হলাম।

কবীর হোসেন তার কঠিন সন্ধানী দৃষ্টি আমার ওপর মেলে ধরে একটা চেয়ার টেনে বসলো। বসার সঙ্গে সঙ্গে তার ঐ বিশাল বপুর ভারে চেয়ারটা ক্যাঁচ করে শব্দ করে উঠলো। আমাকে হুইস্কির বোতলটার দিকে হাত বাড়াতে দেখে বললো, 'না, ধন্যবাদ।'

আমি সৌজন্যমূলক হেসে সিগারেটের প্যাকেটটা তার সামনে ঠেলে দিলাম। তার তীক্ষ্ণ চোখ দুটো যে আমাকে নানা-ভাবে তখনও পরীক্ষা করে চলেছে—সে-বিষয় আমি সচেতন। ওর অমন খুঁটিয়ে দেখার নমুনাটা চিন্তা করতেই আমার মাথা

হঠাৎ গরম হয়ে উঠলো।

কবীর হোসেন যতই জঁাদরেল গোয়েন্দা হোক না কেন আমর তাকে ভয় করার কি আছে? আমি এখন কোটি কোটি টাকার মালিক। এ সবই তো একমাত্র বুদ্ধির জোরে। সুতরাং বুদ্ধি আমার চেয়ে ওর বেশি আছে এমনটা মনে করার কোন কারণ আছে কি?

গোয়েন্দা প্রবর সিগারেট ধরালো। আমিও একটা ধরালাম।

'দুর্ঘটনাটা কেমন করে ঘটলো তার কিছু ধরতে পারলেন নাকি, কবীর সাহেব?' তাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে আমি নিজেই কথা শুরু করলাম।

'সামনের ডান দিকের চাকা ফেটে গিয়েছিল।' খুব ধীরে শান্ত গলায় উত্তর দিলো কবীর হোসেন।

'ও —!'

আমার মুখ থেকে হঠাৎ অমন একটা জয়ের আনন্দসূচক শব্দ বেরিয়ে আসবে বুঝিনি। চেহারাতেও আনন্দের ছটা খেলে গেল বুঝতে পেরে নিচের দিকে তাকিয়ে সে-ভাবটা লুকোতে চেষ্টা করলাম।

'আমার ধারণা, গত রাতে আপনি ন'টা থেকে দশটার মধ্যে এ ঘরেই ছিলেন,···তাই না, মিঃ রাসেল?'

আমি বুঝলাম, সে এখন তার জাল বিস্তার করবে। আঁট-ঘাট বাঁধবে শিকার ডাঙায় তোলার জন্যে।

আমি নিজের মনকে শক্ত করে নিলাম। সোজা হয়ে বসে সরাসরি ওর দিকে তাকালাম।

'হ্যাঁ, ছিলাম। কিন্তু কেন বলুন তো? আমি সে-সময়ে কয়েকটা চিঠি ডিক্টেট করছিলাম। তারপর মিসেস জোয়ারদার যখন ফোন করলেন—তখন পর্যন্ত আমি আর আমার দালাল, দুজনে বসে বসে কাজ করছিলাম।'

'ডিক্টেশন কি টেপরেকর্ডারে টেপ করছিলেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু দুর্ঘটনার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক, কবীর সাহেব? আপনার কথা যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

– 'এটা—এটা দুর্ঘটনা নয়,' কবীর হোসেন তার শ্যেন দৃষ্টি আমার মুখের ওপর স্থির করে রাখলো।

আমার বুকটা ধড়াস করে লাফিয়ে উঠেই ভীষণ তোলপাড় শুরু করে দিলো।

'দুর্ঘটনা নয়? কিন্তু—নিশ্চয়ই···'

কবীর হোসেন সামনের দিকে ঝুঁকে এসে আমার মুখের রেখাগুলো যেন ভালো করে দেখলো।

'এটা খুন, মিঃ রাসেল।'

পাঁচ

চারদিক থেকে সীমাহীন স্তব্ধতা এসে যেন আমাকে ঘিরে ফেললো। তার মাঝে শুধু টেবিল ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দ তুলে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে চলেছে।

কিন্তু আমার অস্তিত্ব যেন এখন এক ফাঁদে পড়া ভীত সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মতো। শুধুই এদিক ওদিক ছুটোছুটি। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সে কি করে সিদ্ধান্তে আসতে পারলো! নাকি সে আমাকে একটু বাজিয়ে নিতে চাইছে? নাহ্, তাও মনে হয় না। তবে কি আমি কোন মারাত্মক সূত্র পেছনে ফেলে এসেছি? ও কি জানতে পেরেছে, কাজটা আমিই করেছি? নাকি, শুধুই ধারণা মাত্র? কাজ করতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় কোন মারাত্মক ভুল করে বসিনি তো? কিছুই যে বুঝতে পারছি না। কবীর হোসেন কি আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে?

সম্ভাব্য সব প্রশ্নগুলোর ভেতর সবটা দ্রুত ছুটোছুটি করলো। তা করতে গিয়ে অনেক কষ্টে মুখের ভাব ঠিক রাখলাম। তাছাড়া বেশি সময় আর চুপ করেও থাকা যায় না। বিশ্বাসযোগ্য

একটা কিছু আমাকে যে বলতেই হয়, আর তা-এ মুহূর্তেই।

'খুন? কি বলছেন আপনি?'

'হ্যাঁ খুন—তাকে খুনই করা হয়েছে।'

'খুন, সেটা কি ভাবে বুঝলেন?'

'আমি সে-কথাতেই আসতে চাইছি। আপনার এই অ্যালিবাইটা সম্পর্কে আপনার সঙ্গেই কিছুটা আলোচনা করতে চাই।"

'অ্যালিবাই? মানে শেলীর মৃত্যুর ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিলো—তেমন কিছু ভাবছেন নাকি?'

সিগারেটটা ছাইদানীর ভেতর গুঁজে দিয়ে আমার দিকে তাকালো, তারপর স্বভাবসুলভ ধীর শান্ত কণ্ঠে বললো কবীর হোসেন, 'যখন কোন স্ত্রী খুন হয়, স্বাভাবিকভাবে তখন তার স্বামীই প্রথম সন্দেহভাজন ব্যক্তি হয়।'

'এটা সত্যি হাস্যকর! এটা যে খুন তা আপনি কি করে বুঝলেন?'

'আপনার সেই টেপটা আছে এখানে?'

'কোন্ টেপ? কিসের কথা বলছেন আপনি?'

'কাল রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে—আপনি চিঠি টেপ করছিলেন। রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে মিসেস শেলী খুন হয়েছেন। সুতরাং, নিশ্চিন্তে বলা যায় ঐ টেপটাই আপনার অ্যালিবাই। ঠিক তাই না, মিঃ রাসেল? ওটা আমার চাই।'

'আমি দুঃখিত, মিঃ কবীর হোসেন। ব্যবসা সংক্রান্ত এক-গাদা চিঠি রয়েছে ওতে। সেগুলো টাইপ না হওয়া পর্যন্ত

সেটা কিছুতেই দেয়া যাবে না।'

'একটা কপি করে নিয়েই আমি আপনাকে ওটা ফেরত দেবো। কোথায় সেটা ?'

আমি ইতস্ততঃ করলাম।

'আপনার আচরণ আমার কাছে খুবই অদ্ভুত ঠেকছে। সেটা কি আপনার একান্তই দরকার ? দরকার যদি থাকে···মনে হয়, তবে সেটা আপনার নিয়ে যাওয়াই ভালো। টেপটা মেশিনেই রয়েছে এখনও।

চেয়ার থেকে উঠে টেপরেকর্ডারের দিকে এগিয়ে গেল কবীর হোসেন। ওপরের ঢাকনাটা খুলে রেকর্ডারের ভেতরটা ভালো করে নজর দিয়ে দেখলো। তারপর টেপ ভর্তি চাকতিটা তুলে নিলো। ওটা ডান দিকে ছিলো, অর্থাৎ রি-ওয়াইণ্ড করা হয়নি।

'টেপের একদম শেষে আপনার সইটা আঁচড় কেটে দিতে আপনার কোন আপত্তি নেই তো ?··· হ্যাঁ, এখানে হলেই চলবে।'

ম্যাগনেটিক টেপের শেষে জোড়া লাগানো সাদা সরু ফিতেটার গায় বল পয়েন্ট দিয়ে সই করে দিলাম।

চাকতিটা হাতের কাছে রেখে সে আবার বসলো।

'আমার মনে হয়, তারা মিয়ার সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা খুব একটা ভালো নয়। তা কি সত্যি, মিঃ রাসেল ?'

'সে আমাকে তেমন পছন্দ করে না ঠিক, তবে তাকে আমারও কোন প্রয়োজন হয় না। কেন, তাতে আবার কি হবে ?'

'তার কাছ থেকে জানা গেলো, একবার ন'টা দশে এবং

আরেকবার ন'টা কুড়ির সময় সে আপনাকে এ ঘরে দেখেছে।'

'তা দেখতে পারে বৈকি। একবার সে কফি নিয়ে এসেছিলো। আরেকবার এসে খবর দিয়েছিলো, মুন্সী ফজলুর রহমান এসেছেন। কিন্তু আমি জানতে পারি কি, এসবের মানেটা ?'

'এসবের মানে ?' কবীর হোসেনের চোখ দুটো বিদ্যুৎ চমকানোর মতো ঝিলিক দিয়ে উঠলো। 'এর মানে, আমিও যেমন জানি, আপনিও তেমনি জানেন। এটা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না নিশ্চয়ই। আপনি আপনার স্ত্রীকে খুন করে-ছেন···আমি শুধু জানতে চাই, কাজটা আপনি কি করে করলেন।'

আমার হৃদয়ের স্পন্দন বুঝি হঠাৎ করেই থেমে গেলো। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো। নিষ্পলক তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। আমার মুখ থেকে সবটুকু রক্ত যেন সরে যাচ্ছে। আর সে-সাথে আতঙ্কের ভয়াল ঠাণ্ডা নখগুলো ধীরে ধীরে আমার টুঁটি চেপে ধরতে এগিয়ে আসছে।

'এ আপনার নিছক কল্পনা, আমি ওকে খুন করিনি।' আমার কথাগুলো আবার আমারই কানে ফিরে এলে তা অত্যন্ত দুর্বল মনে হলো।

'হ্যাঁ, তুমিই করেছ। আর এই কথার ওপর আমি আমার জীবনটাও বাজী ধরতে পারি। শেলীর সঙ্গে আমি তোমাকে যে মুহূর্তেই দেখেছি, তখন থেকেই ভেবেছি, শেলী যে কোন সময়ে বিপদে পড়তে পারে। আমার এ ভাবনা নিছক ধারণা

ছিল না। কারণ আমি তোমার সম্পর্কে সবকিছুই জানি, রাসেল। মেয়েদের ব্যাপারে শহরে তোমার যথেষ্ট সুনাম আছে তাও আমার অজানা নয়। শেলীর যদি অগাধ টাকা না থাকতো, তবে তুমি তাকে বিয়ে করতে না। তার কাছ থেকে যা চেয়েছিলে তা পাওনি বলেই তুমি তাকে খুন করেছ। কিন্তু আমি শুধু জানতে চাইছি, কাজটা তুমি কি ভাবে করলে ?'

কবীর হোসেনের কথায় আমি নিজের ওপর আস্থা ফিরে পেলাম। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, সে আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছে। আমি যা করেছি তার কিছুই প্রমাণ সে করতে পারবে না। আমাকে এখন শুধু মনের জোর বজায় রেখে কবীর হোসেনকে মোকাবেলা করে যেতে হবে। আর কথার ফাঁকে ফোকরে ওর ধাপ্পাগুলো একে একে ধরে ফেলতে পারলেই আমি আমার দুশ্চিন্তাগুলো দূর করে ফেলতে পারবো।

'বেশ আপনি যদি এতই নিশ্চিত, আমিই শেলীকে খুন করেছি, তবে এগিয়ে যান। প্রমাণ পত্র দাঁড় করান।' সামনে ঝুঁকে তার দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ হেসে বললাম, '...তারপর না হয় আমাকে গ্রেপ্তার করবেন।'

ও তার বিরাট বপুটা চেয়ারের পিঠে এলিয়ে দিয়ে শরীর টান টান করে তন্দ্রালু হাই তুললো। গত রাতের ধকলটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি বলে মনে হলো।

'রাসেল, তুমি বেশ বুদ্ধিমান, সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রেখো, সবদিক সামাল দেবার মত যথেষ্ট বুদ্ধি তোমার নেই। তুমি যে শেলীকে খুন করেছ তাতে আমার কোন সন্দেহ

নেই। আমার চোখকে ফাঁকি দেয়া তোমার পক্ষে খুব সহজ নয়। কিন্তু ঐ একটিই প্রশ্ন আমার কাছে থেকে যাচ্ছে, একই সময়ে দু'জায়গায় তুমি থাকলে কি করে? এ চিন্তাটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলছে খুব। অপ্রাসঙ্গিক হলেও, রাসেল, তোমাকে কয়েকটা কথা জানিয়ে রাখি। আমি শেলীদের পারিবারিক বন্ধু। সে-সূত্রে আমি অনেক দিন ধরেই ওকে চিনি। শুধু চিনি বললেই ভুল হবে, ভালো করেই চিনি। শেলীর এমন অনেক অনেক দোষ ছিলো যা কোন কোন সময় সহ্য করা অসম্ভব হতো। কিন্তু তবু ওকে আমার ভালো লাগতো। নিঃসঙ্গ শেলীকে আমি ভালোবাসতাম। আর তার জন্যেই ওর মৃত্যু আমার জন্যে বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাই মনে করতো, একগাদা টাকা নিয়ে সে খুব মজায় ছিলো—কিন্তু তা সে ছিলো না। সবকিছু দেখাশোনার দায়িত্বে অন্য কাউকে রেখে সে দূরে সরে থাকতো। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, আমি ওকে বন্ধুর মতো ভাবতাম। আমার কোন বন্ধুকে কেউ খুন করতে পারে না। আর পারলেও সে আমার কাছ থেকে রেহাই পেতে পারে না। তুমি অনেক বুদ্ধিমান হতে পারো, রাসেল। কিন্তু আমিও তোমাকে অচিরেই পেরেকে গাঁথতে চলেছি—এ বিষয়ে আমার ওপর তুমি পুরো আস্থা রাখতে পারো।'

'তুমি পাগল। যা তা বললেই হলো?' ডেস্কের ওপর একটা ঘুষি বসালাম। 'সারাটা সন্ধ্যা আমি এই ঘরে বসে কাজ করেছি। তারা মিয়া বা মুন্সী ফজলুর রহমানকে জিজ্ঞেস

করে দেখতে পারো—ওরা আমাকে দেখেছে।" নিজেকে যথেষ্ট সংযত রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ঘটনাটা তুমি তোমার ইচ্ছে মতো আমার দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারো না, মিঃ ডিটেকটিভ। অবশ্য···এটা তুমিও জানো।'

'অযথা চিৎকার করে কোন লাভ হবে না, রাসেল। ওতে আমাকে টলাতে পারবে না। কারণ ইতিমধ্যেই তুমি একটা ভুল করে বসে আছো। আমি নিশ্চিত আরো একটা কারণে। তোমার মতো ধূর্ত শয়তানরা সব সময়েই ভুল করে থাকে। আমাদের নিয়ম হচ্ছে, প্রয়োজনে অপেক্ষা করে থাকা। শয়তান-দের কৃত কর্মের কোটর থেকেই বেরিয়ে আসবে ভুলের রেশটুকু। আমি অপেক্ষা করছি সে-ভুলটুকু ধরার জন্যে, ধৈর্য ধরে আমি তা করবোও। আর ঠিক এ মুহূর্তে তুমি বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে বসে আছো। হ্যাঁ, আমি অকপটে স্বীকার করছি—আপাত ঢালাই লোহার মতো শক্ত অজুহাত তোমার রয়েছে। কিন্তু আমিও জানি, তুমিই ওকে খুন করেছ। শুধু একই সময়ে দু'টো জায়গায় থাকার ব্যবস্থা তুমি কেমন করে করেছিলে তাই কেবল আমাকে জানতে হবে। ব্যাপারটা জেনেছি সে-ভান আমি করতে চাই না, তবে যখন তা খুঁজে বের করবো, আমি তা বের করবোই, তখন তোমার আর কিছুই বলার থাকবে না।'

মনে সাহস সঞ্চয় করে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম। ওকে আমার ভয় পাবার কি আছে? কবীর হোসেন তো নিজেই স্বীকার করেছে, ওকে আমি হারিয়ে দিয়েছি। ও তো

ধরেই নিয়েছে, আমিই শেলীকে খুন করেছি, কিন্তু যতক্ষণ না ও এটা প্রমাণ করতে পারছে, এতক্ষণ আমার ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।

নিজেকে সহজ করতে সচেষ্ট হলাম। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের থেকে তোমার মনে হলো আমি ওকে খুন করেছি?'

'সে-কথা শুনতে চাও? বলছি। তোমার মূল পরিকল্পনা-টার মধ্যে বেশ চালাকী ছিল—তুমি চেয়েছিলে খুনটা যেন সবাই দুর্ঘটনা বলেই ধরে নেয়। পরিকল্পনাটা ছিলো: তোমার স্ত্রী যখন চৌধুরী ভিলা থেকে বের হয়ে পাহাড়ী পথ ধরে নিচের ঐ টিলার বাঁকগুলোর কাছ দিয়ে নামবে, ডান দিকের চাকা ফেটে গিয়ে তখন গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদের দিকে চলে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটবে। তুমি সময় মতো গ্যারেজে ছিলে এবং শেলী আসা মাত্র মাথায় আঘাত করেছ। গাড়িতে তুলে সেই বিপজ্জনক বাঁক পর্যন্ত নিয়ে গেছ। গাড়ির পেছনের খোলে আগে থেকেই ফাটা টায়ার রেখে দিয়েছিলে। ভাল চাকার সাথে সে-ফাটা চাকাটা বদলিয়ে গাড়ি খাদের দিকে চালিয়ে দিয়েছ। এ ভাবেই পুরো কাজটা তুমি করেছ, তাই না, রাসেল?'

কবীর হোসেনের কথা শুনতে শুনতে আমি নিজেকে মনে মনে আরও চাঙ্গা করে তুললাম। এ পর্যায়ে আমার সামান্য ভুলের জন্যেও আমি শেষ হয়ে যেতে পারি—সেকথা আমার অজানা নয়। ওর দিকে তাকানোর প্রখরতা একটুও না

কমিয়ে বললাম, 'তোমার সাজানো গল্পটা এবার প্রমাণ করো দেখি ? আমি তো সারা সন্ধ্যে এ ঘরেই ছিলাম।'

'তা যেখানেই থাকো না কেন, খুনের প্রমাণ আমি ঠিক বের করে ফেলবো। একটা বিশ্রী রকমের ভুল করে ফেলেছো, রাসেল। ফাটা টায়ারটার টিউবে অনেকখানি বালি লেগে ছিলো। গাড়িটা পুড়ে একদম ছাই হয়ে গেলে অবশ্য এর থেকে তুমি রেহাই পেতে পারতে। কিন্তু বৃষ্টির প্রচণ্ড ঝাপটায় গাড়িটাতে তেমন বেশি আগুন ছড়াতে পারেনি। গাড়ি যেখানে খাদে পড়ে গিয়ে আটকে ছিলো সেখানে তো বালিই নেই। রাস্তাতেও কোন বালি নেই। এখন প্রশ্ন হলো, বালি এলো কোথা থেকে। আমি নিশ্চিত যে, টায়ারটা কয়েকদিন আগেই ফেটেছিল, সম্ভবতঃ সাগরের বেলাভূমিতে কোথাও। চাকাটা পাল্টে পেছনের খোলে রেখে দিয়েছিল, তখন অবশ্য লক্ষ্য করার কথাও নয় যে ভেতরের টিউবে বালি ঢুকে গেছে। তাছাড়া তদন্ত করতে গিয়ে ধরা পড়েছে যে ঐ চাকাটায় একটা নাট নেই। চারদিকে খুঁজে ওটা বের করেছি। রাস্তার ওপরেই ছিল ওটা। আর এটাই প্রমাণ করে যে খাদের মুখে গাড়িটা পাঠাবার আগে তুমি গাড়ির চাকা পাল্টেছিলে। কেমন লাগছে···ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে না ?'

নিঃশব্দে বসে ওকে দেখছিলাম। ভয়ে ভেতরে ভেতরে আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি। কিন্তু সেটা ওকে বুঝতে দিলাম না।

'কিন্তু কাজটা আমি করেছি তা প্রমাণ করো।'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে একা তুমি এ কাজ করতে

পারো না।' ডেস্কের ওপর ঝুঁকে টেপরেকর্ডটা নেড়েচেড়ে আবার বললো, 'এটা দিয়েই কোন চালাকী করেছ আমার বিশ্বাস। সেটা আমি খুঁজে বের করবো। কিন্তু কাজটা একা কিছুতেই সম্ভব নয়। মিস পারভীন কি তোমাকে সাহায্য করেছে? আমি বুঝতে পারছি না, এর পেছনে সেও সক্রিয় কোন ভূমিকা পালন করেছে কিনা। রাসেল, তুমি যদি একটু মুখ খোলো তবে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যায়। সত্যি বলতো, সে-ই কি তোমার স্ত্রীকে খুন করার জন্যে তোমাকে প্রলুব্ধ করেছে?'

ভেতরে ভেতরে আমি ঘেমে উঠলাম।

'সে কেন করবে? তোমার মাথাটা একেবারে গোলমাল হয়ে গেছে দেখছি। আমি তো বারবারই বলছি, এ ব্যাপারে আমার বা মিস পারভীনের কারোরই কোন হাত নেই।'

'সে কেন করবে?' আমার কথার পুনরুক্তি করলো কবীর হোসেন। দাঁতে দাঁত চেপে হাসতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত পারলোনা। দাঁতগুলো আমাকে দেখিয়েই দিলো। 'রাসেল, আমার মনে হয়, তুমি তোমার স্ত্রীর উইলটা এখনও দেখোনি।

কথাটা আমার নিস্তেজ শরীরে বেশ সাড়া জাগালো।

'তা অবশ্য আমি দেখিনি। কিন্তু তোমার কথানুযায়ী, উইলেরও এ ক্ষেত্রে কিছু করার আছে নাকি?'

'নিশ্চয়ই, উইলেরও খুনের ব্যাপারে একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ উইল থেকে স্পষ্টতঃ মিস পারভীন যথেষ্ট লাভবান হবেন।'

'তা তিনি হতে পারেন। তবে শেলী একসময় আমাকে বলেছিলো, মিস পারভীনের জন্যে সে উইলে পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখেছে। এ অঙ্কটা তার কাছে খুব লোভনীয় হলেও একটা খুন করার পক্ষে যথেষ্ট কি? তা সে যে নয়, তা আমিও যেমন বুঝি, তুমিও নিশ্চয় জানো।'

'মাত্র পঞ্চাশ হাজার? কে বলেছে তোমাকে?'

কবীর হোসেনের পুলিশি চোখ আমাকে ভালো করে আবার অবলোকন করলো। নতুন এক সন্ধানী দৃষ্টি মেলে আমাকে পরখ করতে থাকলো। ওর এই দৃষ্টির মাঝে নিজেকে অসহায়ের মত ছেড়ে দিয়ে শুনলাম, ও বলছে, 'তোমার স্ত্রী মিসেস শেলী তাঁর প্রিয় সেক্রেটারীর জন্যে প্রায় সব টাকা, সম্পত্তি, আর এই বাড়িটা রেখে গেছেন। সত্যি বলতে কি, তুমি এক্ষেত্রে বিশেষ কোন চালাকীর পরিচয় দাওনি, রাসেল। একটা খুন করে তুমি পেলে মাত্র একটা ফ্ল্যাট বাড়ি। হ্যাঁ শুধু মাত্র একটা ফ্ল্যাট বাড়িই উপহার স্বরূপ তোমার জন্যে উইলে তোমার স্ত্রী রেখে গেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, আমার ভাবতেও অবাক লাগছে, তুমি কি এ কথাটা একদম জানতে না?'

আমার শরীরের প্রতিটা শিরা উপশিরায় যেন ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যেতে থাকলো। সমস্ত শরীরের রক্ত জমে আমি ক্রমশঃ হিম শীতল ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে যেতে শুরু করেছি। কবীর হোসেন যে কথা বলছে তা যদি সত্যি হয়? মাত্র একটি ফ্ল্যাট আমার জন্যে? বাকী সবকিছু পেয়ে মজা লুটবে পারভীন? তাই কি বুড়ো হওয়ার আগে সবকিছু পাবার লোভে ওর মন

আকুলি বিকুলি করতো ?

আচ্ছা, কথাটা কবীর হোসেনের একটা ধাপ্পা নয়তো ? সে লোভাতুর ঐ দুর্বল জায়গাটাতে ঘা দিয়ে আমাকে বাজিয়ে নিতে চাইছে, পারভীন এ ক্ষেত্রে কতটুকু জড়িত ? সে তো ধরেই নিয়েছে, কাজটা আমি একা করিনি। তাই পারভীনকে সুকৌশলে সে জড়াতে চাইছে, পথ খুঁজছে আসল ঘটনার ভেতর ঢুকে যেতে। একেই হয়তো বলে পুলিশের প্যাঁচ।

'তুমি মিথ্যে বলছো আমাকে।' একটা প্রচণ্ড আক্রোশে আমার ডান হাতটা আপনা থেকেই মুঠো হয়ে গেল।

আর কবীর হোসেন আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে হাসলো। সে-হাসিতে যেন একরাশ করুণা।

'তোমার অনেক আশার স্বপ্ন সৌধ, আহা—ভীষণ একটা ঘা পড়লো। সে-সৌধ এখন তোমার চোখের সামনেই ভেঙে খান খান হয়ে যাবে—বেচারা রাসেল, তোমার জন্যে আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছে,' কবীর হোসেন থেমে মুখে একটা অনুশোচনা জাতীয় বিচিত্র শব্দ করলো। তারপর আবার আপন গাম্ভীর্যে ফিরে গিয়ে বললেন, 'শোন, তোমার স্ত্রী শেষ যে উইলটা করে রেখে গেছেন, অর্থাৎ যেটা এখন কার্যকরী হবে, সেটা আমি দেখেছি। সেখানে তোমার জন্যে আছে একটা ফ্ল্যাট বাড়ি। মিস পারভীনের জন্যে আছে তোমার স্ত্রীর বাকী-সব সম্পত্তি, এই বাড়িটা, প্রায় সব টাকা। কিছু টাকা তিনি দান খয়রাত ও উত্তরাধিকারীদের জন্যে রেখে গেছেন। সব চেয়ে মজার কথা হলো, ঐ ফ্ল্যাট বাড়িটা তোমাকে দেয়ার জন্যেও

তিনি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছেন। উইলে তিনি লিখেছেন, কখনোই তুমি তাঁর টাকা নিতে পছন্দ করতে না, তা সত্ত্বেও উপহার স্বরূপ সামান্য কিছু দেয়ার জন্যে তিনি ক্ষমা প্রার্থী।'

আমি চুপ করে রইলাম। বোবা হয়ে গেছি আমি। ক্রমশই আমার চোখের সামনে অন্ধকার ভেসে আসছে। আমি ডুবে যাচ্ছি সে-অন্ধকারের অতল তলে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে কবীর হোসেন আবার বললো, 'আমি বুঝতে পারছি, রাসেল, তোমার ওপর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রভাব খাটানো হয়েছে। তুমি নিজে যথেষ্ট বুদ্ধিমান হলেও সে চালাকীটা ধরতে পারোনি। অথবা সে প্রভাবের ঘোরে এত আচ্ছন্ন ছিলে যে, একটা ঝকঝকে মুদ্রার অপর দিকটা খতিয়ে দেখোনি। তাই না, রাসেল?'

আমি ওপরে ওপরে নিজেকে কোনক্রমে শক্ত ও সংযত রাখার চেষ্টা করে গেলেও ভেতরে ভেতরে একদম ভেঙে গেছি। কবীর হোসেনের কথা মিথ্যে হবার কোন কারণ নেই, শেলীর সে অত্যন্ত আপন জন। তার পক্ষে উইলটা দেখা বিচিত্র কিছু নয়। বা তদন্তের প্রয়োজনে উইলটার বিষয়বস্তুও যথাস্থান থেকে জেনে থাকতে পারে। এবং অত্যন্ত বাস্তব পথটা ধরে সে আমাকে ঘায়েল করার পরিকল্পনা এঁটেছে।

কিন্তু আমার অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে? আমি কি তাহলে শেষ পর্যন্ত জঘন্য এক ষড়যন্ত্রের শিকার হলাম? পারভীন কি আমাকে ওর হাতের পুতুল বানিয়ে কাজটা উদ্ধার করে নিলো?

নেপথ্যে শাহেদ খান, আর সামনে পারভীন তার যৌবন মেলে ধরে, শেলীকে খুন করার জন্যে আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল? আর তারই ফলশ্রুতি কি পারভীনের গত রাতের কথাগুলো? ভয় পাওয়ার অজুহাত নিতান্তই ছলনা। শেলীকে খুন করে ওর পথ এখন পরিষ্কার করে দিয়েছি, জীবনের রঙীন দিনগুলোতে এই বিত্ত-বৈভব উপভোগ করতে পারবে—সুতরাং, আমি এখন অপাংক্তেয়, বাতিল। আমার প্রতি ওর ঘৃণা এখন প্রচণ্ড··· হঠাৎ ওর মন পরিবর্তন তো ঐ কথাই প্রমাণ করে।···'পৃথিবীর শেষ জীবিত পুরুষও হতে, তাহলেও—এখন আর তোমাকে বিয়ে করতাম না।'

তাহলে পারভীন কি আমাকে কোনদিনই ভালোবাসেনি? আমার উচ্চকিত ভালোবাসার কাছে ওর আত্মসমর্পণ কি ছিল শুধুই উদ্দেশ্য চরিতার্থের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা? সেই প্রথম থেকে দিনে দিনে ওর প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টি কি শুধু এ কারণেই? আসলে সব অবস্থাতেই সে আমাকে তার নিপুণ ছলনার চাতুরিতে ভুলিয়ে রেখেছে—ভালোবাসা শুধু অভিনয়। গতরাতের ব্যবহারটাই এর যথেষ্ট প্রমাণ। অথচ ও আমার কাছে স্বীকার করেছিল, উইলটা সে পড়েছে। এবং তখন ও নিশ্চয় জানতো, শেলীর সম্পত্তির সিংহভাগই সে পাচ্ছে। উল্টো বলে আমাকে ভুলিয়েছে···আসলে পারভীন এখনও শাহেদ খানকেই ভালবাসে। স্বামী বলেই নয়, শাহেদ খানের প্রতি ওর একটা প্রবল আকর্ষণ রয়েছে। শুধু টাকার অভাবটাই এখানে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এখন পারভীন অনেক কিছুর মালিক হবে,

শাহেদ খানও যে জন্যে তার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল তাকে এখন টাকা দেখিয়ে ভোলাতে পারবে। পারভীন জানে, তার টাকা হলে শাহেদ খান দৌড়ে এসে হাজির হবে। আর একমাত্র এটাই পারভীনের জীবনের আন্তরিক কামনা।

আমার মাঝে একটা হিংস্র ক্রোধ মোচড় দিয়ে উঠলো। বুকের ভেতর একটা প্রচণ্ড আক্রোশ দলা পাকিয়ে পারভীনকে ছিঁড়েখুঁড়ে কুরে কুরে প্রতিশোধ নেবার প্রবল তাড়নায় যন্ত্রণা দিতে থাকলো। হঠাৎ খেয়াল হলো, কবীর হোসেন আমাকে, আমার ভাবান্তরকে ভালো করে লক্ষ্য করছে। তাই তাড়াতাড়ি সবকিছু চেপে রেখে ওর দিকে তাকালাম।

'তোমার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আমার বলতে একটুও দ্বিধা নেই যে—মিস পারভীন একজন ভাগ্যবতী মহিলা। আমার কথা বলছো ? আমার প্রতি তোমার সহানুভূতির জন্যে অনেক ধন্যবাদ। যা সে আন্তরিকভাবে দিয়েছে তাই আমার জন্যে যথেষ্ট—এর জন্যে আমি শেলীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো। তুমি এখন এ থেকে যা খুশি তা ভেবে নিতে পারো, আমার কিছু বলার নেই। তবে, আসল কথায় ফিরে এসো, তুমি কোন কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না।'

'পারভীন কি তোমাকে সাহায্য করেছে ?'

কবীর হোসেন সত্যি যেন নাছোড়বান্দা।

স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলতে শুরু করলো, 'ওরই সাহায্যে কাজটা তুমি করেছ, তাই না রাসেল ? হ্যাঁ, ওভাবেই,

মানে তোমরা দু'জনে মিলে যেমন করেই হোক মুন্সী ফজলুর রহমান আর তারা মিয়াকে বোকা বানিয়েছ। তোমাদের চালাকিকে ওরা বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করেছে, তুমি তখন এ ঘরেই ছিলে। অথচ, সে সময়টায় তুমি এ ঘরে সত্যি ছিলে না, তুমি ছিলে বাইরে। নিচের রাস্তার ঐ টিলাটার মারাত্মক বাঁকটায় তুমি তখন তোমার স্ত্রী শেলীকে খুন করছিলে। আমি কি ঠিক এগিয়ে আসিনি, রাসেল ?'

আমার অবস্থা তখন হয়ে গেছে—সারা মুখ থেকে টপ্‌টপ্‌ করে ঘাম ঝরছে। কবীর হোসেন যতই সত্যের কাছাকাছি এসে পড়ছে, ততই আমি অস্বস্তি বোধ করছি। আর যত দ্রুত সে এগিয়ে আসছে, তাতে যে কোন মুহূর্তেই আমাকে গ্রেফতার করে ফেলতে পারে।

'এগিয়ে যাও হে, গোয়েন্দা প্রবর—তোমার মতো গোয়েন্দাদের ওই তো স্বপ্ন, বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করো।' হালকা সুরে নিজেকে একটু সহজ করতে চাইলাম। 'শোন, মিঃ কবীর হোসেন, শেলীকে আমি খুন করিনি। সারা সন্ধ্যেই আমি এখানে বসে কাজ করেছি। আর এটা প্রমাণ করার জন্যে আমার সাক্ষীও আছে।'

আমার কথায় কবীর হোসেনের কোন ভাবান্তর দেখলাম না। ধীরে সুস্থে তার বিরাট বপুটাকে চেয়ার থেকে তুলে উঠে দাঁড়ালো।

'এই টেপ থেকেই তোমাকে ধরবো। আমি জানি, এ থেকেই কোন না কোন ফাঁক বেরিয়ে আসবে। আমি এখন

তাহলে যাই, রাসেল। তবে তুমি তৈরি থেকো, তোমার এই ঘরে থাকার অজুহাত আমি ভাঙবোই। দরকার হলে এর জন্যে আমি আমার জীবনের শেষ দিনটিও ব্যয় করতে রাজী আছি। অজুহাতটা যখন ভেঙে যাবে, তখন তোমাকে এখান থেকে তুলে নিতে আমি নিজেই আসবো। তুমি কি সে-দৃশ্যটা কল্পনা করতে পারো? আমি কিন্তু সে-দৃশ্যটা এখনই কল্পনা করে বেশ আনন্দ পাচ্ছি। কারণ, তার জন্যে আমাকে বেশি দেরি করতে হবে না। দুটো কথা তোমাকে বলে রাখি, রাসেল, যখন কোন খুনী খুব চতুর হবার চেষ্টা করে—মনে করো, ঠিক তোমার মতো, তখন সে সাধারণতঃ কয়েকটা ভুল করেই। এটা শুধু আমার কথাই নয়—এটা আমার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাও। আমার আরেকটা কথা হলো, একথা তুমি ভুলো না যেন—বিচারকরা চতুর খুনীদের ঘৃণা করেন।'

'চমৎকার, এগিয়ে যাও।' আমার চোখ দু'টো ভেঙে পড়ার আগ মুহূর্তে যেন জ্বলে উঠলো। 'তবে আমার কথাটাও তুমি বিশ্বাস করতে পারো, বেশিদুর এগোতে পারবে না তুমি এই লাইনে।'

'তোমার আত্মবিশ্বাস সত্যি প্রশংসার যোগ্য। বেশ শক্ত নার্ভ বটে তোমার। সে যাই হোক, অপেক্ষা করতে থাকো। দেখো কেমন করে তোমার সাজানো শক্ত অ্যালিবাইটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এ টেপকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সমস্ত টেপটার মধ্যে, নিশ্চয়ই কোথাও কোন

না কোন ছিদ্র আছে। সে-ছিদ্রই হবে আমার অস্ত্র। সেটা ছাড়া তোমাকে পুরোপুরি আঘাত করা যাবে না। সুতরাং সেটা আমি খুঁজে বের করবোই।'

টেপটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে কবীর হোসেন ঘর থেকে বের হয়ে গেল। যাবার সময় দরজটা বন্ধ করে দিতে ভুললো না।

আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালাম। একটা সিগারেট ধরালাম। বাইরে তখন দুপুরের রোদের প্রখরতা। একজন মালী গন্ধরাজের ঝোপটার ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। দুপুরের রোদে কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বিড়ি টানছে। রজনীগন্ধার সবুজ সরু পাতা-গুলো রোদের তাপে নেতিয়ে পড়েছে। কেন জানি না, বিস্বাদ ঠেকলো সিগারেটটা। নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। গাড়ির শব্দ শুনে বাইরে তাকিয়ে দেখি কবীর হোসেন চলে যাচ্ছে। পথের বাঁকে গাড়িটা না মেলানো পর্যন্ত সেদিকেই তাকিয়ে রইলাম।

আশ্চর্য, আমার পায়ের কাঁপুনি তখনো থামেনি।

একটু নিরিবিলি থাকার জন্যে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পড়লাম। চৌধুরী ভবন থেকে নিচে নামতে নামতে নিজেকে বেশ ফাঁকা মনে হলো। আমি রাসেল, ছিলাম একদিন [illegible]ারসিজ ব্যাঙ্কিং লিমিটেডের জুনিয়র অফিসার। শেলীর অ্যাকাউন্ট দেখার সুযোগেই নিজের ভাগ্য গড়ার স্থির সিদ্ধান্তে

পৌঁছেছিলাম। অর্থের অভাবে তখন মানসিক পীড়ণ চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিলো। আমি জানতাম, সুযোগ মানুষের বার বার আসে না। তাই সৌভাগ্যের আলো ঝলমল দিনের আশায় প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে আমি পিছ পা হইনি। আর আজ···

হঠাৎ ব্রেকের ওপর পা বসে গেল। রাস্তার পাথরের সাথে ঘষা খেয়ে রাবারের টায়ারগুলো বিশ্রী একটা শব্দ তুললো। ···ঐ তো সামনে সে জায়গাটা—শেলী যেখানে হাঁটু গেড়ে বসে তার জীবনের শেষ আকুল মিনতি জানিয়েছিল—'আমাকে দয়া করো, রাসেল—তোমাকে আমার সব দিয়ে দেবো।' শরীরটা একটা ভীষণ রকম ঝাঁকুনী দিয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যে ঘেমে উঠলাম। বাম হাতে কপালের ঘামটা ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে সামনের রিয়ার ভিউ মিররে নজর পড়লো—ছ'জন লোক পেছনের ঝোপ থেকে বের হয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে।

আমার চমক ভাঙলো। এখানে গাড়ি থামাবার চেয়ে বোকামী কি আর আছে? মাঝে মাঝে আবেগ আমাকে এত বিপদে ফেলে দেয়—তা কিছুতেই সামাল দিতে পারি না।

গাড়িটা তখনো একদম দাঁড়িয়ে পড়েনি। একসিলারেটরের ওপর পা রাখলাম। খুব ধীর শান্ত গতিতে একটু এগিয়ে গিয়ার বদল করলাম।

দেওয়ানহাট ব্রিজের ওপর উঠে হঠাৎ খেয়াল হলো, আমার ওপর কেউ নজর রাখছে না তো? গাড়িটার গতি একটু কমিয়ে

আবার আয়না দেখলাম, পেছনে তাকিয়েও দেখলাম—তেমন কিছু মনে হলো না। তবু একটু সাবধানে নজর রেখেই গাড়ি চালাতে থাকলাম। সদরঘাট, বিপণী বিতান, সিডিসি, লালদিঘীর পাড়—খামাকাই ঘোরাফেরা করলাম। ক্ষিদে পেয়েছিল। একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় ঢুকে কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর সোজা চলে এলাম পতেঙ্গায়।

রোদের তাপ তখনো কমেনি। তাই লোকজন নেই বললেই চলে। গাড়িটা একজায়গায় দাঁড় করিয়ে সিগারেট ধরালাম। তারপর গাড়ি থেকে নামতে নামতে সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা করার চেষ্টা করলাম। ভীষণ রকম নাড়া খেয়েছি আমি। কবীর হোসেনের কথা থেকে এটা স্পষ্ট যে, এখন সবকিছুই আমার ঐ একটা অজুহাতের ওপর নির্ভর করছে। তা অবশ্য আমি জানতাম এটাই আমার বাঁচার একমাত্র পথ। এ কথাও বুঝতে পারছিলাম যে, এখনও আমার অজুহাতটা ঢালাই লোহার মতো শক্ত দুর্ভেদ্য। তা নাহলে কবীর হোসেন ঝুঁকি নিয়ে হলেও আমাকে গ্রেপ্তার করতো।

একটা ঝোপের মতো গাছের ছায়ায় গিয়ে বসলাম। সামনে দিগন্ত প্রসারিত সাগর। কালো জলরাশি। ছোট ছোট ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়ছে, দূরে সামুদ্রিক জাহাজগুলো নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে। নিরন্তর অপেক্ষা যেন—বন্দরে আসবে বলে। কিন্তু আমার বন্দর কোথায়, তা কি আমি নিজেই জানি?

আমার রক্ষা কবচ অ্যালিবাইটার চুলচেরা পর্যালোচনা শুরু করলাম মনে মনে। দেখি কোন ফাঁক খুঁজে পাই কিনা।

যে ফাঁক ধরে কবীর হোসেন তার হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দেবে, কিম্বা গেঁথে ফেলবে বড়শিতে। এভাবে ওভাবে, নানা-ভাবেই এ নিয়ে চিন্তা করলাম। কিন্তু কোন ফাটলের চিহ্নই আমার চোখে আসছে না। যতই ভাবছি, ততই আমার বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে—এটা অভেদ্য।

কবীর হোসেন যত চেষ্টাই করুক না কেন, এটা ভেদ করার কোন পথ নেই। সে যদি জীবনভরও চেষ্টা করে, তবেও তা থেকে সে পথ খুঁজে বের করতে পারবে না। তারা মিয়ার সাক্ষীই আমার জন্যে যথেষ্ট। কারণ তারা মিয়াকে যখন জেরা করা হবে তখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে যে সে আমাকে ঘৃণা করে। এবং ঘৃণা করার পরও সে যখন বলবে, আমার কথা শুনেছে, আমাকে ঘরে উপস্থিত দেখেছে, তখন কোন বিচারকই আমাকে শাস্তি দিতে পারবে না। তারা মিয়ার কথা তারা বিশ্বাস করবে যে, সে সত্যি কথাই বলছে। তার ওপর রয়েছে মুন্সী। মুন্সীর সঙ্গে যদিও আমার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, তবু তার কথা কেউ উড়িয়ে দিতে পারবে না। বিশেষ করে মুন্সী ও তারা মিয়ার সাক্ষ্য যখন মিলে যাবে, তখন আর সন্দেহ থাকার কথাও নয়।

অ্যালিবাইটার পূর্বাপর চিন্তা করে যখন দেখলাম ওটা ভেদ করে আমাকে ধরা কিছুতেই সম্ভব নয়, তখন আমার ভয়ও আস্তে আস্তে কেটে যেতে লাগলো। বুঝতে পারলাম, কবীর হোসেন স্রেফ ধাপ্পা দিচ্ছিলো। আমার অ্যালিবাইটা সে ভাঙতে চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু পারবে না। অনেক ভেবে চিন্তেই সে এখন

আমাকে নানা উদ্দেশ্যমূলক রহস্যজনক কথা বলছে, যাতে আমার মনের জোর ভেঙে যায়। মনের জোর ভেঙে গেলে আমি এমন হয়তো কিছু করে ফেলতে পারি, যা থেকে সে পুরো সুযোগটা লুফে নিতে পারবে। এটা তার একটা পুলিশি কায়দা। দেখা যাক, এ কায়দা নিয়ে সে কতদূর পর্যন্ত এগোতে পারে। 'আমি নিরাপদ'—এ চিন্তাটা দৃঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গেই, মনটা দ্রুত পারভীনের দিকে চলে গেল।

পারভীন, সত্যি পারভীনকে এখন বেশ রহস্যময়ী বলেই মনে হচ্ছে। সুন্দরী মেয়েরা রহস্যময়ী হয় বটে, কিন্তু অমন বিশ্বাস-ঘাতকতা করবে তা বুঝে উঠতে পারিনি। আমার এখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ও আমার সঙ্গে দুদিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি যখনই ওকে ভালোবাসার কথা জানিয়েছি, তখনই সে ভালোবাসে বলে এবং সে কথা নানাভাবে বিশ্বাস করিয়ে আমাকে বোকা বানিয়েছে। ও আমাকে সুচতুর ভাবে প্রলুব্ধ করেছে শেলীকে খুন করার জন্যে। শাহেদ খানকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে বিয়ে করবে বলে কথাও দিয়েছে। আমার মাঝে অপার এক মোহজাল বিস্তার করেছে। আমার মতো ধুরন্ধর লোকও, যার নাকি নানা ধরনের মেয়েদের সঙ্গে মেলা-মেশার ব্যাপারে সুনাম রয়েছে, ওর মোহমায়া কাটিয়ে আসল চেহারাটা দেখতে পারলো না।

এখন বুঝুন, কি সাংঘাতিক ধরনের মেয়ে পারভীন। আর কি ভয়ঙ্কর খেলটাই না সে আমাকে দিয়ে খেলালো। অথচ, সব সময়েই ও জানতো, শেলীর সব টাকাকড়ি সে পাচ্ছে।

অত্যন্ত চালাক মেয়ে সন্দেহ নেই। সে খুব বুঝে সুজেই আর একটা ব্যাপারে ঝুঁকি নিয়েছে, আমাকে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। ও জানতো আমি ওকে ধরিয়ে দিতে পারবো না, নিজেও ধরা দিতে পারবো না। এ ব্যাপারে ও খুব সূক্ষ্ম চিন্তা করেছে,—একটুও ভুল করেনি। অগত্যা ধরা পড়ে গেলে হয়তো বড়জোর ওর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতো। কিন্তু আমার—আমার যে কি হতো, সে-বিষয়ে অন্য কারো মতোই, আমারও কোন সন্দেহ ছিল না।

আমার ছ'হাতের আঙ্গুলগুলো হঠাৎ নিসপিস করে উঠলো। তাকালাম আঙ্গুলগুলোর দিকে। ওগুলো খুব শক্ত করে আস্তে আস্তে বাঁকিয়ে এসে জোরে শ্বাস ফেললাম। ওর ওই সুন্দর নরম গলাটা, আর আমার এই আঙ্গুলগুলো এক করে দিতে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল।

ছ'একদিনের মধ্যেই চৌধুরী ভবন ছেড়ে চলে যাবে পারভীন। পরিস্থিতি শান্ত হবার অপেক্ষায় নিশ্চয় গা ঢাকা দেবে যে। তখন আর আমি ওকে শত চেষ্টা করেও কাছে পাবো না। না—তা কিছুতেই হতে দেয়া যায় না। এক সঙ্গে কাজ করতে নেমে এখন ওকে সটকে পড়তে দিতে পারি না। ওর আসল রূপ তো আমি বুঝে ফেলেছি—এখন আর আমি কিছুতেই ভুল করবো না। গা ঢাকা দেবার আগেই আমাকে কাজ শুরু করতে হবে।

খুব গোপনে পারভীনের ওপর নজর রাখতে হবে। একজন লোককে আমি জানি, সে ব্যাঙ্কের অনেক গোপন কাজ করে

দেয়। এ লোককে দিয়েই আমার কাজটা করতে হবে। এমন গোপন কাজের ব্যাপারে এর চেয়ে ভাল আর কেউ এ শহরে আছে বলে আমার জানা নেই। আর দেরি করলাম না। তাড়াতাড়ি শহরে ফিরে এলাম।

এ লোকটার নাম মাইকেল মৃত্যুঞ্জয়। নেটিভ খৃষ্টান। তার দীর্ঘ দিনের পেশা এটা। বিশ্বাস আর সততাই তার মূলধন। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। বেঁটে গোলগাল চেহারা। লম্বা নাকের নিচে কাঁচা-পাকা ঝুলে পড়া নড়বড়ে গোঁফ। চেহারায় রুক্ষতার ছাপ থাকলেও ব্যবহারে খুব অমায়িক। কপালটা বিরাট বড়—কোন কালে এর আশপাশে চুল ছিলো বলে মনে হয় না। কথা বলতে বলতে সে সব সময়ই বাম হাতের তালুতে কপালটা ঘষবে। আন্দরকিল্লার কাছে একটা তিন তলা পুরনো পলেস্তারা উঠে যাওয়া বাড়ির ছাদের চিলেকোঠায় তার অফিস। অফিস বলতে একটা টেবিল, খান কয়েক চেয়ার, একটা কাঠের আলমিরা। টেবিলের ওপর কিছু কাগজ পত্র-ফাইল। টেলিফোন।

অফিস ঘরে ঢুকতেই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে আমাকে স্বাগত জানালো। খুশিতে ওর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

'কেমন আছো, মাইকেল?'

'ঈশ্বরের দয়া। আপনাকে অনেকদিন পর দেখলাম, স্যার।'

'তোমার জন্যে একটা কাজ আছে, মাইকেল।'

'আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন, স্যার। প্রভুর

ইচ্ছেয় আপনার কাজে কোন ত্রুটি হবে না।' বাম হাতের তালুটা কপালে বার দু'য়েক ঘষে সে টেবিলের ওপর আমার দিকে ঝুঁকে জানতে চাইলো, 'কাজটার কথা দয়া করে বলবেন কি, স্যার?'

'একজন মহিলার ওপর আমি নজর রাখতে চাই।'

'খুব ভালো কথা। এর জন্যে আমার বাছাই করা তুখোড় লোক রয়েছে।'

'হ্যাঁ, যত খুশি তুমি লোক লাগাও। টাকার জন্যে তুমি ভেবো না, তোমার পুরো বিল পেয়ে যাবে।'

'ছি-ছি, কি যে বলেন, স্যার। আপনার টাকা নিয়ে চিন্তে করবো আমি? এ লাইনে তো আর নতুন নই, কেউ অন্ততঃ বলতে পারবে না, মাইকেল টাকার জন্যে কারো কাজ ঠিকমতো করেনি। আপনার আশীর্বাদে কাজের ব্যাপারে সবাই আমাকে বিশ্বাস করে। আমার ওপর কাজ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করে।'

'আমিও তাই করতে চাই, মাইকেল। কিন্তু দিন রাত্রি ওই মহিলার ওপর নজর রাখতে হবে। বুঝতে পারলে? চব্বিশ ঘণ্টার প্রতিটা ঘণ্টা সে কখন কোথায় থাকছে, কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে কথা বলছে—সব আমি জানতে চাই। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পার?'

'আপনাকে এ নিয়ে কিছু ভাবতে হবে না, স্যার। আপনি যেমনটি চাইবেন, তাই হবে।' ধূসর রংয়ের চোখ দু'টো তুলে মাইকেল তাকালো আমার দিকে। 'মহিলাটি কে, স্যার?'

'মহিলাটির নাম পারভীন। রং ফর্সা, চশমা পরে। দেহের গড়ন মাঝারী। চোখে পড়ার মতো আর কিছু তার নেই। এখন সে চৌধুরী ভবনে আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই সে ওই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। কিন্তু আমি তাকে আমার আওতার মধ্য থেকে চলে যেতে দিতে চাই না।'

'ঠিক আছে, স্যার। আর কিছু আছে?'

'তোমার লোকেরা ওকে চিনতে ভুল করবে না। কারণ ঐ বাড়িতে চাকর-বাকর ছাড়া অন্য কোন মহিলা নেই।

মাইকেল সবকিছুই একটা কাগজে তার নিজের মতো করে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে নিলো। নতুন একটা ফাইল কভার নিয়ে তাতে সে ঐ লেখা কাগজটা রেখে বললো, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যার। আপনি যদি বলেন, এ মুহূর্ত থেকেই আমার লোক লক্ষ্য রাখতে শুরু করবে।'

'আমার তেমনই ইচ্ছে। মাইকেল শোন, তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। তবু বলছি, যদি তাকে হারিয়ে ফেল··· তবে আমি কিন্তু তোমার বিপদ ঘটিয়ে ছাড়বো।'

'প্রভুর ইচ্ছেয় তা কোনদিনই আমার ব্যবসায় হয়নি, স্যার।'

'তা যেন এ ক্ষেত্রেও না হয়। ঠিকমতো কাজ করে যাও, প্রতিদিনই আমি তোমাকে এক হাজার করে দিয়ে যাবো। বাদবাকী ফাইনাল বিলের সময় মিটমাট করে দেবো। ঠিক আছে?'

'একটা কথা, স্যার, এটা কি পুলিশি তৎপরতার সঙ্গে

কোন সম্পর্ক আছে ? কিছু মনে করবেন না যেন, ওটা কাজের প্রয়োজনেই জিজ্ঞেস করা।'

ভালো করে দেখলাম মাইকেলকে। ওর ধূসর চোখ দু'টো অন্য কোনকিছু বলতে চায় কিনা। নাহ্, তেমন কিছু মনে হলো না।

'না মাইকেল, এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'আপনাকে আর কিছু করতে হবে না, স্যার। দেখবেন আমরা ওকে কখনোই চোখের আড়াল হতে দেবো না—অন্ততঃ আপনি যতদিন বলবেন।'

'আর শোন, সে যেন কিছুতেই সন্দেহ করতে না পারে যে তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। এ ব্যাপারে তুমি বিশেষ-ভাবে ব্যবস্থা নেবে, মাইকেল।'

'এ ব্যবসার সুনাম তো ওখানেই এবং আমার তা আছে, স্যার।'

চৌধুরী ভবনে ফিরলাম। তখন বিকেল প্রায় সাড়ে চারটে।

তারা মিয়াকে হলঘরেই পেলাম। এবার আর তাকে এড়িয়ে যাবার সুযোগ দিলাম না।

'আমি বাড়ির কাজের লোকজনদের ব্যাপারে অন্য ব্যবস্থা করছি। তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারো এবং তা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভালো।'

'আমিও আর থাকতে চাই না। আজ রাতেই চলে যেতে চাই।'

চোখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। 'বেশ ভালো কথা। তোমার মতো আর কোন কর্মচারী আছে কি, যারা আজ রাতেই যেতে চায়?'

'সবাই!' অতি সংক্ষিপ্ত ওর উত্তর। বলেই সে চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো।

ওর ঔদ্ধত্যে আমার গা রি-রি করে উঠলো রাগে। আকস্মিক ভাবে ওকে একটা ঘুষি মেরে বসলেও আমি অবাক হতাম না। অনেক কষ্টে নিজের রাগ টেনে রাখলাম—এ নিয়ে আর টানা হ্যাঁচড়া করলাম না।

'শোন, সবাইকে বলবে, তারা যেন তাদের ঠিকানা রেখে যায়। আর তুমিও তোমার ঠিকানা রেখে যাবে। কবীর সাহেব যে কোন সময় তোমার খোঁজ করতে পারেন। আমি মিস পারভীনকে বলে দিচ্ছি, তিনি তোমাদের সবার মাইনে বুঝিয়ে দেবেন। তিনি কি এখন বাড়িতে আছেন?'

'না, স্যার। কোথায় যেন গেছেন। ছ'টার কিছু পরে ফিরবেন বলেছেন।'

তাহলে এই তো সবচেয়ে ভালো সময়। এই বিশাল নির্জন বাড়িটায় ওকে কোণঠাসা করার এমন ভালো সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। কল্পনায় ওর সুন্দর মুখটা ভেসে উঠলো। ও যখন সাহায্যের আশায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করবে, তখন কেউ ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। পারভীন আমি দেখবো তোমাকে, তুমি কতদূর যেতে পারো—মনে মনে সাজালাম তাকে কি করবো। তাকে রসিয়ে রসিয়ে

বোঝাবো, কার সঙ্গে সে বেঈমানী করেছে। নিজের লোভ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে আমাকে ব্যবহার করা—আমি কি ছেড়ে দেবো তাকে ভেবেছে ? আর এসব কথা ভাবতে গিয়ে আমার ভেতর একটা অদম্য বিদ্বেষপুর্ণ ঠাণ্ডা রাগ ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলো।

'ঠিক আছে, মিস পারভীনের জন্যে তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে না। আমি এখনই তোমাদের মাইনে দিয়ে দিচ্ছি। আমি চাই, তুমি এবং বাড়ির অন্যান্য সব কর্মচারীরা মাইনে নিয়ে এক ঘন্টার মধ্যে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।'

তারা মিয়া আবার ফিরে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছু সময় তাকিয়ে রইলো।

'কি হলো তোমার ? আমার কথা কি বুঝতে পারোনি ?' আমার গলায় একরাশ অধৈর্য ঝরে পড়লো।

'তাই হবে, স্যার।'

'সবাইকে এখনই ডেকে বলে দাও। পনেরো মিনিটের মধ্যে সবাইকে আমি এ ঘরে চাই। যাও।'

ঠিকই, সবাই পনেরো মিনিটের মধ্যেই এসে গেল। যেন সবাই তৈরি হয়েই বসে ছিল। সবাই এসে আমার ঘরে ডেস্কের কাছ থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়ালো। আমি বিরাট লাইন দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এ লাইন না দেখলে হয়তো আমি কোনদিনই জানতাম না, নানা কাজে কত লোক নিয়োগ করেছিল শেলী। এক এক করে গুণে দেখলাম, ত্রিশ জন।

আমার গৃহীত ব্যবস্থা যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন, শেষ

পর্যন্ত এ ব্যাপারটা আমার কাছেই খুব মর্মস্পর্শী বলে মনে হলো। এ যেন রীতিমত একটা হৃদয় বিদারক বিদায় অনুষ্ঠান। মাইনের খাতাটা পারভীনের ডেস্কের ড্রয়ারে ছিলো। নিজেই উঠে গিয়ে ওটা নিয়ে এলাম। খাতায় সবার মাইনে উল্লেখ ছিলো। তা ধরে ধরে সবাইকে এক মাসের করে টাকা দিয়ে দিলাম। লাইনে দাঁড়ানো একের পর একজন করে তারা আমার সামনে এলো, টাকা নিয়ে বের হয়ে গেলো। কেউ আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো না, কেউ একটা কথাও বললো না।

সব শেষে এলো তারী মিয়া।

তার টাকাটা হিসেব করে গুণে ডেস্কের ওপর ঠেলে দিলাম। টাকাটা নেবার সময় একটু ঝুঁকে নিচু স্বরে বললো, 'আমার দয়ালু মনিবকে আপনি যা করেছেন··আমি বিশ্বাস করি এবং সর্বান্তকরণে আশা রাখি, আপনার কৃত কর্মের জন্যে আপনাকে পস্তাতে হবে। এ কথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই, স্যার, তিনি যদি আপনার দিকে নজর না দিতেন, তাহলে আজ নিশ্চয়ই তিনি বেঁচে থাকতেন।'

আমি আমার চোখ দু'টো বড় বড় করে ওর চোখে রাখ-লাম।

'ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দেবার আগে বেরিয়ে যাও বুড়ো —এই মুহূর্তে। গর্দভ! কত বড় সাহস!'

কিন্তু আমার ধমকে ওর চোখ মুখের কোন তারতম্য লক্ষ্য করা গেলো না। আমার কথা যেন ওর কানেই ঢোকেনি। গীর্জার যাজকের মতো মাথা উঁচু করেই ঘর থেকে বের

হয়ে গেল। এমন কি, যাবার সময় অভ্যাস মতো দরজাটা আস্তে বন্ধ করার কথাও ভুলল না।

সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই সবাই একে একে বাড়ি থেকে চলে গেল। আমি আরও কিছুক্ষণ ডেস্কে বসে রইলাম। এখন, ডেস্কের ওপর রাখা ঘড়িটার দিকে তাকালাম, ছ'টা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি।

উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বিশাল জমকালো বাড়িটা হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোথাও কোন প্রাণের সাড়া নেই। একমাত্র ডেস্কের ওপর ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ আর আমার বুকের ধুপ ধুপ শব্দই যেন এখনও এ বাড়ির অস্তিত্বে টিকে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবে পারভীন, আমি তারই অপেক্ষায় সময় গুণছি।

জানালার ভারী পর্দার আড়ালে নিস্পন্দ বসে নিচে, বাইরের রাস্তাটার দিকে অপলক তাকিয়ে রইলাম।

ছয়

ছ'টার অনেক পর—সাড়ে ছ'টাতেও পারভীন এলো না। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। সাতটা। একবার উঠে গিয়ে লাউঞ্জ, বারান্দা, হলঘর, সম্ভাব্য প্রায় সব জায়গাতেই আলো জ্বালিয়ে দিলাম। বাড়িতে অন্য প্রাণী কেউ না থাকলেও সন্ধ্যার অন্ধকারের সাথে সাথেই আলো ঝলমল করে উঠলো। সাড়ে সাতটা। আটটা। পারভীন তখনো এলো না। আমি জানালার কাছে ঠায় বসা। সাড়ে আটটার দিকে গাড়ির হু'টো আলো বাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। পারভীনের গাড়িই হয়তো হবে। একেবারে ভেতরে ঢুকতে দেখে বুঝলাম পারভীনই। প্রায় তিন ঘণ্টা ওর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছি। এ হয়তো আজকে শুধু ওর জন্যে অপেক্ষা বলেই আমার দ্বারা সম্ভব হয়েছে। তবু ঘণ্টাগুলোর প্রতিটা মিনিট গড়িয়েছে, আর আমার রাগও ক্রমশঃ বেড়েছে।

বসে থেকে থেকে ভেবেছি, পারভীনই আমার মধ্যে খুনের বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছিলো, অত্যন্ত কৌশলে। এখন বুঝতে পারছি, যে রাতে দু'জনে এ বাড়িতে প্রথম একত্রে, এক বিছানায় রাত কাটিয়েছিলাম, সেরাতেই ও আমাকে প্রকারান্তরে শেলীকে খুনের জন্যে প্রলুব্ধ করেছিল। সে-রাতে ওকে আমার নিবিড় সান্নিধ্যে পেয়ে যে কথাগুলো বলেছিলাম সে-কথাগুলোই একে একে মনে পড়তে লাগলো।

আমি বলেছিলাম, শেলীর উইল করা টাকা পয়সা যখন আমরা পাবো, তখন আমরা বুড়ো হয়ে যাবো। অত টাকা তখন উপভোগ করার সময় ও মন পাবো না।

লাস্যময়ী দেহের ভরাট যৌবনে ঢেউ তুলে পারভীন জবাবে বলেছিল, সম্ভাবনা আছে বৈকি।

আমি বলেছিলাম, তুমি বলতে চাইছো, অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে বা দুর্ঘটনায় মারা যেতে পারে।

ওর জবাব ছিল, সকলেরই তাই হয়।

অর্থাৎ মৃত্যু কথাটার দিকে ওই আমাকে সে রাতে প্রথম বারের মতো ঠেলে দিয়েছিলো। কারণ শেলীর টাকার চিন্তা আমার থাকলেও, ওর মৃত্যুর চিন্তা তখনো আমার মাথায় ঠাঁই পায়নি। তাছাড়া এ কথা বলার সময় যে সুযোগটা পারভীন বেছে নিয়েছিলো তা চিন্তা করেও আমি অবাক হচ্ছি। ওকে একান্তভাবে কাছে পাওয়ার যে একটা উদগ্র কামনা আমার মাঝে ছিল তা সে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেছে। হানিমুনের দিনগুলি থেকে সে প্রতি পদে নিজের প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টি

করেছে। আমার আকর্ষণ আরও তীব্রতর করেছে। তারপর সে-রাত্রেই প্রথম, শেলীর অনুপস্থিতিতে ওরই বাড়িতে আমার শোয়ার ঘরে, আমার প্রচণ্ড কামনার কাছে নিজেকে তুলে দিয়েছে। আমাকে বিমোহিত করে, পরম তৃপ্তির শ্রান্তিতে সে ইঙ্গিত দিয়েছে শেলীর মৃত্যুর কথা।

হয়তো এমনও হতে পারে, যে মুহূর্তে পারভীন জেনেছিলো যে শেলীকে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি, সে-মুহূর্তেই আমাকে দিয়ে শেলীকে খুন করাবার পরিকল্পনা সে করেছিল। কারণ বিয়ের আগে ওর কিছু আচরণ কিছু অযাচিত উপদেশ আমাকে সদর্পে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে শেলীর কাছে আসা আমার তখন জীবন মরণ সমস্যা ছিল। কেননা শেলীর কাজে অসমর্থ হলে সে-সময়ে ব্যাঙ্কের চাকরীটা নির্ঘাৎ আমাকে হারাতে হতো। ফলে আমার একটা মাত্রই পথ খোলা ছিল, সাহসের ওপর ভর করে এগিয়ে যাওয়া। আর পারভীন হয়তো তখনই আমার নমুনা দেখে আমাকে দিয়ে শেলীকে খুন করাবার বীজ বুনেছিলো।

গ্যারেজ থেকে পারভীন বেরিয়ে এলো। আমি জানালার কাছ থেকে সরে আসার আগে ওকে লক্ষ্য করলাম, অবিন্যস্ত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সদর দরজার দিকে এগিয়ে আসছে।

মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। লাউঞ্জে এসে একটা বড় থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকলাম।

সদর দরজা খোলার শব্দ হলো। বুঝলাম সে ভেতরে

ঢুকছে। হলঘর পার হয়ে লাউঞ্জে এলো। লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত সে ভালো করে চারদিক দেখলো। তারপর ঘুরে হলঘরের দিকে যাবার সময় আবার পেছন ফিরে দেখে নিলো। হলঘর থেকে এবার বের হয়ে কোনদিকে না তাকিয়েই ওপরের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো।

ও সিঁড়ি দিয়ে ওপরে না ওঠা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করে রইলাম। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে সদর দরজার চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিলাম। চাবিটা সযত্নে আমার পকেটে রেখে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলাম নিজে নিজেই। এবার, পারভীন, তুমি কোথায় যাবে? আমাকে দিয়ে খুন করাবার মজা এবার প্রতি কণায় কণায় তোমায় বুঝিয়ে দেবো। তোমার অভিনয় কলা নৈপুণ্যের দৌড় আজ আমি দেখবো, পারভীন।

এই বিশাল বাড়িটায় এখন আমরা দু'টি প্রাণী। অথচ আমরা দু'জন এখন দুই মেরুতে অবস্থান করছি। আমি কেন্দ্র-বিন্দুতে আসতে চাইলেও পারভীন আসবে না। সুতরাং সংঘর্ষ অনিবার্য।

কান খাড়া রেখে বুঝলাম, পারভীন বারান্দা পার হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

পরমুহূর্তেই চাকরদের কোয়ার্টারের কোথাও ঘন্টা বেজে উঠলো।

বুঝলাম, এ বাড়ির মালিক এখন ও। ঘন্টা বাজিয়ে ঘটা করে চাকর ডাকার অধিকার এখন ওর আছে। আছে হুকুম করার অধিকার।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। একদম পা টিপে টিপে, নিঃশব্দে।

ওপরের শেষ সিঁড়িটায় পা রেখেছি সবে, আবার সজোরে ঘণ্টা বেজে উঠলো।

এ তো স্বাভাবিকই—বাড়ি এখন ওর। সুতরাং অধৈর্য হবার অধিকারও ওর আছে। যে কোন অবস্থাতেই কোন চাকর শেলীকে একদণ্ডের জন্যেও অপেক্ষা করিয়ে রাখতো না—এখন কোন চাকর পারভীনকেও অপেক্ষা করিয়ে রাখতে পারে না।

আমি সিঁড়ির কাছাকাছি একটা অব্যবহৃত শোবার ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। দরজটা সামান্য একটু ফাঁক করে বাইরে চোখ রেখে দেখতে থাকলাম।

আবার ঘণ্টা বেজে উঠলো। এবার একটানা অনেকক্ষণ ধরে বাজলো। একটু থামলো, আবার বাজতে শুরু করলো। আরো একবার। তারপর ঝনাৎ করে দরজা খোলার শব্দ হলো। দরজার কবাট সজোরে আছড়ে পড়লো দেয়ালে। পারভীন ঘর থেকে বের হয়ে এলো। ক্রুদ্ধ পায়ে দ্রুত হেঁটে এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ালো।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, রাগে সে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। কি করবে ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছে না। চশমাটা একটানে খুলে হাতে নিলো। রং ফিকে হয়ে যাওয়া একটা নীল শাড়ী ওর পরনে। ওই শাড়ীটাতেই ওকে আরও বিবর্ণ দেখাচ্ছে। থামটাতে ভর দিয়ে সে নিচের দিকে ঝুঁকে দেখলো। নিচের হল-ঘরের দিকে তাকিয়ে কারো কোন শব্দ শোনার জন্যে অধীর হয়ে

অপেক্ষা করতে থাকলো।

কিন্তু হলঘর থেকে পুরানো আমলের প্রকাণ্ড দেয়াল ঘড়ি-টার টক্‌টক্‌ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা গেল না।

কয়েক মুহূর্ত পারভীন ওখানে নিশ্চল হয়েই দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বারান্দার কোণে রাখা আভ্যন্তরীণ টেলিফোনটার দিকে এগিয়ে গেলো। ওর হাঁটায় এখন আর অবিন্যস্ত ভাবটা নেই। তার বদলে এসেছে একটা ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব।

আমি দরজার কবাটের সামান্য ফাঁক দিয়ে দেখছি—পারভীন চরম অধৈর্য নিয়ে ডায়াল রিসিভারটা কানে চেপে ধরে আছে। বাড়ির কোন এক অংশে টেলিফোন বাজার কি-রি-রিং, কি-রি-রিং শব্দ আমিও শুনতে পাচ্ছি। নিস্তব্ধতাই হয়তো টেলিফোনের রিং এর শব্দ সারা বাড়িটায় ছড়িয়ে দিচ্ছে। ও প্রান্ত থেকে কেউ সাড়া দিলো না। লাইনটা কেটে আবার অন্য নাম্বারে ডায়াল করলো। টেলিফোন রিং এর শব্দ ভেসে এলো বাড়িটার আনাচে কানাচে থেকে। অনেকক্ষণ ধরে রিসিভারটা কানে চেপে ধরে অগত্যা রেখে দিলো। এতক্ষণ ওর মাঝে কিছুটা বিরক্তির ভাব থাকলেও দেখলাম, হঠাৎ ওর চোখ দুটো সতর্ক হয়ে উঠলো।

চকিতে একবার বারান্দার এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো।

আমি তখন আমার লুকানো জায়গা থেকে বের হয়ে সিঁড়ির কাছে পারভীনের দাঁড়ানো জায়গাটায় এসে দাঁড়ালাম। তারপর অতি সাবধানে নিচের হলঘরের দিকে তাকালাম।

পারভীন তখন কি করবে কি করবে না, ভাবতে ভাবতে হলঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে।

'তারা মিয়া!'

ওর তীক্ষ্ণ চাপা গলার চিৎকার সারা বাড়িটায় কেঁপে কেঁপে বেড়ালো, কিন্তু কোন উত্তর এলো না। উত্তরের আশায় অপেক্ষমান পারভীন যেন মিয়িয়ে গেলো।

তবু কিছুক্ষণ ও অপেক্ষা করলো। তারপর হঠাৎ শেলীর পড়ার ঘরের দিকে গেলো। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালালো। খোলা দরজা পথে বাইরের দিকে তাকালো। আবার চাকরদের কোয়ার্টারে কোথাও ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনতে পেলাম। একটানা অনেকক্ষণ। আমি তখন নিচে নামবো বলে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ালাম।

টেলিফোন ডায়াল করার শব্দ কানে এলো। এই সুযোগ, আমি দ্রুত পায়ে নিঃশব্দে নিচে নেমে এলাম। হলঘরে ঢুকতে যাবো, ঠিক তক্ষুণি টেলিফোন রাখার শব্দ পেলাম। চট করে একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে গেলাম। আবার হলঘরের ভেতর এলো পারভীন।

ওর হাঁটা-চলায় এখন অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে খুব বেশি। ওর হৃৎস্পন্দন যেন বেড়ে গেছে। ওর বুকের ধুপ্ ধুপ্ শব্দ যেন আমার কানে ভেসে আসছে।

আমি থামের আড়াল থেকে ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। হল ঘরটাও যেন থমথমে। সে থমথমে ভাবটাই ওকে যেন আরো ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিচ্ছে। ঘরটার চারদিকে বারবার তাকাচ্ছে।

ওর চোখ দুটো কাঁপছে। হঠাৎ ও কান খাড়া করলো। মনে হলো কোন চোরা শব্দ হয়তো সে শুনেছে। আমি ওর চেহারা দেখে বুঝতে পারছি, ভয় পেয়ে গেছে। একরকম ছুটে গিয়ে হঠাৎ হলঘরের সব কটা আলো জ্বেলে দিলো।

আমি একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে আড়াল থেকে ওকে লক্ষ্য করছি। ওর ক্রমবর্ধমান ভীতি দেখে আমার খুব কৌতুক বোধ হচ্ছে। ওর ভীত-সন্ত্রস্ত অসহায় অবস্থাটা উপভোগ করার আর হয়তো সুযোগ পাবো না। তাছাড়া আমার তো কোন তাড়া নেই—সারা রাতটাই তো আমার জন্যে পড়ে আছে।

'তোমরা কেউ বাড়িতে আছো?' গলা চড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো পারভীন। কিন্তু উচ্চগ্রামে গিয়ে ওর গলাটা ভেঙে গেল। গলা থেকে এক বিচিত্র শব্দ বের হয়ে এলো। 'তা-আ-আ-রা মিয়া, তুমি—তুমি কোন উত্তর দিচ্ছো না কেন?'

ওর গলার শব্দটা মিলিয়ে যেতে যেতেই আবার স্তব্ধতা নেমে এলো চারদিক থেকে। এই জমাট স্তব্ধতার মধ্যে ঘড়ির টক্ টক্ শব্দটাই শুধু কানে এসে আঘাত করছে।

'না-না, ওরা সব্বাই চলে যেতে পারে না।' অস্ফুট স্বরে নিজেই বিড় বিড় করে উঠলো পারভীন। তারপর ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে সিঁড়ির দিকে ঘুরলো। কিন্তু সামনে পা বাড়াবার আগে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালো। খুব সতর্কভাবে কান পেতে কোন কিছুর শব্দ শুনতে চেষ্টা করলো। তারপর দ্রুত পায়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। দরজার গায়ের বড় লোহার হাতলটা ধরে টানলো।

খুললো না দেখে আবার গায়ের জোরে টান লাগালো। একটুও নড়লো না ওটা। আমি পকেটে হাত দিয়ে চাবিটা অনুভব করলাম।

নিঃশব্দে থামের আড়াল থেকে বের হলাম। তখনো পারভীন দরজাটা নিয়ে টানাটানি করছে। আর আমি হল ঘরের মাঝে এসে সুবিধে মতো একটা জায়গায় ওকে মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালাম।

'ওটা চাবী দেয়া পারভীন,' খুব নরম গলায় বললাম আমি।

ভীষণ রকম চমকে উঠে পারভীন সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো। ভূত দেখার মতো সে শিউরে উঠলো। সেই সাথে গলা দিয়ে তীক্ষ্ণ কান্নার মতো একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো। শরীরটা ছেড়ে দিলো দরজাটার গায়। পিঠ দিয়ে শরীরের ভারসাম্য অনেক কষ্টে রক্ষা করলো। আমার দিকে ভালো করে তাকালো। চোখ দুটো ওর ভয়ে বিস্ফারিত। চেতনা হারাবার আশঙ্কাতেই ও হঠাৎ দু'হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে ফেললো।

'তোমাকে এত ভীত দেখাচ্ছে কেন, পারভীন? ··তোমার মনে কি কোন পাপবোধ জাগছে? কিসের তাড়নায় তুমি এমন আতঙ্কিত হয়ে পড়ছো?'

'তুমি ··রাসেল, তুমি আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছো কেন?' মনে হচ্ছে পারভীন কেঁদে ফেলবে।

'তুমি কি কিছুই অনুমান করতে পারছো না? পারভীন, উইলের বিষয়ে আমি শুনেছি।' অত্যন্ত নির্বিকার কণ্ঠে বলে ওর চোখে চোখ রাখলাম।

দেখলাম নিজের মধ্যে কুঁকড়ে গেল ও। পালটে গেল ওর চেহারা। ভয়ে আবার বিবর্ণ হয়ে গেল। এতক্ষণ ডাকা-ডাকি করেও বাড়িতে কারো সাড়া পায়নি. এ অবস্থায় আমি উইলের কথা তুলে বসেছি, ও ভীষণ রকম ভড়কে গেল।

'তুমি যে কি বলছো, আমি কিছুই বুঝছি না। রাসেল শোন, আমার কথা শোন—তারা মিয়া কোথায়? বাড়িটা এমন নিঝুম ভুতুড়ে লাগছে কেন? মেরীকে ডাকার জন্যে বার বার ঘণ্টা বাজাচ্ছিলাম—কেউ এলো না, কোথায় সব? কোথায় গেল তারা মিয়া? একটু কষ্ট করে ডেকে দাও না ওকে?'

আমি হাসলাম। পারভীন এ অবস্থায় এখন ওদের কাউকে কাছে পেয়ে সম্ভাব্য বিপদ থেকে রেহাই পেতে চাইছে। বিশেষ করে এখন যেন তারা মিয়াই ওর একমাত্র ভরসা।

'ওরা সবাই চলে গেছে। আমিই ওদের একমাসের মাইনে দিয়ে বিদায় করে দিয়েছি। এই বিশাল প্রাসাদপুরীতে এখন আমরা দু'জন। শুধু তুমি আর আমি। আমি আর তুমি। এমন একাকী আমরা আর কোনদিন হতে পারিনি। তোমার কেমন লাগছে, পারভীন?'

পারভীন আমার কথায় যেন সম্বিত ফিরে পেল। সহজ হতে গিয়ে ঢোক গিললো। বোঝা যাচ্ছে, সে এখন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাড়িতে যখন আর কেউ নেই, নিজেই তৈরি হয়ে নেয়া ভালো। এমন একটা মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই যেন পারভীন দরজার গা থেকে নিজেকে আলগা করে হলঘরে এলো। তারপর আস্তে আস্তে আমাকে পাশ

কাটিয়ে এগিয়ে গেলো।

আমি ওর চলে যাওয়ার পথের দিকে ফিরে দাঁড়ালাম। ওর চলা দেখে আর মনে হলো না যে সে একটু আগেই ভয়ে দিশেহারা হয়ে উঠেছিল। তবু জিজ্ঞেস করলাম,

'ভয় পেয়েছো নাকি, পারভীন?'

'ভয় পাওয়ার কি আছে? আমি আমার ঘরে যাচ্ছি।'

'তা যেও। কিন্তু তার আগে, তোমার সঙ্গে আমার যে কিছু কথা আছে, সেগুলো বলে নিতে চাই।'

'তোমার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই—থাকতে পারে না। তাছাড়া এ বাড়িতে আমরা একা, দু'জনে এভাবে থাকতে পারি না। আজ রাতেই আমি এ বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি।'

'তা তুমি করবে বলে আমার মনে হয় না। এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার ভাবনা তুমি আদৌ করছ কিনা, সে-বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল পারভীন। চট্ করে ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির মাথায় ওকে আটকালাম।

'আরে, এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছো, দাঁড়াও। তোমাকে অভিনন্দন জানাতে তো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। এরকম একটা প্রাসাদসম বাড়ি, বিস্তর নগদ টাকা সহ বিশাল সম্পত্তি··· এমন সৌভাগ্য কেমন লাগছে, পারভীন?'

'শেলী যদি আমার জন্যে খুশি হয়ে রেখে যায়, আমি কি করতে পারি বলো?' কথা বলতে গিয়ে ওর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। 'এটা আমার দোষ নয় নিশ্চয়ই।'

'দোষ যে কার সেটাই আমি বুঝতে চাইছি, পারভীন। তুমি আর শাহেদ খান—দু'জনে মিলেই কি ওগুলো ফেরত পাবার আশায় শেলীকে খুন করতে আমায় প্রলুব্ধ করেছিলে? নাকি, ...এটা শুধু তোমারই পরিকল্পনা?'

'ওকে খুন করার সমস্ত পরিকল্পনাটা যে তোমার একার ছিলো, তা তুমি ভালো করেই জানো।'

'উঁহু, তা নয়। ওকে খুন করার প্ররোচনা নিয়ে তুমি যেভাবে এগিয়ে এসেছিলে,...সে যাকগে। এখন যদি তুমি আমাকে বিয়ে করতে আপত্তি করো, তাতে আমি মোটেও আশ্চর্য হবো না। শাহেদ খান নিশ্চয় এখন তোমাকে ফেরত পাবার জন্যে একপায়ে খাড়া। প্রথম সুযোগেই সে এখন এসে একেবারে আছাড় খেয়ে পড়বে—যাতে, তোমার পাওয়া টাকাগুলো খরচ করতে পারে। তুমিই বলেছ, টাকার জন্যেই সে তোমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এখন শাহেদ খান এলে দু'হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নেবে নাকি?'

সোজা হয়ে দাঁড়ালো পারভীন। সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকালো। ফ্যাকাশে মুখটা ওর কঠিন হয়ে উঠলো।

'এ ব্যাপারে আমার জীবনে অনেক শিক্ষা হয়েছে। আর নয়। পথ ছাড়ো। ওপরে গিয়ে আমার জিনিস পত্র গুছিয়ে নেই।'

ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলাম। পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে সে-খবর পারভীন এখনো রাখে না।

'কবীর হোসেন জানে, আমরা দু'জনে মিলেই এ কাজটা করেছি। আজ দুপুরে সে এখানে এসেছিল। তুমি যে

শেলীর উইলের ব্যাপারে আমাকে ধোকা দিয়েছ সে-কথাও সে বললো। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমরা পুরো কাজটা কিভাবে সমাধা করেছি, কিভাবে মুন্সী আর তারা মিয়াকে বোকা বানিয়েছি, সব—সব সে ঠিক ঠিক বলে দিলো।'

ওর কঠিন মুখটা আবার ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'তোমাকে আমার বিশ্বাস হয় না—তুমি মিথ্যে কথা বলছো।'

'তাই যেন হয়—কবীর হোসেনের ভাবনাটা যেন মিথ্যে হয়ে যায়। কিন্তু শোন পারভীন, আমরা যা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও সে অনেক বেশি চালাক। অনেক খুঁটে খুঁটে ফাটা চাকাটার টিউবের মধ্যে সে কিছুটা বালি পেয়েছে। খাদের মধ্যে যেখানে গাড়ি আটকে ছিলো সেখানে বা রাস্তার কোথাও কোন বালির চিহ্নমাত্রও নেই। একমাত্র সে-সূত্রটাই তাকে বলে দিয়েছে ব্যাপারটা খুন। আমার চেয়ে সে তোমাকে বেশি সন্দেহ করছে। খুন করার স্বার্থ আমার চেয়ে তোমারই বেশি রয়েছে। কারণ, উইলের কথাটা তুমি আগে থেকেই জানতে। খুনের ব্যাপারে তোমারই বেশি আগ্রহ থাকার কথা মনে করে সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো—শেলীকে খুন করার কথা তুমি আমাকে বলেছিলে কিনা। তার অর্থ তুমি নিজেই বুঝে দেখ, উইলের পথ ধরে কবীর হোসেন তোমার কত কাছাকাছি চলে এসেছে।'

চকিতে পারভীন এক পা পিছিয়ে গেল।

'উত্তরে তুমি তাকে কি বললে?' খুব স্পষ্ট ভঙ্গিতে ও জানতে চাইলো।

'আমি তাকে বলেছি তার কথাগুলো প্রমাণ করতে। আমার মনে হয় না তা সে পারবে। কিন্তু···পারতেও পারে। আর যদি তা হয়েই যায় তবে, তৈরি থেকো পারভীন, ফাঁসির রশি তোমাকেও গলায় নিতে হবে।'

'রাসেল, তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করছো। তুমি মনে রেখো, আমি তোমার কোন কথাই বিশ্বাস করি না।'

'ঠিক আছে, আমি বলছি না যে আমার কথা তোমার বিশ্বাস করতে হবে। কবীর হোসেন যদি আমাদের অ্যালিবাইটায় বিন্দু মাত্র ফাটল ধরাতে পারে, তবে খুব তাড়াতাড়িই বুঝতে পারবে —ধরা পড়তে কেমন লাগে।'

'রেখে দাও ওসব অমূলক চিন্তা। আমি জানি সে এটা প্রমাণ করতে পারবে না।'

'আমিও তাই আশা করি। ভালো কথা,—শাহেদ খানের কাছে সুখবরটা পৌঁছে দিয়েছো তো ? মনে হয় সারা বিকেলটাই সেখানে ছিলে, তাই না ?'

'তোমার এ সব কথার কোন মানে হয় না। তবু তুমি জেনে রাখো, তার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই। আমি চাই না তুমি বারবার ওকে এর মধ্যে টেনে আনো। আমি আমার জিনিস পত্র গুছিয়ে নিতে ওপরে যাচ্ছি।' আমার পাশ কাটিয়ে পারভীন সিঁড়ির মাঝখান পর্যন্ত চলে গেল।

আমি কয়েকটা সিঁড়ি লাফিয়ে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়ালাম।

'তুমি—তুমি তো এখনো তাকে ভালোবাসো, পারভীন, তাই না ? তাকে নিয়ে তো এখন এ বাড়িতেই তুমি বাস করতে

পারো। তুমি তাকেই আনতে যাচ্ছো, তাই না ? সত্যি চমৎকার অভিনয় করে গেছো শেলীর কাছে—স্বামী থেকেও মিস পারভীন তুমি। সে যাই হোক, খুনের ব্যাপারে শাহেদ খান কি কিছু জানে ?'

'আমাকে, প্লিজ কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও, রাসেল।' আমার কাছ থেকে পিছিয়ে ও প্রায় দেয়ালের কাছাকাছি চলে গেল।

'তোমাকে একা থাকতে দিলে আমি থাকবো কি নিয়ে, পারভীন? তুমি কি অনুমান করতে পারছো, আমার মাথার মধ্যে কি চলছে ? শেলীকে খুন করার পেছনে প্রধান কারণ ছিলো, তোমাকে আমি পাবো। কিন্তু সেটাই আমার হচ্ছে না। উইলের ব্যাপারেও দিলে ধাপ্পা। তুমি টাকাও পেলে, শাহেদ খানকেও পেলে। পাওয়ার পাল্লাটা তোমারই ভারী থাকবে—অমন অসম চুক্তি তো আমাদের ছিলো না।'

'কোন চুক্তি-টুক্তি আমি মানিনা, কখনো তা ছিলও না। তুমি কি করতে পারো আমার ?'

আমি কি করতে পারি সেটা পরের কথা, তবে এখন আমি এই সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করছি · তোমাকে খুন করাই বোধ হয় সবচেয়ে নিরাপদ কাজ হবে। খুন—হ্যাঁ খুন, তোমাকে খুন করতেই আমার ভারী ইচ্ছে করছে। তোমার ঐ সুন্দর গলাটা, আহা, আমার এই দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। সেই সাথে আরও ইচ্ছে করছে তোমার ঐ কণ্ঠনালীটার ব্যবহার চিরতরে বন্ধ করে দিতে—তোমার গলা দিয়ে যেন আর মিথ্যে কথা না বের হয়, আর কখনো মানুষকে ধাপ্পা দিতে

না পারো।'

'রাসেল, তুমি যে কি সব বলছো, তা তুমি নিজেই জানো না।'

ওর দিকে আস্তে আস্তে এগোতে থাকলাম। আমার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে হিংস্রতা।

'পারভীন, ওকথা বলে তুমি আমার হাত থেকে পার পাবে মনে করো না। তোমাকে খুন করাটা যে নিরাপদ হবে না তা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমি তাই ভেবে বিরত হব। বলতে দ্বিধা নেই, তুমি ছাড়া অন্য কোন মেয়ের জন্যে হলে আমি শেলীকে খুন করতাম না। তোমাকে আমি চেয়েছি—এমন করে অন্য কোন মেয়েকে আমি চাইনি। আর তুমি···আমার সেই একাগ্র চাওয়ার সুযোগ নিয়ে আমাকে সবসময়েই বোকা বানিয়ে এসেছ। রেহাই নেই, পারভীন। আমার হাত থেকে রেহাই তুমি পাবেনা।'

ওকে ধরতে আমি কোন তাড়াহুড়া বোধ করছি না। সে সুযোগটাই সে নিলো। আমি ওকে দেখছি—ফাঁদে আটকা পড়ে কেমন ছট্‌ফট্‌ করে। সেই ফাঁকে, আচমকা আমার পাশ কাটিয়ে ও নিচের সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলো। আমি ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই ও নিচে নেমে গেলো। আমি লাফিয়ে নামলাম নিচে। ও চট্‌ করে একপাশে সরে গেলো। অল্পের জন্যে ওর কাঁধটা ধরেও ধরতে পারলাম না। দাঁড়ালাম আমি। একটু এগিয়ে যেতে সময় দিলাম। ওকে বেশ খানিক তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছে আমার মাঝে প্রবল হয়ে উঠলো।

একছুটে গিয়ে ও শেলীর পড়ার ঘরে ঢুকে পড়লো।

আমিও ঘরে ঢুকলাম। ও তখন একটা ডেস্কের পেছনে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই দু'জনকে দেখলাম। সামান্য একটু তাড়া খেয়েই ও হাপাতে শুরু করেছে। আর আমি ওর দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে এক পা এক পা করে আগাতে থাকলাম।

'আর আগাবে না, আমার কাছে তুমি আসবে না, রাসেল!' দম বন্ধ করে চিৎকার করে উঠলো পারভীন।

'আমাকে যে আর একবারের জন্যে হলেও তোমার কাছে আসতেই হবে, পারভীন।' একটা চাপা আক্রোশ আমার গলার স্বর ফুটে বের হলো। সেইসাথে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসলাম।

'রাসেল, আমি বুঝতে পারছি না, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'মাথা খারাপ হয়নি, তেমন কিছুর সম্ভাবনাও নেই। ভয় পেয়ো না, পারভীন, তোমাকে সামান্য একটু শিক্ষাই দেবো। সামান্য একটু, যাতে সারা জীবনে আর কখনো ধাপ্পা দিতে না পারো—শুধু, তোমার পিঠের চামড়াটা ছাড়িয়ে নেবো।'

হাত দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে ধরে আমি ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। ও ঝট্ করে ডেস্কের একটা ড্রয়ার খুলে ফেললো। আমি আর দু'পা এগিয়ে যেতেই সে ড্রয়ার থেকে হাতটা বের করে আনলো। দেখলাম ওর হাতে একটা কালো চকচকে পিস্তল।

'এসো, চামড়া ছাড়াও আমার, দেখি তোমার বাহাদুরী।'

ওই ধাতব অস্ত্রটা ওর গলার স্বর পরিবর্তন করে দিলো। গলার কাছে রগগুলো ফুলে উঠে কঠিন হয়ে গেলো ওর চেহারা। ধাতব অস্ত্রটা ধরে হাতটা সামনের দিকে বাড়ানো, তর্জনিটা ট্রিগারের ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসা। ৩৮ বোরের পিস্তলের ভোঁতা নাকটা সোজা আমার বুকের দিকে তাক্ করা।

'এখন আর এগিয়ে আসার সাহস নেই তোমার, কি বলো ?'

ওর চোখ দু'টো জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে আমি থমকে গেলাম। ওর চোখ যেন ঘৃণা আর প্রতিহিংসার জ্বলন্ত শিখা ছুঁড়ে দিচ্ছে আমার দিকে।

'তুমি কি ভেবেছো আমাকে ? আত্মরক্ষার ব্যবস্থা না করেই এখানে ফিরে আসবো, তেমনটা ভাবলে কি করে ? তোমার প্রতিহিংসার থাবার মাঝে গলাটা এগিয়ে দিতে আসার মতো বোকা আমি নই।'

'পারভীন, মানে…' আমি যেন কোন কথা খুঁজে পেলাম না।

'তুমি যাই বল না কেন, আর এক পা আমার দিকে এগোলে, —তোমাকে আমি খুন করে ফেলবো।' ওর সুদৃঢ় হাতটা একটু নড়ে উঠলো।

আমি আর কোন কিছু না বলে পিছিয়ে গেলাম।

আমার দিকে তাক করা পিস্তল আর ওর অনমনীয় চেহারা

দেখে আমার শরীরের শিরা-উপশিরাগুলোতে হিমেল ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেলো শিরশির করে।

'শোন রাসেল, একথা সত্য যে, আমি তোমাকে ধাপ্পা দিয়েছি। বোকাও বানিয়েছি। আর তা করার জন্যে আমি এমন একটা পথ বেছে নিয়েছিলাম, এ ব্যাপারে তোমার কিছুই করার ছিল না—শুধু, আমার ইচ্ছেগুলোকে মেনে নেয়া ছাড়া। আমি জানতাম, শেলী আমার জন্যে টাকা সহ সবকিছুই রেখে যাচ্ছে। তার কারণ, আমি তার করুণা কুড়োতে পেরেছি। তুমি জানতে না, কিন্তু আমি জানতাম, তার মতো কুৎসিত আর খুব সাদামাটা যে কোন লোককেই সে করুণা করতো। ব্যাঙ্কের কাজে আবহুর রশীদের পর তুমি যখন এলে—তোমার উদ্যম আর সপ্রতিভ ভাব দেখে আমি আশান্বিত হলাম। তোমার মাঝেই আমার সম্ভাবনাকে দেখতে পেলাম। তুমিই যখন শেলীকে খুন করতে পারো, তখন আমি কেন আর বছরের পর বছর ওর মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকবো। তাইতো শেলীকে জব্দ করে বাগে আনার উপায়টা আমি তোমাকে বলে দিয়েছিলাম।'

একটু থামলো পারভীন। তারপর আমার সামনের দিকে ঝুঁকে চোখ দু'টো ওপরের দিকে টান করে বলতে থাকলো,—বিয়ে করবো, তোমাকে? আমি তোমাকে ঘৃণা করি। সে ঘৃণা যে কত প্রচণ্ড তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। সেই হানিমুনের শুরু থেকেই, তুমি যখন তোমার নোংরা প্রেম নিবেদন করতে, তার প্রতিমুহূর্তেই তোমার প্রতি আমার

ঘৃণা উপচে পড়েছে। আমি নিজেই কখনো কখনো এইভেবে বিস্মিত হয়েছি যে, এতগুলো টাকার বিনিময়েও আমি কেমন করে তোমার মত একটা লোকের সঙ্গে প্রেম ভালোবাসার ভান করতে পারলাম। ···সে যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে—টাকাটা আমি পেয়ে গেছি। আর তার জন্যে আমি অনেক মূল্যও দিয়েছি। সে-চরম মুল্যের জ্বালা যে কি ভীষণ, উহ্।···এখন তুমি বেরিয়ে যাও। এ বাড়ি এখন আমার। বাড়িঘর, টাকা পয়সা কিছুতেই তোমার আর কোন অধিকার নেই। তুমি আর ওসব ছুঁতেও পারবে না। আমার উকিলকে জানিয়ে দিও, সেই তোমার মাল পত্র, তোমার যা কিছু যেখানে আছে, সব তোমাকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে। তোমার সামান্য কোন কিছুও এখানে থাকুক, আর সেটা আমাকে তোমার কথা মনে করিয়ে দিক, তা আমি কিছুতেই হতে দেবো না। এখনই বেরিয়ে যাও। এই মুহূর্তে, আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না। বেরিয়ে যাও।'

'কিন্তু আমি আবার তোমার দেখা পেতে চাই।'

'বেরিয়ে যাও শয়তান। নীচ, জানোয়ার!'

'মনে রেখো, এর জন্যে তোমাকে উচিত শিক্ষা দেবো, পারভীন।' প্রচণ্ড রাগে আমি কাঁপছি।

'আমার সামনে তোমাকে আর সহ্য করতে পারছি না। কথা না বাড়িয়ে দূর হয়ে যাও।'

'ঠিক আছে, তবে সাবধানে থেকো। কারণ এরপর প্রথম সুযোগেই তোমাকে পাল্টা মার দেবো। সেদিন আর বেশি

দূরে নেই, খুব তাড়াতাড়িই আসছে···আসবেই।'

'আমাকে উত্তেজিত করে কিছু একটা করে বসতে বাধ্য করো না, রাসেল। যাও, এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।'

আর কোন কথা বললাম না আমি। ধীর শান্ত পায়ে হলঘর পেরিয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। পকেট থেকে চাবি বের করলাম। আস্তে আস্তে তালা খুললাম। একটানে দরজাটা খুলে বাইরে পা দেবার জন্যে তৈরি হলাম।

পেছন ফিরে একবার তাকালাম। এর মধ্যে পারভীনও আমার পিছু পিছু এগিয়ে এসেছে। আমার থেকে কিছুটা দূরে হলঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। পিস্তলটা শক্ত হাতে আমার দিকেই তাক করা। চোখ দু'টো খুব সতর্ক ভাবে নজর রাখছে আমার ওপর।

'শুভ রাত্রি, পারভীন! নিঝুম এ বাড়িতে রাতটা তোমাকে একা থাকতে হবে না। শেলীর আত্মা এসে তোমায় সঙ্গ দেবে।'

আর দাঁড়ালাম না। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে বাইরে নেমে এলাম।

দু'পেগ শেষ হয়ে গেলো। আরেকটার জন্যে বেয়ারাকে হাতের ইশারায় ডাকলাম। রাত এখন সাড়ে দশটা। চৌধুরী ভবন থেকে বের হয়ে সোজা বারে চলে এসেছি। যাবার জায়গা কোথাও নেই। কাজও নেই। এ অবস্থায় মদ গেলাটাই সবচেয়ে উত্তম বলে মনে হলো।

বেয়ারা আরেক পেগ এনে টেবিলে রেখে গেল।

'হ্যালো, রাসেল...'

চমকে উঠলাম আমি। এ সময়ে কে ডাকে? যেদিক থেকে ডাক এলো, সেদিকে তাকালাম। দেখলাম হাসিমুখে এগিয়ে আসছে রিতা।

টেবিলের কাছে এসেই সরাসরি আমার দিকে তাকালো।

'সো, ইউ আর হিয়ার, মাই ডিয়ার...'

আমার গলা দিয়ে কোন কথা বের হলো না। অবাক হয়ে শুধু ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কোন রাগ নেই, কোন অভিমান নেই ওর মাঝে। এ যেন অনেক দিন পর দেখা পাওয়া কোন বন্ধুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাছে ডেকে নেয়া, দেখা পাওয়ার আনন্দে বিস্ময় প্রকাশ করা। অথচ আমি তো ওকে ভুলতেই বসেছিলাম। মাঝে মধ্যে দু'একবার মনে হওয়া পর্যন্তই—কোনরকম খোঁজ-খবর আমি কখনো নিইনি। কিন্তু রিতা যে আমার জীবনের একটা অধ্যায় তাতো আর মুছে ফেলতে পারি না। জীবন সংগ্রামে পর্যুদস্ত আমার মতো একটা যুবককে সে শুধু টেনেই রাখেনি, বেঁচে থাকার প্রেরণাও জুগিয়েছে প্রচুর।

শেলীর সাথে যেদিন আমার বিয়ে হলো তার আগের রাতে রিতার সাথে শেষ দেখা হয়েছিল। সে-রাতে রিতা ছিলো খুব শান্ত। খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে গ্রহণ করেছিল। এর আগে একদিন অবশ্য ওর সাথে রাগারাগি করে চলে গিয়েছিলাম। ও সেদিন বলেছিল ওকে বিয়ে করতে।

আমার চোখে তখন সৌভাগ্য গড়ার স্বপ্ন ছিল, রিতাকে বিয়ে করে সে-সম্ভাবনাকে নষ্ট করতে আমি রাজী ছিলাম না। শেষ দেখার রাতে রিতা ওসব নিয়ে কোন কথাই বলেনি।

হানিমুন থেকে ফিরে এসে আবার দেখা করবো বলে সে-রাতে ওর কাছ থেকে চলে এসেছিলাম। কিন্তু তা আর হলো কৈ। পারভীন এসে ওর কথা, সবার কথাই আমার মন থেকে সরিয়ে দিলো। সেই পারভীন এখন আমাকেও তাড়িয়ে দিলো ওর বাড়ি থেকে।

'তোমার কি খবর, ··রিতা'—তন্ময়তার ঘোর থেকে যেন আমি কথা বলে উঠলাম।

গালে টোল পড়া মিষ্টি হাসি হেসে রিতা আমার বাম হাতে একটা আঙুল ধরলো। আঙুলটা মোচড়াতে মোচড়াতে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকলো।

'আমাকে দেখে কি তুমি খুশি হওনি, রাসেল?'

'কি যে বলো, খুশি হইনি মানে? দেখছো না, খুশিতে মুখ দিয়ে কোন কথাই সরছে না। তোমাকে,—তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে, রিতা।'

'সত্যি বলছো, এতদিন পরেও কি আমি তোমার চোখে সুন্দরী আছি?'

'সে কি তোমাকে ভেঙে বলে দিতে হবে?'

'ওহ্, রাসেল—তুমি ঠিক আগের মতোই রয়েছ।'

'সে যাকগে, তা··· এখানে কি করছো?'

'বসের সাথে এসেছিলাম।'

'কোথায় তোমার বস?'

'এইমাত্র চলে গেলেন। আমিও ঘরে ফিরছি। তুমি কি এখন উঠবে?'

'তাই চলো, এখান থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যাই। এখানে কোন কথাবার্তা জমবে না।'

গ্লাসের বাকী হুইস্কিটুকু গলায় ঢেলে উঠে দাঁড়ালাম। বিল মিটিয়ে বার থেকে দু'জনে বেরিয়ে এলাম।

'এসো, গাড়িটা ওদিকে।' গাড়ির কাছে দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে যেতে যেতে অনেকদিন পর রিতাকে পাশে অনুভব করলাম।

গাড়িতে উঠে রিতা আমার পাশে বসলো।

'আমরা এখন কোথায় যাবো, রিতা?'

'অন্য কোথাও গিয়ে কাজ নেই, চলো আমার ঘরে।'

'সেই ভালো।'

'তুমি কি সেই আগের বাসাতেই আছো?'

'আগের বাসাতে আর নেই। এখন ফিরিঙ্গি বাজার এলাকায় চলে গেছি। চার্চরোডে ঈগলু লণ্ড্রীটার পাশের চারতালা বাড়িটায়।'

একটু চিন্তা করে রাস্তাটার ছক মনে মনে এঁকে নিলাম। তারপর ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে গাড়ি ছুটালাম সেদিকে।

'আমার ভাবতেও অবাক লাগে, রাসেল, কি করে আমাকে একদম ভুলে থাকতে পারলে? এমনি আরও তো বেশকিছু মেয়ের পাল্লাতেই তুমি পড়েছিলে, কিন্তু আমার কাছে তো

তুমি না এসে পারোনি। এ নিয়ে সোহেলী তো আমার সঙ্গে বিশ্রী সব কাণ্ড করতেও কম করেনি। শাকিলার কথা মনে আছে তোমার? ওর সঙ্গে দিন পনের বিশেক আগে বিপণী বিতানে দেখা হয়েছিল—তোমার কথা জিজ্ঞেস করলো। জানতে চাইলো তুমি এখন কোথায়, কি করছো। ওর তো ধারণা ছিলো, আমিই তোমাকে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। যখন বললাম, আমি তোমার কোন খবর জানি না, মনে হলো, বেশ উৎফুল্ল বোধ করল।'

'শাকিলা আবার একটু বেশি মাত্রায় স্নব। ওর মতো সুন্দরী এ তল্লাটে আর কেউ আছে বলে ও মনে করতো না।'

'ওটা কম বেশি সব মেয়েই ভাবে। সে যাকগে, তুমি একটা সত্যি কথা বল তো, রাসেল, আমার কথা কি এতদিনের মধ্যে একবারও তোমার মনে পড়েনি?'

ওর কাছ থেকে যে কথাটা শুনতে মন খচ্ খচ্ করছিলো সে-কথার ধার দিয়েও যাচ্ছে না রিতা। নিজের থেকে জিজ্ঞেস করতেও কেমন যেন বাধছে।

'মনে যে একদম হয়নি, তা বললে হয়তো মিথ্যে বলা হবে।'

'কৈ, তাহলে যে আমার কাছে তুমি এলে না? জানো রাসেল, আমার একটা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ছিলো, তুমি যেখানে যে জন্যেই মজো না কেন, আমার কাছে তুমি ফিরে আসবেই। তুমি এবার আমার সে বিশ্বাসটাকে ভেঙে দিয়েছ। মনকে বুঝ দিয়েছি, এ ভালোই হয়েছে। বিয়ে করেছ, আমার জন্যে

তোমার স্ত্রীর অমর্যাদা করো, তা আমি চাইতামও না। তবু সাধারণ বন্ধুত্বের দাবীতে সৌজন্যমূলক আচরণটা তোমার কাছ থেকে সব সময়ই আমি আশা করেছিলাম। আর কি আশ্চর্য দেখো, এতদিন পর তোমার সাথে আকস্মিক ভাবে দেখা হলো, মনে যথেষ্ট ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও সামান্য অভিমান-টুকুও আমি করতে পারলাম না।'

'আমরা কি এখন বাঁ দিকে যাবো ?'

'হুঁ, বাঁ দিকে গিয়ে আবার ডানে যাবে।'

'তুমি কি এতদিন এখানেই ছিলে ?'

'না, সেই তো ঢাকায় গিয়ে অনেকদিন কাটিয়ে এলাম। তুমি যখন হানিমুনে, আমি তখন ক্লিনিকে। শরীরের ওপর দিয়ে বেশ ধকল গেলো। বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। তাই কয়েক মাস ঢাকাতেই কাটিয়ে এসেছি।'

আমার দিকে তাকিয়ে রিতা ম্লান মুখে হাসলো। উদাস ওর চোখ দু'টো।

আমি যেন ওই হাসি দেখে হঠাৎ বদলে গেলাম। ওর চোখের দিকে তাকাতে বেশ বিব্রত বোধ করলাম।

'ঐ যে সামনের ল্যাম্প পোষ্টটার কাছে থামো।'

একটা সুন্দর ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালাম।

রিতা নেমে পড়লো।

'কি হলো, বসে রইলে যে ? নামো, ঘরটা দেখে যাও।'

'ভাবছি গাড়িটা এখানে রাখা ঠিক হবে কি না। বাড়ির ভেতরে কোথাও রাখার ব্যবস্থা নেই ?'

'তা আছে। এই একটু সামনে গেলেই একটা গেট পাবে। সে-পথে ভেতরে ঢুকেই দেখবে বাড়িটার গা ঘেঁষে খালি গ্যারেজ রয়েছে। ওখানে রাখতে পারবে গাড়ি। গাড়ি রেখে তুমি ওপরে এসো। চার তালায়, ডান দিকের ফ্ল্যাটটা। আবার দেখো, কেটে পড়বে না যেন।'

গাড়িটা ঢুকিয়ে সোজা গিয়ে দেখলাম বাড়িটার পাশ ঘেঁষে একটা খালি গ্যারেজ। গ্যারেজটা ব্যবহৃত খুব একটা হয় বলে মনে হলো না। গাড়িটা ওখানে রেখে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। গ্যারেজের দরজা বন্ধ করে সামনের দিকে এসে দেখলাম চারদিক। না, জায়গাটা ভালোই। রাতটা নির্বিঘ্নেই হয়তো কাটিয়ে দেয়া যাবে।

কি আশ্চর্য, আপনি নিশ্চয়ই ভেবে অবাক হচ্ছেন, শেলী মারা যাবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পারভীন আমাকে চৌধুরী ভবন থেকে তাড়িয়ে দিলো। অথচ ঐ পারভীনকেই একান্ত করে পাবার তাড়নায় আমি কি না করলাম। যে মেয়ে বিয়ে করবে বলে সমস্ত কাজেই সহজভাবে সহযোগিতা করে গেল, সেই কিনা চব্বিশ ঘণ্টায় চেহারা পাল্টে ফেললো। এখন কিনা শাহেদ খানই ওর কাছে একমাত্র পুরুষ।

পুলিশের ভয়ে নয়, পারভীনের হুমকীতে আমি ঘর ছাড়া। রাতটা কোথায় কাটাবো, রিতাকে পাওয়ার আগ পর্যন্ত তা মাথায়ই ছিল না। বারে বসে শুধু মদ গিলছিলাম আর গিলছিলাম। আকণ্ঠ গেলার পর হয়তো রাত কাটাবার জায়গার কথা ভাবা যেতো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান দিকের দরজায় নক করলাম।

ভেতরে ঢুকে প্রথম যেখানে দাঁড়ালাম সেটা হলো একটা ছোট্ট মতন বারান্দা। রেলিং দেয়া। কয়েকটা ফুলের আর পাতা-বাহারের টব, রেলিং-এর ধার ঘেঁষে শোভা পাচ্ছে। বারান্দার দরজা পেরিয়েই ড্রইং রুম। আসবাব-পত্রের মধ্যে নতুন কিছুই নেই। সোফা, বুক শেলফ, ডিভান—ওগুলো তো পুরনোই। নতুনের মধ্যে কয়েকটা বেতের গোলাকার মোড়া নজরে পড়লো। মোড়ার ওপর ছোট্ট গদিটা আবার সূচি কাজ করা সাদা কাপড়ের কভারে ঢাকা। ঠিক, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, সব কিছুতে ওই কাপড়ের কভার পরিপাটি করে দেয়ার ফলেই ড্রইং রুমটা আমার কাছে এত ঝক্‌ঝকে-তকতকে মনে হচ্ছে।

কিন্তু আমার চোখ আটকে গেলো আরেকটা নতুন জিনিসের ওপর। বুক শেল্‌ফের ওপর বেশ বড একটা কাঁচ ঘেরা পুতুল। হাতে তৈরি পুতুল। সাধারণ গেরস্ত ঘরের বৌ,—হাঁটু মুড়ে আসন করে বসে আছে। কোলে একটি শিশু। শিশুটার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে বৌটি। মা ও শিশু।

মনটা একরাশ বিষণ্ণতায় ভরে গেলো। বুকের মাঝে একটা অজানা ব্যথা যেন চিন্‌চিন্‌ করে উঠলো। এ অনুভূতি জীবনে আজ এই প্রথম হলো আমার। রিতা কি ওই পুতুলটা দেখাবার জন্যেই আমাকে ওর ঘরে নিয়ে এলো?

'কি হলো, রাসেল, এ ঘরে এসো?'

শোবার ঘর। ঘরটার চারিদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলাম—চমক দেবার মতো নতুন কিছু নজরে পড়লো না।

ড্রেসিং টেবিলের টুলে বসে ইউ ছাঁটে বব কাটা চুলে চিরুণী করছিলো রিতা। ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আয়নায় ওকে দেখলাম। মিষ্টি করে হাসলো রিতা।

এর মধ্যেই পোশাক বদলে ফেলেছে ও। একটা হালকা লাল প্রিন্টের সুতির শাড়ির সঙ্গে পরেছে লাল ব্লাউজ। হাত-মুখ ধুয়ে নিয়েছে। ওকে এখন বেশ সতেজ মনে হচ্ছে।

'তোমাকে পেয়ে খুব আনন্দ লাগছে, রাসেল।'

'তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আমিও খুব প্রশান্তি বোধ করছি. রিতা।'

উঠে দাঁড়ালো রিতা। আমার মুখোমুখি। সুন্দর চোখ দু'টো মেলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে।

আমি দু'হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে কাছে টানলাম।

'মনে হচ্ছে, রিতা, কত—কত যুগ পরে আমাদের দেখা হলো। সুদুর অতীত থেকে উঠে এসে যেন তুমি আমায় তাকিয়ে দেখছো।'

'অ-নে-ক অনেকদিন পর তুমি আমার কাছে এলে, রাসেল।' আমার বুকের ওপর ওর হাত দু'টো রেখে ঠোঁট নেড়ে হাসলো। আর সে-হাসিতে আমার মনে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো।

আমি আরও কাছে টানলাম রিতাকে।

'উঁহু', ছাড়ো।' আমার বুকের ওপর রাখা হাত দু'টো দিয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে রিতা নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো। 'আগে তোমার কথা বলো।'

আমি ধাক্কা সামলাবার ছলে দু'পাক ঘুরে বিছানায় গিয়ে

বসলাম। ঘরের চারদিকে তাকাতে তাকাতে উদাস সুরে বললাম, 'আমার খবর ভাল নয়।'

'ভাল নয়—মানে খারাপ, এই তো ?' বিছানায় আমার পাশে বসলো রিতা।

'খুব খারাপ। শেলী মারা গেছে।'

কাগজে দেখেছি।'

'তখন আমার কথা তোমার মনে হয়নি ?'

'হয়েছে।' আমার পাশ থেকে অলস ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে রিতা জানালার পাশে দাঁড়ালো। 'মনে হয়েছে, এখন তোমার পোয়া বারো। শেলীর কোটি কোটি টাকার মালিক এবার তুমি। তাই না, রাসেল ?' জানালার পাশ থেকেই ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো রিতা।

'আমাকে সামান্য ফ্ল্যাট বাড়ি দিয়েছে সে। আর বাকী সবই দিয়ে গেছে অন্যকে।'

'সত্যি ? তাই কি কখনো হয় ?'

'কিন্তু এ ক্ষেত্রে হয়েছে। বাদ দাও ওসব। অন্য কথা বলো।'

'কি খাবে, রাসেল ?' রিতা গা ঝাড়া দিয়ে নিজেকে সহজ করে নিলো। 'অনেকদিন পর এলে—বলো, তোমার পছন্দ মতো কিছু করে খাওয়াবো।'

'এমন কিছু করো, যাতে রাতটা দিব্যি কেটে যায়।'

'তার মানে ?' কপট ভঙ্গিতে তাকালো ও।

'তার মানে খুব সহজ—রাতটা তোমার এখানেই কাটাবো।'

'আমি কিন্তু সেজন্যে তোমাকে ঘরে নিয়ে আসিনি।'

'আমি কিন্তু সেজন্যেই হুট করে এক কথায় রাজী হয়ে চলে এসেছি।' নির্বিকার ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলাম।

'হেসো না, তোমার লজ্জা থাকা উচিত। মনে করে দেখো, এর আগে একদিন এসেছিলে, মেজাজ দেখিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলে। আমার সামান্য অনুনয়টুকুও শোননি। সেদিন শেলীর টাকার স্বপ্নে তুমি এতই আচ্ছন্ন ছিলে, আমার হৃদয়ের আকুল কান্না তোমাকে একটু ছুঁতেও পারেনি। আর আজকে বুঝি…'

'রিতা, তুমি কি—'

'আমাকে বলতে দাও, রাসেল। আমি কি একটা মেয়ে নই? সমাজের অনেকের চোখেই আমি খারাপ হতে পারি, কিন্তু আমারও তো একটা মন আছে, অনুভূতি আছে, তুমি—তুমি, কি তা জানতে না? আমি আজ সমস্ত জ্বালা বুকে পুষে তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কেন? আমি কি তোমার কোন ইচ্ছে পূরণ করতে বাকী রেখেছিলাম? কিন্তু তুমি আমাকে অবহেলা ছাড়া আর কি দিয়েছ? অনেক সুখের তারে বাঁধা বুক আমার, তছনছ করে দেয়া ছাড়া আর কি পেয়েছি তোমার কাছ থেকে?' হঠাৎ থেমে হাঁপাতে থাকলো রিতা।

অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। রিতা তো এমন ছিচ্‌কাঁদুনে ছিল না? এ যে দেখছি, এখনই কেঁদে ফেলবে?

আমি উঠে দাঁড়ালাম। পায়ে পায়ে ওর কাছে গিয়ে ওর চোখে চোখ রাখলাম।

'আমাকে তোমার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে যদি তুমি শান্তি পাও তবে আমি নিজেই চলে যাবো। আর কোনদিন আসবো না।' ওর আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে আমি খুব দৃঢ়তার সাথে ওকে মোকাবেলা করতে চাইলাম। 'তবে সে-কথা তোমার নিজের মুখে বলতে হবে।'

'তুমি বড়ো নিষ্ঠুর, রাসেল—খুবই নিষ্ঠুর। তা নাহলে ভাবী সন্তানের দায়িত্ব শুধু আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে অমন করে কেটে পড়তে পারতে না!' ওর চোখ থেকে টপ্‌টপ্‌ করে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে শুরু করলো।

বুঝলাম, নিজের সন্তান উপায়হীন হয়ে নষ্ট করে ফেলার জ্বালা রিতা এখনও ভুলতে পারেনি। বিশেষ করে এই প্রথম বারের মতো আমাকে পেয়ে তা আরও উথলে উঠেছে।

চোখের জলে ভেজা মুখটা চিবুক ধরে ওপরের দিকে তুলে ধরলাম। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ওর ঠোঁটে আলতো করে চুমো খেলাম।

ভেজা চোখ দু'টো তুলে আমার দিকে তাকালো রিতা। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার বুকে। মনের সমস্ত জমে থাকা ক্ষোভ দূর করতে কেঁদে উঠলো ফুঁপিয়ে।

'আমার খুব কষ্ট হয়, রাসেল—কখনো জানতে চাইলে না, আমার বুকে—জমে আছে কতো, কতো ভালোবাসা—কতো কান্না।'

আমি ওকে আরো জোরে বুকের সাথে চেপে ধরে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলাম।

প্রাতঃরাশের টেবিলে বসে হাসি মুখে রিতার দিকে তাকিয়ে আছি। রিতার চোখে মুখেও এখন অনাবিল প্রশান্তির হাসি।

ভোরের প্রসন্ন আলোয় ভালো করে ওকে দেখতে থাকলাম। ওর চেহারার কোমল পেলবতায় একটা কালো ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওর লাবণ্যে যেন এখন অনেক খুঁত স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান। এ কি শুধুই বয়সের ছাপ? না ওর লাগাম ছাড়া জীবন যাত্রা—মদ খাওয়া-রাত জাগার ধকল ওটা?

'আমি একটা কথা জানতে চাইবো, সত্যি বলবে, রাসেল?' হঠাৎ প্রশ্ন করলো রিতা।

'কথাটা কি?'

'তুমি কি আর কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছো?'

আমার প্লেটে তুলে দেয়া ডিমের হালুয়াটা খুব তৃপ্তির সাথেই খাচ্ছিলাম। প্লেটের দিকে চোখ রেখে বললাম, 'তোমার হঠাৎ এ ধরনের কৌতূহল?'

'আমি কয়েকদিন আগে অফিসের কাজে ঢাকায় গিয়েছিলাম। ঢাকায় থাকতে এক রাতে একট স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্নই বলতে পারো…। সে-কথা পড়ে বলছি, তার আগে তুমি বল, কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছ কিনা?'

'তুমি এমন করে কথার জাল তৈরি করো যে…'

'আহ্, বলেই ফেল না। আমার কাছে ওসব ব্যাপারে

তোমার ভূমিকা করার কোন মানে হয় না। মেয়েটা কে?'

'শেলীর সেক্রেটারী, পারভীন। মেয়েটার প্রতি আমার একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল।' থেমে গেলাম আমি। ভাবলাম, রিতাকে সব কথা বলা কি ঠিক হবে?

'তুমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, ওতে তোমার প্রতি আমার আগ্রহ বিন্দুমাত্র কমবে না।'

'তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, মেয়েটাকে ভালবেসে আমার মনে হয়েছিল, আমি হয়তো আর কাউকে তেমন প্রচণ্ড ভাবে ভালবাসতে পারিনি। ওকে পাওয়ার প্রবল কামনা-বাসনা যাই বলো, অন্য কারো বেলায় তা কখনো এমন প্রচণ্ড ভাবে··· বোধ করিনি।'

'মনে হচ্ছে ডুবেছিলে ভালই। তা শেষ পর্যন্ত কি হলো?'

'সম্পর্ক যে কদিন বজায় ছিলো বেশ গরম গরম কেটেছে। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম। মেয়েটা প্রথম সুযোগেই ভালবাসার মূলে কুড়াল চালিয়েছে।' বলতে বলতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম।

'আহারে, বেচারা রাসেল!'

চোখ তুলে রিতার দিকে তাকালাম।

'মানে?'

'খুব সোজা। সব সময় তো তুমিই কেটে পড়তে অভ্যস্ত, এই তো বোধ হয় প্রথম উল্টো তোমার কপালে ঘটলো। আকাঙ্ক্ষা যেখানে প্রবল, সেখানে নিরাশ হওয়ায় খুবই ব্যথা বাজে, তাই না, রাসেল?'

'তোমার হলো কি বল তো ? এই সাত সকালে আবার শুরু করবে দেখছি।'

'তোমাকে বলেই কি লাভ, আমি তো এখন নিজেকে দিয়েই দেখছি। আগে তোমার জন্যে সবাইকে উপেক্ষা করেছি, আটকা পড়লে সব সময়ই এড়িয়ে বা পালিয়ে এসেছি। কিন্তু এখন আমাকেই সবাই উপেক্ষা করে, প্রথম সুযোগেই পালিয়ে যায়—আমি তো আর আগের মতো সুন্দরী নই।'

'তোমাকে অমন কথা কে বলেছে ?'

'অন্য কেউ আর বলায় কি দরকার, আমি তো তোমার চোখেই দেখতে পাচ্ছি—সারা সকাল ধরেই তো তুমি আমাকে দেখছো। তোমার দেখার ধরন দেখে আমার স্পষ্ট মনে হচ্ছে, তুমি আমার কবরের ওপর ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছো।'

'তোমার কথার নমুনায় সত্যি গা জ্বলে।'

'যা সত্যি, তাই বললাম। আমার রূপে ভাটার টান পড়েছে—তা আমি জানি।' উঠে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের টুলটায় বসলো রিতা। আয়নায় নিজেকে বেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। 'রাসেল, তুমি যে আমাকে ওভাবে দেখছো, তাতে আমার মোটেও দুঃখ নেই। সত্যকে মেনে নেবার মনোবল আমার আছে। কিন্তু···রাসেল তুমি না ভীষণ—কাল রাতে যেন একটা দানব হয়ে উঠেছিলে।' আয়নার কাছে গালটা রেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো সে।

'ছাড়ো ওসব। তোমার কফি কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো রিতা। আমার দিকে তাকালো। ওর চোখে মুখে রহস্যময় হাসির ছটা।

'তা রাসেল, মেয়েটা কি খুব সুন্দরী ছিলো ?'

'সব কিছু মিলিয়ে সুন্দরী অবশ্য বলা যায়, তবে—অপরূপা তেমন কিছু নয়। আমি তো তোমাকে আগেই বললাম, ওই মেয়েটার মধ্যে এমন কিছু ছিলো, যা অন্য কোন মেয়ের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। এমন একটা বিশেষত্ব, যা কোন ভাষাতেই প্রকাশ করা যায় না।'

'তুমি সে মেয়ের সৌন্দর্যের যতই প্রশংসা করো না কেন, তার গলার স্বর কিন্তু মোটেও ভালো নয়—আমার একদম পছন্দ হয়নি। গলা শুনে মনে হলো, তোমার সেই সুন্দরী প্রেমিকাটি খুব কড়া মেজাজের মেয়ে। আমার অনুমান ঠিক না, রাসেল ?'

'তা তুমি ঠিকই ধরেছ—মেজাজ খুব কড়া।'

রিতার কথায় আমার হঠাৎ করেই খটকা লাগলে,। সাথে সাথেই ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'সে মেয়ের গলার স্বর—কখন শুনলে তুমি ?'

'টেলিফোনে। সেই যে স্বপ্নটার কথা বলছিলাম—একটা মেয়ে তোমাকে হাত ধরে একা অন্ধকার গুহার দিকে নিয়ে চলেছে। তুমি সে মেয়ের সাথে খুব স্বচ্ছন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছো। আমি পেছন থেকে কত কাকুতি মিনতি করে ডাক-লাম—আমার কথায় কোন ভ্রূক্ষেপই তুমি করলে না। সে মেয়ে তোমাকে নিশ্চিত অন্ধকার মৃত্যুর মাঝে—গুহায় ঢুকতেই আমি তোমার নাম ধরে চিৎকার করে উঠেছিলাম। আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। স্বপ্নটা দেখেছিলাম শেষ রাতে, বাকী রাতটা আর ঘুমোতে পারিনি। তোমার অমঙ্গল চিন্তায় আমি শুধু বিছা-

নায় ছট্‌ফট্‌ করেছি। দিনের আলোতেও স্বপ্নের রেশটা আমার মন থেকে দূর হয়নি। বাকী দিন-ক'টা ঢাকায় বেশ অস্বস্তিতে কাটিয়েছিলাম। এতদিন পরও ঐ স্বপ্নটাই তোমার সম্পর্কে আমাকে অস্বাভাবিক রকম বিচলিত করে তুলেছিল। তাই পরশু রাতে এখানে পৌঁছেই তোমাকে টেলিফোন করেছিলাম। তোমার সঙ্গে কথা বলে মনে স্বস্তি ফিরে পেতে চেয়েছিলাম।'

'তুমি ফোন করেছিলে? কি আশ্চর্য দেখো দেখি, সে কথা তো কেউ আমাকে বলেনি।'

বুকের আঁচলটা ঠিক করতে করতে রিতা বললো, 'না বললেও তাকে অবশ্য তেমন দোষ দেয়া যায় না।

'কারণ তুমি তোমার নাম-ধাম পরিচয় জানাওনি।'

'সে-সৌভাগ্য আমার হয়নি। তুমি বাড়িতে নেই বলেই টেলিফোনটা রেখে দিয়েছিলো। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সে আমাকে মিথ্যে বলেছে। আমি তোমার কথা যখন জিজ্ঞেস করছিলাম তখন শুনতে পাচ্ছিলাম, তুমি কোন কিছু ডিক্টেশন দিচ্ছো। মেয়েটা অমন ডাহা মিথ্যে বলবে—'

আমার সারা শরীর একটা ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় শীত শীত করে উঠলো।

'কি বললে তুমি, আমি ডিক্টেশন দিচ্ছিলাম? তুমি কেমন করে বুঝলে?'

চোখ দু'টো বিস্ফারিত করে রিতা আমার দিকে তাকালো। 'তুমি হঠাৎ অমন করে আঁতকে উঠলে কেন, রাসেল?' রিতা উঠে দাঁড়ালো। 'চলো ড্রইং রুমে গিয়ে বসি।'

সোফায় বসেই রিতা আবার আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। আমি ওর পাশে বসে পড়লাম।

'কই বললে না তো, কেমন করে আমার গলার স্বর বুঝলে?'

'এটা কোন কথা হলো, রাসেল? তোমার গলার স্বর চিনতে আমার বেগ পেতে হবে, তাও কি তুমি ভাবতে পারছো?'

'কবে টেলিফোন করেছিলে বললে?'

'এই তো ঢাকা থেকে ফিরেই। কিন্তু এ নিয়ে এত উত্তেজিত হয়ে উঠছো কেন? আমি তো তোমাকে দোষারোপ করছি না। তুমি সুস্থ আছো বুঝতে পেরেই আমি খুশি হয়েছিলাম।'

'বাজে কথা রেখে আমার কথার জবাব দাও।' গলাটাকে সংযত রাখার চেষ্টা করেও পারছি না। 'আমি সঠিক জানতে চাই, তুমি কবে টেলিফোন করেছিলে।'

আমার চোখে মুখে কথায় উত্তেজনা দেখে, মনে হলো, রিতা ভয় পেতে শুরু করেছে।

'আমি সত্যি দুঃখিত, রাসেল। ব্যাপারটাকে তুমি এমনি উত্তেজনার দিকে ঠেলে দেবে জানলে আমি তোমাকে কিছুতেই টেলিফোন করতাম না। তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছো এই ভেবেই সন্তুষ্ট থাকতাম।'

হঠাৎ ওর কাঁধ দু'টো শক্ত করে চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিলাম। সোফার পেছন দিকে ওকে ঠেসে ধরে চিৎকার করে উঠলাম, 'রিতা, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি কবে ফোন করেছিলে?'

'রাসেল, ছাড়ো আমাকে, বলছি শোন, মানে—এই তো গত

রাতের আগের রাতে।' রিতাকে অসম্ভব রকম ভীত দেখালো।

গত রাতের আগের রাতে—যে রাতে আমি শেলীকে খুন করেছি।

'ক'টার সময় ফোন করেছিলে?'

'ধরো ন'টার ওদিকে।'

'ওভাবে আমি জানতে চাই না। ঠিক সময় বলো।'

আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো রিতা। ও যেন চিন্তা করে কিছুই খেই পাচ্ছে না।

'সময়টা ঠিক করে বলতে পারছো না? যত্তোসব'—আমি ওকে সোফার সঙ্গে আরও চেপে ধরলাম। 'সময়টা মনে করার চেষ্টা করো।'

'রাসেল, ছাড়ো প্লিজ, আমি ব্যথা পাচ্ছি। আমি বুঝে উঠতে পারছিনা, তুমি অমন করছো কেন? আমি তোমার কি করেছি?'

'বুঝে কোন কাজ নেই। বলো, ঠিক কোন্ সময়ে ফোন করেছিলে?' দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলাম।

'ন'টার পরেই হবে—তখন সময় ছিলো ধরো প্রায় ন'টা কুড়ি।'

'তুমি যা বলছো, মানে—আমাকে ডিক্টেশন দিতে ঠিক শুনেছ?'

'ঠিক শুনেছি। তুমি কিন্তু, রাসেল, আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিচ্ছো। আমি শুনে ফেলার জন্যে সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে কি?'

'আহ্ থামো। তুমি—তুমি রিতা আমাকে ফোন করেছিলে গত পরশু, রাত ন'টা কুড়ির সময়, তাই না?'

সোফার পেছনের সাথে ঠেসে থাকা ঘাড়টা অল্প নাড়লো রিতা।

'টেলিফোন কে রিসিভ করেছিলো?'

'মনে হয় তোমার সেই—সেই মেয়েটা, যাকে তুমি…'

'বলো একজন মহিলা সাড়া দিয়েছিলো—ঠিক?'

'ঠিক।'

'তুমি তাকে কি বলেছিলে?'

'টেলিফোনটা রং নাম্বার হলো কিনা নিশ্চিত হয়ে আমি তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

'উত্তরে সে কি বলেছিলো?'

'বলেছিলো, তুমি বাইরে গেছো।'

'অথচ তুমি আমার কথা শুনতে পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, তোমার কথা টেলিফোনে আমার কানে আসছিলো। যা দু'চার কথা শুনেছিলাম, তাতে মনে হয়েছিলো, তুমি হয়তো ব্যবসা সংক্রান্ত কোন জরুরী চিঠি ডিক্টেট্ করছিলে। আর তা মনে করেই তোমাকে আর বিরক্ত করতে চাইনি। ফোন ছেড়ে দিয়েছিলাম—বুঝলাম মেয়েটি বেশ চতুর।'

আমার সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে গেলো। ওকে ছেড়ে দিয়ে সোফায় শরীর এলিয়ে দিলাম। আমার শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমন করতে থাকলো, মনে হলো, আমি বুঝি তৎক্ষনাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলবো।'

'রাসেল, কি হলো তোমার? তুমি অমন ঘেমে উঠলে কেন?'

'চুপ করো।'

'তুমি কি অসুস্থ বোধ করছো, রাসেল?' রিতা বেশ আগ্রহ নিয়ে অবস্থা বুঝতে আমার দিকে ঝুঁকে পড়লো।

'ওহ্! অসহ্য তোমার প্যানপ্যানানি, বন্ধ করবে?' আমাকে দাঁত খিঁচিয়ে খেঁকিয়ে উঠতে দেখে আবার পিছিয়ে গেলো রিতা।

তারপর মুহূর্ত মাত্র চিন্তা করে লাফিয়ে উঠে চলে গেল শোবার ঘরে। আমি আলমারী খোলার শব্দ শুনলাম।

হুইস্কির বোতল আর একটা গ্লাস নিয়ে আবার ড্রইংরুমে ঢুকলো রিতা।

রিতার এই একটা গুণ আমার খুব ভালো লাগে। জরুরী অবস্থার মোকাবেলা কিভাবে করতে হয় তা ও ভালো ভাবেই জানে। গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে গ্লাসটা আমার হাতে তুলে দিলো। আমি নির্জলা তা গলায় ঢেলে দিলাম। আমার কাঁপা হাতে গ্লাসটা রিতা ধরিয়ে না দিলে আমি হয়তো সে-গ্লাস নিজের হাতে তুলে মুখের কাছে নিতে পারতাম না। অজানা কোন অতলে ডুবে যাবার হাত থেকে যেন রিতা আমাকে হাত ধরে তুলে আনলো।

'রাসেল, রাসেল—কথা বলো, রাসেল!' রিতা আমার গা ধরে মৃদু নাড়া দিলো।

হুইস্কিটা আমাকে চাঙ্গা হয়ে উঠতে বেশ সাহায্য করলো।

আমি বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে তাকালাম। আমার মনের এলোমেলো ছুটে বেড়ানোর পাগলা ঘোড়াটা যেন স্থির হয়ে এসেছে।

'তুমি আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে? কিন্তু ব্যাপার কি? ওভাবেই বা তাকাচ্ছো কেন?'

'ঠিক বলছো রিতা, তুমি আমাকে চিঠি ডিক্টেট্ করতে শুনেছিলে?'

'হ্যাঁ। যার কথা শোনার জন্যে আমার মন উদ্বেগে ভরা ছিলো, তার কণ্ঠ শুনতে আমার ভুল হবার কথা নয়।'

'কিন্তু আমি কথা বলছিলাম, আর—মেয়েটা কিনা বললো, আমি বাইরে গিয়েছি।'

'তাই বললো। অবশ্য ওর ওই কথায় আমি তেমন অবাক হইনি। টেলিফোনে আমি তোমার কথা জানতে চাওয়ার পর ওই মেয়ের কাছ থেকে এর বেশি কিছু আশা করা যায় না। টেলিফোনের এ প্রান্তে একটা মেয়ের গলা শুনেই কিনা জানি না, মেয়েটির কণ্ঠস্বরে কিন্তু তাকে বেশ বিচলিত মনে হচ্ছিল। তবে কথা বলার সময় গলার স্বর বেশ স্পষ্ট ছিল।'

'তা থাক···কিন্তু'—আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'আমাকে একা একা একটু চিন্তা করতে দাও, রিতা।'

একটু দূরে সামনের সোফায় গিয়ে বসলো, রিতা। আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো অপলক। ওর চোখ মুখ থেকে ভয়ের রেশ কাটেনি তখনো।

আর আমি, কিছুই চিন্তা করতে পারছি না।

একটা কথাই বার বার আমার মনে ঘুরে ফিরে আসছে—কথাটা বলেছিলো কবীর হোসেন। এক বিকালে কফি খেতে খেতে কোন এক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কথাটা এসেছিলো। কবীর হোসেন খুব দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলো, 'বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোন লোক যখন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকে, অন্যকে হিসাবের মধ্যে গণ্য করতে চায় না, তখনই তাকে কুপোকাৎ করার জন্যে জুৎসই ঘুষি মারা সহজ। আপনি যদি কথাটা মনে রাখেন, তবে এর প্রমাণও ভুরি ভুরি পেয়ে যাবেন। আমার দীর্ঘদিনের চাকুরীতে আমি এমনটা বারবার ঘটতে দেখেছি। মনে করুন, কোন লোক হয়তো একটা খুন করলো। বিস্তর ঝক্কি ঝামেলা সামাল দিয়ে নিজেকে বোঝালো, আর ভয় নেই। অথবা ঘটনাকে এমন সুচারু ভাবে সাজালো যেন খুব সহজেই মনে হবে খুনটা অন্য কেউ করেছে। তখন সে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে নিজেকে নিরাপদ ভাবতে থাকে। কিন্তু ওখানটায়ই একজন খুনী ভুল করে বসে। আসলে সে লোক মোটেও নিরাপদ নয়। বরঞ্চ নিজেকে নিরাপদ ভাবতে গিয়ে কড়া ঘুষি খাবার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে রাখে। যা কখনো সে চিন্তা করেনি তেমন একটা পথ ধরেই সে হঠাৎ দেখবে প্রচণ্ড ঘা এসে তাকে ধরাশায়ী করে দিয়েছে।'

কবীর হোসেনের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আমি ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগলাম। ভয়ঙ্কর একটা থাবা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। সে থাবাকে প্রতিহত করার শক্তি আমার নেই।' ভয় আমাকে ক্রমশঃ গ্রাস করে ফেলছে।

আমি যেন ঠিক মতো শ্বাস নিতেও পারছি না।

'রাসেল, কি হলো তোমার? আমাকে বলো না? তোমাকে আরেকটু হুইস্কি দেবো?'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকালাম। আমার তাকানো দেখে ও ভীষণ ভড়কে গেলো। হুইস্কি দেবার জন্যে উঠতে চেয়েছিল, কিন্তু সাহস পেলো না। অসহায়ের মতো বললো, 'আমি কি করেছি যে তুমি ওভাবে তাকাচ্ছো?' ওর কথাগুলো কান্নার মতো শোনালো।

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ওর কাছে এগিয়ে গেলাম।

'কি করেছ জানতে চাও—বিচ্ছু ডাইনী কোথাকার?' আমি দাঁত কিড়কিড় করে উঠলাম।

'রাসেল!' প্রায় আর্ত চিৎকার করে উঠলো রিতা।

'আমার পেছনে লাগা তোমার অভ্যেস। আর তা করতে গিয়েই তুমি—তুমি আজ আমার সব কিছু ধূলিসাৎ করে দিয়েছো। আমাকে ধ্বংস না করে তুমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলে না। জাহান্নামের শয়তান তুমি।'

'রাসেল, তুমি এসব কথা বলতে পারছো? তুমি সত্যি একটা পাষণ্ড,—নীচ। আমি—আমি তোমাকে—'

হতভম্ব রিতা উঠে দাঁড়ালো।

আমি প্রচণ্ড আক্রোশে কষে এক চড় বসিয়ে দিলাম ওর গালে।

আকস্মিক এ আঘাতের জন্যে তৈরি ছিল না রিতা। টাল সামলাতে না পেরে সোফার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে গড়িয়ে

পড়লো। বব ছাঁটা চুলগুলো ছিটকে এসে ওর মুখটা ঢেকে ফেললো।

ওর দিকে আর ফিরেও তাকালাম না। এমন কি শোবার ঘর থেকে আমার টুপিটা না নিয়েই এক ঝটকায় দরজা খুলে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। মনে হলো, কে যেন তাড়া করছে আমাকে, আর আমি প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছি। পালাচ্ছি আর পালাচ্ছি। কিন্তু পালাবার জায়গা কি আছে আমার? সমস্ত পথ যে আমি নিজ হাতেই বন্ধ করে ফেলেছি। কিন্তু তবু আমাকে বাঁচতে হবে—পালিয়েই বাঁচতে হবে। যেমন করেই হোক, পালাবার সে-পথ আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে। খুব দ্রুত সে পথে আমাকে পাড়ি জমাতে হবে। কিন্তু তার আগে আমাকে আরও কয়েকটা কাজ শেষ করে নিতে হবে। তা করতে গিয়ে এ অবস্থায় নিজের ওপর ঝুঁকি এসে যাবে বটে, তবু তা সমাধা না করলে সবই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সাত

সকাল সাড়ে ন'টা। রাস্তায় এর মধ্যেই লোকজনের বেশ ভিড়। কর্মব্যস্ত লোকেরা ছুটে চলছে যে যার কাজে। জীবনের একেকটা দিন সবার কাছেই মূল্যবান। বাঁচার তাগিদে কিছুতেই থেমে থাকা যাবে না। ছুটে চলাই যেন এখানে জীবন। সে-জীবন স্রোতে আমিও নিজেকে হারিয়ে দিলাম। মিশে গেলাম চলমান লোকের মিছিলে।

আমি চলছি আর ডানে বাঁয়ে সামনে সতর্ক দৃষ্টি রাখছি। পুলিশ যে এর মধ্যেই আমাকে খুঁজতে শুরু করেছে সে-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। এখন প্রতি পদে পদে আমার বিপদ। সাবধান না থাকলে সে-বিপদ এসে যে কোন সময় আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। গাড়িটা রিতার বাড়ির ঐ গ্যারেজে রেখে আসা ভালোই হয়েছে। পুলিশ যখন আমাকে খুঁজবে, তখন ঐ ডাটস্যানটাই তারা প্রথম খুঁজবে। সে ক্ষেত্রে গাড়িটার গাঢ় তামাটে আর সাদা রং সহজেই ওদের চোখে পড়বে।

একটা চশমার দোকান পেয়ে চট্ করে সেখানে ঢুকে পড়লাম। সবুজ রং এর সানগ্লাস কিনে ফেললাম। পুলিশের চোখ এড়িয়ে থাকার জন্যে এটা অবশ্য তেমন কোন কাজে আসবে না জানি, তবু পথে ঘাটে সানগ্লাসটা আমাকে যথেষ্ট নিরাপত্তার অনুভূতি এনে দেবে। এখন মনে হলো, রিতার ঘর থেকে আসার সময় আমি একটা মস্ত ভুল করে এসেছি—টুপিটা নিয়ে আসা উচিত ছিলো।

রিয়াজউদ্দিন মার্কেটের কাছে একজনের সাথে দেখা করলাম। মিনিট দশেক আলাপ আলোচনা করে সেখান থেকে বের হয়ে এলাম।

তারপর পোস্ট অফিসে গেলাম। টেলিফোন করলাম মাইকেলকে। রিসিভারটা কানে চেপে পোস্ট অফিসে অন্যদের ওপর চোখ বুলালাম। টেলিফোনের অপর প্রান্তে রিসিভার উঠানোর শব্দ শুনতে পেলাম।

'হ্যালো, মাইকেল বলছি।'

'আমাকে চিনতে পারছো, মাইকেল?'

'আপনি ব্যাঙ্কে থাকতে ফোনে এত কথা বলেছি যে, এখন চিনতে ভুল হবার কথা নয়, স্যার।'

'ধন্যবাদ, মাইকেল। এখন সে কোথায় আছে?'

'একটু ধরতে হবে, স্যার। আমি ফাইলটা দেখে আপনাকে বলে দিচ্ছি।' মাইকেলের গলা থেকে বিনয় ঝরে পড়লো।

পোস্ট অফিসের উঁচু কাউন্টারের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে আমি প্রতিটা লোকের ওপর লক্ষ্য রাখছি। আমার বুকটা দ্রুত

লাফাচ্ছে। যতই দেরি হচ্ছে, ততই আমার গলাটা শুকিয়ে উঠছে। ঘেমে উঠছে হাতের তালু দু'টো। রিসিভারটাকে ঠিক মতো কানে ধরে রাখার শক্তিটাও যেন আমি পাচ্ছি না। হাতটা বেশ কাঁপছে। কোন লোক আমার দিকে তাকালেও আমি কেঁপে উঠছি। সবার দৃষ্টিকেই আমার মনে হচ্ছে পুলিশের চোখ। পুলিশের চোখ নিশ্চয়ই খুঁজছে আমাকে।

'হ্যালো, স্যার, শুনুন। গতরাতে আপনি চলে আসার পর-পরই তিনি সে বাড়ি থেকে চলে গেলেন। যাবার সময় তিনি বিরাটাকৃতির একটা স্যুটকেস নিয়ে গেছেন। তিনি এখন এশিয়ান হাই-ওয়েজের পাশে নতুন হোটেল শাহ্‌জাদাতে আছেন।'

'এখনও কি সে হোটেল শাহজাদাতেই আছে?'

'আছেন। এই তো কিছুক্ষণ আগে তার ঘরে তাকে সকালের খাবার পাঠানো হয়েছে।'

'কত নাম্বার ঘরে সে আছে?'

'২৬০, দোতলায় সামনের দিকে।'

'ধন্যবাদ, মাইকেল। না বলা পর্যন্ত নজর রেখে যাও। মনে রেখো, আমি ওকে হারাতে চাই না।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যার।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম। হাত দু'টো রুমালে মুছে সিগারেট ধরালাম। এখন খুব দ্রুত কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। হাতে সময় অত্যন্ত কম। তার ওপর পুলিশের চোখ তো ঘুরছেই। সানগ্লাসটা চোখে দিয়ে পোস্টঅফিস থেকে বের হয়ে রাস্তায় এলাম। একটু দাঁড়াতেই একটা খালি বেবী

ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম।

'হোটেল শাহজাদা—।'

শহরের নতুন এবং দামী হোটেল। মাত্র কয়েকদিন আগে ওপেন হয়েছে। এশিয়ান হাইওয়েজের মতো গুরুত্বপুর্ণ রাস্তার ওপর আধুনিক সুবিধাদি সম্পন্ন ঝকঝকে হোটেলটি খুবই আকর্ষণীয়। রাস্তার মোড় ঘুরতেই হোটেলটা নজরে এলো। বেবী থামাতে বললাম।

বেবীর চালক আমার দিকে কিছুটা বিস্ময় নিয়ে তাকালো।

'আমি এখানেই নামবো।' পয়সা মিটিয়ে দিলাম ওর। হোটেল শাহজাদা তখনও তিন-চারশো গজ দুরে।

ধীর পায়ে হেঁটে হোটেলের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার মাঝে কোন চঞ্চলতা প্রকাশ পাক তা আমি চাইছি না। হোটে-লের সামনে অনেক গাড়ির ভিড়। প্রধান দরজার সামনে এক-দল বিদেশী। লেবাস দেখে মনে হলো ওরা টুরিস্ট। হোটেলের উর্দি পরা কয়েকজন বয়-বেয়ারার সাথে ওরা কি সব যেন বলাবলি করছে। আমি ওদের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। দরজার সরাসরি সামনে রিসেপশন কাউন্টার। সেখানে বসে আছে মাঝ বয়সের এক ভদ্রলোক। আমার দিকে একবার তাকালো। আমি শিউরে উঠলাম, লোকটার তাকানোটা কি সাংঘাতিক রকম শীতল। আমি সিঁড়িটা খুঁজে পেয়ে নির্লিপ্ত ভাবে অন্যদিকে চোখ ফিরালাম। বাঁ দিকে সুন্দরভাবে সাজানো লাউঞ্জ। লাউঞ্জের শেষে একটা কিউরিও সপ। তার পাশেরটা হস্তশিল্পের। কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। ডানদিকে সিঁড়িটার

ওপর চোখ পড়লো। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতেই সেদিকে এগোলাম। ধীরসুস্থে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকলাম। সিঁড়িটা নির্জন, তাই হয়তো বেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস আমার বুক থেকে হঠাৎ বের হয়ে এলো। সানগ্লাসটা খুলে হাতে নিলাম। একজন বেয়ারা অতিব্যস্ততার সাথে দ্রুত পায়ে আমাকে পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে গেলো।

সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে দোতলার বারান্দায় পা রাখতেই ডান বাঁয়ে তাকালাম। নাহ্, কেউ নেই। সামনের দেয়ালে গাঁথা নাম্বারের ছোট প্লেটটা পারভীনের ঘরের দিকটা আমাকে জানিয়ে দিলো। বুকটা টনটন করে উঠলো। পারভীনের সাথে চূড়ান্ত মোকাবেলার কাজটা এখনই সেরে ফেলতে হবে। আর সময় পাওয়া যাবে না। কারণ আমাকেও যে বাঁচতে হবে।

সোনালী অক্ষরে ২৬০ নাম্বারটা দরজার ওপর আটকানো দেখেই দাঁড়ালাম। দরজায় টোকা দিলাম। আবার লম্বা বারান্দাটায় চোখ রাখলাম, কাউকেই নজরে এলো না।

'কে?' ঘরের ভেতর থেকে পারভীনের গলা ভেসে এলো। ওর গলার স্বর আমাকে খুব দ্রুত সামলে নিতে সাহায্য করলো।

'আপনার টেলিগ্রাম, মিস পারভীন।' নিজের গলাকে যথাসাধ্য মোলায়েম রাখতে চেষ্টা করলাম।

ঘরের মধ্যে নাড়াচাড়ার শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম কাজ হয়েছে। পারভীন এখনই দরজা খুলবে। আমি আমার হাত দু'টো বুকে আড়াআড়ি ভাবে রেখে শক্ত ভাবে তৈরি হয়ে

থাকলাম। দরজার লকটা খুললো পারভীন। তারপর দরজাটা সামান্য ফাঁক করার সাথে সাথেই কাঁধ দিয়ে দরজায় খুব জোরে এক ধাক্কা দিলাম। পারভীন ছিটকে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে কোনমতে টাল সামলালো। আমি ততক্ষণে ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা লক করে দিয়েছি।

পারভীনের দিকে তাকাতেই আমি চমকে উঠলাম। অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওর সেই চশমা আর নেই। অবিন্যস্ত চুল এখন সুন্দর পরিপাটি। পরনে মেহেরুন রাঙা জমিনের ওপর ছাপা সিল্কের শাড়ী। ডান হাতে দু'গাছা সোনার চুড়ি। বাঁ হাতে ঘড়ি। ওর সেই অগোছালো সাজ-গোছ যেন হঠাৎ করেই উধাও হয়ে গেছে। আর সাথে সাথেই হয়ে উঠেছে অপরূপ সুন্দরী। মনে হলো এত সুন্দর বুঝি ওকে আর কখনো দেখিনি।

ভয়ার্ত চোখে পারভীন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ এই হোটেল কক্ষে আমার প্রবেশ ওর কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তাছাড়া আমাকে চৌধুরী ভবন থেকে তাড়িয়ে দেয়ার পরিণামটা আমি খুব সহজ ভাবে নেবো না তা ও জানে। তাই ওর মুখটা শুকিয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারলাম, কাকুতি মিনতি করার সুযোগ খুঁজছে ও। দু'চোখে কান্নার আভাস ফুটে উঠলো।

'এখন ওসব চোখের পানি রাখো। কাজের কথায় এসো। জানি, তুমি চাওনি যে আমি আর তোমার সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু উপায়হীন হয়েই দেখা করতে হলো। শোন, আমাদের

অজুহাতটা আর খাটবে না।'

আমার কথায় চমকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেলো পারভীন। আমার কথা যেন বিশ্বাস হলো না ওর। একটা অজানা ভয়ে সে যেন মিয়িয়ে গেছে। ওর নিজের হাতই নিজের গলার কাছে ঘুরছে।

'তোমার এসব মিথ্যে কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে বেড়িয়ে যাও। তা নইলে আমি কাউকে ডাকতে বাধ্য হবো।'

'তার আগে তুমি আমার কথার উত্তর দাও। সে-রাতে আমার কাছে কেউ টেলিফোন করেছিল একথা তুমি আমাকে বলোনি কেন?'

স্থির হয়ে আমার দিকে তাকালো পারভীন।

'কি বলতে চাইছো তুমি?'

'আমি যখন চিঠি ডিক্‌টেট করছি বলে দেখানো হয়েছে—ঠিক সে-সময়ে আমার এক বান্ধবী টেলিফোন করেছিল। এ কথাটা আমি ঘরে ফিরে আসার পর আমাকে বলোনি কেন?'

'আমি নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছিলাম।'

'এটা কোন ভুলে যাওয়ার মত কথা হলো? কেমন করে তা হতে পারে? তুমি তার সাথে কথা বলেছিলে—বলোনি? তুমি বলেছিলে, আমি বেরিয়ে গেছি।'

'আমি যাই বলি না কেন, তাতে কি এসে যায়?' পারভীনের গলায় অধৈর্য। 'টেলিফোন এসেছিলো—আমাকে

কিছু বলতে হতোই, তাই ও কথা বলেছি। এখন তুমি বেরিয়ে যাও—আমি একা থাকতে চাই।'

'আমার কথাটা একটু ধৈর্য ধরে শোন। আমার কথার মানে বোঝার মতো বুদ্ধি তোমার যথেষ্টই আছে। সে সময় তো মুন্সী লাউঞ্জে থাকার কথা। টেলিফোন বাজার শব্দ সে নিশ্চয়ই শুনেছে? তারা মিয়াও কি তা শুনেছে?'

'তারা মিয়া—তারা মিয়াও শুনেছে বলেই তো মনে হচ্ছে। ...তা যাই হোক না কেন, এটাকে অজুহাত হিসাবে হাতে নিয়ে এসে আমাকে এভাবে উত্যক্ত করার কোন মানে হয় না, রাসেল। তুমি দয়া করে এখন যাও।'

'তোমার মনে হচ্ছে—তারা মিয়া শুনেছে? নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছো না? ঠিক আছে, এখন বলো, টেলিফোন আসার সময়ে তুমি কি করছিলে?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝতে চাইলো পারভীন।

'আমি তখন সবেমাত্র মুন্সীকে বলেছি—তুমি তাকে আর বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখবে না। মুন্সীকে একথা বলে আমি যখন পড়ার ঘরে ফিরে আসছি, ঠিক তক্ষুণি টেলিফোনটা বেজে উঠলো। মিনিট খানেক বা তার আগে বাজেনি, তাই সৌভাগ্য বলতে হবে। যদি তাই হতো তবে মুন্সীকে বলা তোমার গলার স্বরের প্রভাবটা একদম নষ্ট করে দিতো।'

'তখন কি তারা মিয়া ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল?'

আপন মনে কিছুক্ষণ ভাবলো পারভীন। ভ্রু কুচকালো। তার-

পর মাথা নাড়লো। 'তারা মিয়া তখন ঘর থেকে সবেমাত্র বের হচ্ছিল, কিন্তু একদম দুরে চলে যায়নি।'

'তাহলে তাই বলো, সেও টেলিফোন বাজার শব্দ শুনেছে। তুমি কি সে সময় পড়ার ঘরের দরজা খোলা রেখেছিলে? টেলি-ফোনের উত্তরে তুমি যখন বলেছিলে 'আমি বেরিয়ে গেছি'— এ কথাটা তোমাকে বলতে মুন্সী ও তারা মিয়া শুনেছে কি?

'আমার যতটুকু মনে হয়, তারা দু'জনেই তা শুনেছে। কিন্তু ...তাতে কি আসে যায়? তারা মিয়া ও মুন্সী দুজনেই জানে তুমি বাইরে যাওনি। ওরা আমার কথায় স্পষ্ট করেই বুঝতে পেরেছে তুমি যাতে কাজে বিরক্ত না হও, সেজন্যেই আমি ওই মিথ্যেটুকু বলেছি। ব্যাস, চুকে গেল। এখন এই নিয়ে এখানে এসে এত হৈ চৈ বাধাবার কোন কারণ আছে কি?'

'মাথায় তো তোমার কূট-বুদ্ধির অভাব নেই। কিন্তু এই সামান্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না?'

'কথা আরও কিছু বলতে হলে খুলেই বলো। তোমার সঙ্গে বকবক করার ইচ্ছে আমার নেই।'

'এক সময় তো ছিল, পারভীন?' ওর দিকে তাকালাম। কি সুন্দর মুখচ্ছবি। লাবণ্যের ছটায় সে-মুখ আরও উজ্জ্বল, ভীষণ রকম কাছে টানে। পৃথিবীতে হয়তো এমন কিছু মায়াময় মুখ থাকে, যে মুখ কোন কোন পুরুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে জগৎ সংসার ভুলিয়ে দেয়। পারভীনের মুখ যেন তেমনি একটি। প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তি ঐ মুখের। মোহময়ী।

'তুমি এখন যাও, রাসেল। আমার কাজ আছে।' বুকের

কাপড়টা টেনে নিজেকে একটু সামলে নিল পারভীন।

ওর কথায় আমি সম্বিত ফিরে পেলাম।

'তোমার এখন সবচেয়ে বড় কাজ হলো মন দিয়ে আমার কথা শোনা। সে-রাতের দৃশ্যটা একবার কল্পনা করো। ঘরে আমার উপস্থিতি প্রমাণের জন্যে টেপ রেকর্ডারে আমার গলায় আগে থেকে রেকর্ড করা টেপ বাজানো হচ্ছিলো। সত্যিকার ভাবে সে-সময়ে আমার দেয়া কোন চিঠির ডিক্টেশন টেপে রেকর্ড করা হচ্ছিল না। যদি হতো, ডিক্টেশনের সঙ্গে টেলিফোনের শব্দ ও তোমার কথাও টেপে ধরা পড়তো। কি···মাথায় কিছু আসছে?'

বোকার মতো আমার দিকে তাকালো পারভীন।

'কিন্তু···তোমার কথাই তো ঠিক, মেশিনটাতো তখন রেকর্ড করছিল না। শুধু তোমার গলার স্বরই বাজানো হচ্ছিল। সুতরাং সে-অবস্থায় টেপে টেলিফোনের রিং বা আমার কথা কোন কিছুই রেকর্ড হতে পারে না। এতো ঠিকই আছে, সমস্যা আবার কোথায়? এ তোমার নিছক চালাকি—আমাকে মিছে মিছে ভয় দেখাবার ফন্দি।'

'একেই বলে মেয়ে বুদ্ধি—অথচ তুমি এতো বোকা নও। টেপ মেশিনটা সে-সময়ে রেকর্ড করছে, আমাদের অজুহাতে সেটাই দেখানো হয়েছে। আর তাই যদি হয়; তবে রেকর্ড-কৃত টেপে তোমার গলা ও টেলিফোনের শব্দ থাকা উচিত ছিলো। কিন্তু ওতে তা নেই। বুঝেছ কিছু? কবীর হোসেনকে এখন শুধু খুঁজে পেতে বের করতে হবে যে, একটা টেলিফোন

সে-সময়ে এসেছিল। আর তাহলেই কবীর হোসেনের প্রমাণ করতে অসুবিধা হবে না যে সে-সময়ে কোন রেকর্ড হচ্ছিল না, শুধুই টেপ বাজানো হচ্ছিল। অর্থাৎ প্রমাণ হয়ে যায়, আমি ঘরে ছিলাম না। কবীর হোসেন তাই চাচ্ছে—একই সময়ে আমার দুই জায়গায় উপস্থিতিটা সে খণ্ডন করতেই উঠে পড়ে লেগেছে। তার কাছে আমাদের সে-টেপটাও রয়েছে। ওটা নিশ্চয় সে বারবার বাজিয়ে বাজিয়ে কোন রকম ছিদ্র বের করা যায় কিনা দেখেছে। এতক্ষণে হয়তো তার আর বুঝতে বাকী নেই যে, টেপটা ঘরে বাজানো হচ্ছিলো। মুন্সী যদি বলে থাকে—লাউঞ্জে তার অপেক্ষা করার সময় টেলিফোন বেজেছিলো, তবে আর কবীর হোসেনকে পায় কে। সে সহজেই বুঝে নেবে, আমরা তার হাতের মুঠোয়। তোমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে ? যে এ্যালিবাইটাকে অভেদ্য বলে নিশ্চিন্ত ছিলাম, ঐ একটা টেলিফোন আসার ফলে তা আর অটুট থাকে কি ?'

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে আমি থামলাম। ভালো করে তাকালাম পারভীনের দিকে। মনে হলো, পারভীন টলছে। ও বুঝি এক্ষুণি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। তাড়াতাড়ি দু'পা এগিয়ে ওকে ধরে ফেললাম। ধরতেই আমার গায়ে এলিয়ে পড়লো ও। কিন্তু পরমুহূর্তেই গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবং আমাকে ঠেলে ওর কাছ থেকে সরিয়ে দিলো।

'দূরে থাকো। খবরদার, আমাকে ছোঁবে না।'

বিছানায় বসে পড়লো পারভীন। বার কয়েক জোরে জোরে

শ্বাস নিলো। মনে হলো, ওর বুকের বাতাস যেন হঠাৎ করেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। অনেক কষ্টে চোখের পাপড়ি টেনে আমার দিকে আবার তাকালো।

'কবীর হোসেন টেলিফোন আসার ব্যাপারটা নাও জানতে পারে ?'

'তুমি কি এর ওপরে ঝুঁকি নিতে চাও ? এমন একটা জলজ্যান্ত ব্যাপার সে খুঁজে পাবে না, তেমনটা তুমি আশা কর কিভাবে ? আর তা ভেবে তুমি বসে থাকতে চাও ? ভালো, তাই থাকো। কিন্তু আমি কবীর হোসেনকে এর মধ্যেই ভালো করে চিনে ফেলেনি। সে এটা যেমন করেই হোক, খুঁজে বের করবেই। আমাকে নানা ভাবে পর্যুদস্ত করতে গিয়ে সে যখন বারবারই ওই অজুহাতটায় এসে হোঁচট খেয়েছে, তখনই সে আমাকে বলেছে, অজুহাতটার মধ্যে একটা না একটা ফাঁক থাকবেই। আর সে-ফাঁকই হবে তার প্রধান অস্ত্র। এখন দেখা যাচ্ছে, সে ঠিকই বলেছিল। আর তুমি··· টেলিফোন বেজেছিল, সে-কথা তখন তুমি আমাকে বলোনি কেন ?'

ডান হাতের মুঠিটা বাম হাতের তালুতে ঘষতে ঘষতে পারভীন বললো, 'এটা আমার তখন একদম মনে ছিল না। হয়তো অপ্রয়োজনীয় বলেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাহলে···এ পরিস্থিতিতে আমরা এখন কি করতে পারি ?'

'কিছু করতে যাওয়ার আগে আমরা কি করতে পারছি না, সে কথাটাই তোমাকে বলতে চাই। আমরা আর শেলীর

অর্থ-সম্পদ ভোগ করতে পারছি না।'

'রাসেল, প্লিজ তুমি ও ভাবে বলো না। আমাকে তুমি ভীষণ ভয় পাইয়ে দিচ্ছ। আমাদের কি এর থেকে বের হয়ে আসার কোন পথ নেই। কোন না কোন একটা উপায় নিশ্চয়ই আছে। তুমি—তুমি কি করতে চাইছো, রাসেল?'

অনেক মিনতি ঝরছে পারভীনের গলা থেকে। ক্লান্ত, অসহায়।

ওর গা ঘেঁষে বিছানায় গিয়ে বসলাম।

'আমাদের এখান থেকে কেটে পড়তে হবে। তাছাড়া আর কোন উপায় নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যতদূরে পারা যায়, পালিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু কোথায়, রাসেল?' ও দু'হাতে আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরে ঝাঁকুনি দিলো। বললো, 'ওরা যে আমাদের খুঁজে বের করবেই। এসব ক্ষেত্রে ওরা সব সময় তাই যে করে।'

'আমি এমন একটা জায়গায় চলে যাবো, যেখান থেকে ওরা কিছুতেই আর আমাকে খুঁজে পাবে না। আমি সে জায়গায় নিজেকে এমন ভাবে হারিয়ে দেবো, য'তে ওরা আর আমাকে বের করতে না পারে। আমার সঙ্গে তুমিও যেতে রাজী আছো নাকি, পারভীন?'

আমার দিকে তাকালো পারভীন। ওর চোখ দু'টো থরথর করে কাঁপছে। সে যেন করুণা ভিক্ষা করতে চাইছে।

'তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি, যে-সব কথা বলেছি,

তারপরও কি তুমি চাও, আমি তোমার সঙ্গে যাই ?'

'এটা তোমার অমূলক চিন্তা। তোমাকে সঙ্গে নিতে না চাইলে এ কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম না। তাছাড়া এখন আর আমাদের কিইবা রইল। তোমার এত টাকা, ওই প্রাসাদ, আরো বিষয় সম্পত্তি—সবই তো এখন উবে গেছে। সব হারিয়ে আমাদের এখন প্রাণে বাঁচতে হবে। তবে তার আগে তোমাকে মনস্থির করতে হবে, কাকে তুমি চাও, আমাকে না শাহেদ খানকে ? আমার মনে হয়, আমি তোমাকে বাঁচাতে পারবো। শাহেদ খান তা পারবে না। চিন্তা করে দেখো, তুমি কি আমার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে, না নিজেই একবার বাজিয়ে দেখবে ?'

'তুমি কোথায় চলে যাবে বলে ঠিক করেছ ?'

'আপাততঃ বার্মা হয়ে ব্যাংকক। তারপর অষ্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আমেরিকা। দক্ষিণ আমেরিকাতেই আমার বেশি ইচ্ছে—সেখানে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে ?'

'তুমি যদি দয়া করে সাথে নাও, আমার কোন আপত্তি নেই।'

পারভীনের দিকে এক পলক তাকিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম।

'দয়ার কথা নয়, পারভীন, আমিও ওটাই চাই। আমি চাই তুমি আমার কাছে থাকো। আমরা দু'জনে পৃথিবীর এক নতুন কোণে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করবো। আমার মনে হয় পারভীন, আমরা দু'জন একসঙ্গে থাকলে এ ভয়ঙ্কর বিপদ যেমন করেই হোক, কাটিয়ে উঠতে পারবো। কিন্তু আগে

বলো, তোমার সিদ্ধান্তে তুমি অটল কিনা ?'

'রাসেল, আমাকে ভুল বুঝো না, আমি তোমারই। সব সময় তোমার সঙ্গেই থাকবো।'

আমার মাঝে একটা নতুন প্রেরণার শিহরণ খেলে গেলো। ওকে আরও কাছে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘ চুমো খেলাম। আমার বুকের মাঝে আবদ্ধ পারভীন যেন কেঁপে উঠলো।

'তাহলে আর দেরি নয়। যত তাড়াতাড়ি পারো তৈরি হয়ে নাও।' ওকে ছেড়ে দিলাম। 'তার আগে আমার পরিকল্পনাটা ভালো করে শুনে নাও। তোমার সুটকেস, ব্যাগ যাবতীয় জিনিস পত্র এখানে রেখে যাবে। হোটেলের লোকেরা যাতে ঘুণাক্ষরেও টের না পায় যে তুমি চলে যাচ্ছো। আমি এখনই বের হয়ে যাচ্ছি, যত টাকা পাওয়া যায়, জোগাড় করে আনতে হবে। আর তুমি চৌধুরী ভবনে ফিরে যাও—এখনই সিন্দুক খুলে শেলীর গয়নাগুলো নেবে। একমাত্র হীরেটা ছাড়া। শেলীর কি পরিমাণ ও কি কি গয়না ছিল সে-সম্পর্কে কারো ধারণা নেই। শুধু হীরেটা বীমা করা আছে। ওই সিন্দুকে সব কিছু মিলিয়ে প্রায় ২০ লাখ টাকার জিনিস-পত্র পাবে—ওগুলো আমাদের এই সংকট কালে খুবই দরকার। চাবীটা কোথায় আছে তো তুমি জানো—সেখানেই আছে ওটা। চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই আমি তোমার সঙ্গে চৌধুরী ভবনে দেখা করবো। সেখান থেকে সোজা চলে যাবো পতেঙ্গা। একটা ইঞ্জিন লাগানো নৌকো আমাদের জন্যে ওখানে অপেক্ষা করবে। তাতে করে আমরা চলে যাবো মহেশখালী। কাল ভোরে ছোট্ট

মোটর লঞ্চেই আমরা বার্মার উদ্দেশে মহেশখালী ছাড়ব। কিন্তু আমাদের তাড়াতাড়ি সব করতে হবে। নৌকাতে উঠে সমুদ্রে ভাসার আগে পর্যন্ত আমরা নিরাপদ নই। এদিকে কবীর হোসেন বোধহয় মুন্সীকে এখনও কায়দা করে উঠতে পারেনি—তাই যা একটু সময় পাওয়ার আশা করা যায়। তবু—তাড়াতাড়িই করতে হবে।'

পরনের কাপড় ঠিক করতে করতে পারভীন আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। এ সংকট কালে ওই হাসির টুকরো যেন বাঁচার তীব্র আকাংখা।

'তাহলে চৌধুরী ভবনেই আমাদের আবার দেখা হচ্ছে।'

'ঠিক। মনের জোর হারিও না, পারভীন।' আমি ওর পিঠ চাপড়ে ওকে সাহস দিতে চাইলাম। 'কবীর হোসেনকে যেমন করেই হোক, আমরা হারিয়ে দেবই। শুধু ওর নাগালের বাইরে থাকতে হলে আমাদের আর সামান্য দেরিও করা চলবে না।'

'তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারো, রাসেল।'

আমার দিকে তাকালো পারভীন। আমি দরজার দিকে এগোলাম।

'তুমি শুধু একটা কথা মনে রেখো, পারভীন, আমরা দু'জন একসঙ্গে থাকলে যে কোন সমস্যাকেই মোকাবেলা করতে পারবো। কোন বিপদই আমাদের ছুঁতে পারবে না।'

'আমারও তাই বিশ্বাস, রাসেল।'

বেশ স্পীডে আমি গাড়ি চালাচ্ছি। যে সময়ের মধ্যে আমার চৌধুরী ভবনে পৌঁছার কথা তার চেয়ে কিছুটা দেরি হয়ে গেছে। পারভীন নিশ্চয়ই এর মধ্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। যথেষ্ট সতর্কতার সাথে টিলার বাঁকগুলো ডিঙিয়ে আমি খাড়াই পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছি। গাড়িটা খুবই পুরনো—ফিয়াট। এক পরিচিত গ্যারেজের মালিকের কাছ থেকে একদিনের জন্যে ভাড়া নিয়েছি। গাড়ির জীর্ণদশা আর এবড়ো-খেবড়ো রং চটা চেহারা সহজেই পুলিশের সন্ধানী চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে। আর এ জন্যেই বেশ নিরাপদ বোধ করছি।

গাড়ির পেছনের আসনে ছোট একটা চামড়ার স্যুটকেস। ওতে নগদ একলক্ষেরও কিছু বেশি টাকা রয়েছে। ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট আর অফিসের সিন্দুক থেকে এর বেশি সংগ্রহ করা সম্ভব হলো না। কারণ এখন আর দেরি করার সময় নেই। পারভীনকে তুলে নিয়েই এখন যাত্রা করবো।

চৌধুরী ভবনের প্রধান গেট খোলাই ছিল। গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে ওর গাড়ির কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। গাড়ি না থাকাটাও অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। চালাক মেয়ে পারভীন। নিজের গাড়ি নিয়ে হয়তো আসেনি। এখন যে ও বাড়িতে আছে এ কথা অন্য কেউ টের পাক, তা ওর ইচ্ছে নয়। আমি ফিয়াটটাকে গ্যারেজের এক কোণে নিয়ে আড়াল করে রাখলাম।

প্রধান ভবনের সদর দরজাটা সামান্য ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। চারদিকে একবার তাকিয়ে আমি অন্ধকারাচ্ছন্ন হলঘর-

টার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কান সজাগ রেখে ঘরের মাঝে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। কোন রকম শব্দ কানে এল না। মনে শুধু একটা ভয়, কবীর হোসেন অ্যালিবাইএর ফাঁকটা এতক্ষণে খুঁজে পেয়ে আমাদের ধরার জন্যে পিছু নিয়েছে কিনা। এমনও তো হতে পারে, এই বাড়িরই কোথাও চুপচাপ ওৎ পেতে আমাদের ধরার অপেক্ষায় বসে আছে?

'পারভীন!'

নিস্তব্ধ বাড়িটায় আমার গলার স্বর আমার কাছেই যেন অচেনা লাগলো। উচ্চারিত শব্দটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে যেন সমস্ত হলঘরটাকে ভরাট করে দিলো।

কিন্তু কারো কাছ থেকেই আমার ডাকের কোন সাড়া পেলাম না।

লাউঞ্জে এলাম···কেউ নেই। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। বারান্দার এ প্রান্ত ও প্রান্ত খাঁ-খাঁ করছে। শেলীর শোয়ার ঘর, পড়ার ঘর—সব দেখলাম। পারভীন নেই। টেলিফোন ডায়াল করলাম ওর ঘরের নাম্বারে। টেলিফোনের রিং অনবরত হচ্ছেই, কেউ তা তুললো না। এদিকে সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে কবীর হোসেন তার লোকজন নিয়ে এসে হামলা করে বসতে পারে। তাই ভেবে অস্থির হয়ে উঠলাম আমি।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আবার ডাকলাম, 'পারভীন!'

ডাকটা দেয়ালে দেয়ালে বাধা পেয়ে আবার আমার কানেই এসে ধাক্কা খেলো। পারভীনের কোন সাড়া পেলাম না।

আমি অস্থির ভাবে আবার ওপরে উঠে গেলাম। আমার পড়ার ঘরের দরজাটা খুলে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। আমার মাঝে আবার একটা হিংস্র ঠাণ্ডা রাগ ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে থাকলো। ডান হাতটা আপনা আপনি একটা ঘুষি প্যাকিয়ে ডেস্কের ওপর সজোর ঘা মারলো। আবার বিশ্বাসঘাতকতা! এর বেশি কিছু যেন আর পারভীনের কাছ থেকে আশা করা যায় না। কিছুক্ষণ আগে যখন ঐ হোটেলের ২৬০ নং ঘরটায় ওকে জড়িয়ে ধরে গভীর চুমো খেয়েছিলাম, তখন ও কাঁপছিল। সে কি তখনই আমার কাছ থেকে আবার পালিয়ে যাবার কথা চিন্তা করছিল? আর আমারও সে-কাঁপুনি থেকেই সচেতন হয়ে ওঠা উচিত ছিলো?

কিন্তু এবার···এবার আর তুমি রেহাই পাবে না, পারভীন। তোমার রূপের মোহ আমার হিংস্রতাকে এবার ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে মাইকেলকে ফোন করলাম।

'আমি রাসেল বলছি। মহিলাটি এখন কোথায়?'

'আমার লোক সর্বশেষ যে খবর পাঠিয়েছে তা হলো, তিনি এখনো হোটেল শাহজাদাতেই আছেন। আপনি সে-হোটেল থেকে চলে আসার পর মহিলা হোটেল সাবিরাতে ফোন করে-ছিলেন। এটা আবার জানিয়েছে আমার অন্য একজন লোক। তার সঙ্গে হোটেল শাহজাদার টেলিফোন অপারেটরের খাতির আছে···'

'তোমার ওসব কথা রাখো, মাইকেল। হোটেল সাবিরাতে

সে কার সাথে কথা বলেছে এবং সে-কথাগুলো কি ?'

'কথা বলেছে মিঃ শাহেদ খানের সঙ্গে। বলেছে, আজ দুপুরে ২-৩০ মিনিটে সমুদ্রের ধারে একটা বাংলোতে শাহেদ খান যেন দেখা করে। সেখানে শাহেদ খানের জন্যে মহিলা অপেক্ষা করবেন।'

'বাংলোটা সম্পর্কে কিছু বলেছে কি ?'

'তেমন সঠিক করে কিছু বলেনি। তবে নাকি মনে হয়েছে, বাংলোটি শাহেদ খানের পরিচিত। তবে এ নিয়ে ভাববেন না, মিঃ রাসেল। আমার লোকজন ওর পেছনে ঠিক লেগে আছে। সেই বাংলোটির খোঁজ আপনাকে যথা সময়েই আমি দিতে পারবো।'

'আমি খুব খুশি হয়েছি, মাইকেল। সত্যি তোমার কাজের খুব প্রশংসা করতে হয়। তা এখন তুমি তোমার লোকজনদের ওর পিছু থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারো। মিস পারভীন সম্পর্কে আমার আর কোন আগ্রহ নেই। সুতরাং এখনই তোমার লোকজন তুলে নাও। তোমার পাওনাটা হিসাব করে রাখো, আমি বিকেলের মধ্যেই তোমাকে টাকা দিয়ে আসবো।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মিঃ রাসেল। আমার পাওনা নিয়ে আমি বেশি চিন্তা করি না, আপনাদের খুশি করাই আমার উদ্দেশ্য। তা আপনি, স্যার নিশ্চিত যে, আপনার আর কোন খবরের প্রয়োজন নেই ?'

টেলিফোনটার ওপর আমার হাতটা ক্রমশঃ এত জোরে চেপে বসছে যে, আঙুলগুলো টন টন করতে শুরু করেছে।

'না।'

'ঠিক আছে, স্যার। তবে আপনার প্রয়োজন হলেই…'

'অবশ্যই বলবো…' সজোরে টেলিফোন রেখে দিলাম।

আবার সেই শাহেদ খান! শাহেদ খানকে নিয়েই পালাবার ফন্দি আঁটছে পারভীন।

আর সেই বাংলো—যেখানে বসে আমরা শেলীকে খুন করার পরিকল্পনাটা পাকা-পোক্ত করেছিলাম। কি ভাবে কি করা হবে তার ব্যাপক মহড়া দিয়েছিলাম। শাহেদ খানও ওই বাংলোটি চেনে। পারভীন ওকে নিয়ে সেখানে রাত কাটিয়েছে। ওরা দু'জন আবার সে-বাংলোতেই একত্র হচ্ছে। তারপর ওখান থেকে পালাবে। পারভীনের মতলবটা বেশ ভালোই বলতে হবে। যত ঝড়-ঝাপটাই আসুক, শাহেদ খানকে পাবার আশা ও কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছে না। কিন্তু তাই যদি হবে, আমার সঙ্গে ওর এত ছলনা কেন?

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দম ফেললাম। বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকী। তাহলে এখন আবার আমার হাতে প্রচুর সময়। হোটেল সাবিরাতে টেলিফোন করলাম।

'হ্যালো, রিসেপশন? মিঃ শাহেদ খান আছেন কি?'

'তিনি তো এই মাত্রই বাইরে গেলেন।'

'তার জন্যে একটা মেসেজ আছে, সেটা আপনি একটু লিখে নিবেন?'

'বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি।'

'তাই ভালো। লিখুন,—শাহেদ খান, একটা কাজে আটকা

পড়ে গেছি। সাড়ে পাঁচটার আগে আমাদের দেখা হবে না। বিকেল সাড়ে পাঁচটা, একই জায়গায়—পারভীন।'

'আমি পড়ছি, দয়া করে শুনে নিন।'

টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে ভদ্রলোক পড়লো, আমি শুনলাম।

'ঠিক আছে। তিনি ফিরে আসা মাত্রই এটা ওনার হাতে দেবেন। আচ্ছা, তিনি কি খুব তাড়াতাড়িই ফিরবেন মনে হয়?'

'খুব বেশি দেরি হবে বলে আমার মনে হয় না। তিনি একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে গিয়েছেন।'

'ঠিক আছে, এলেই খবরটা দেবেন। ধন্যবাদ।' টেলিফোন ছেড়ে দিলাম।

উঠে জানালার দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে নজর পড়তেই আমার পা দুটো নিজেই থেমে গেল। বুকটায় হাতুড়ি পেটার শব্দ শুরু হলো।

একটা পুলিশের গাড়ি খুব দ্রুত চৌধুরী ভবনের দিকে উঠে আসছে। গাড়িটা সরাসরি বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে ভীষণ জোরে ব্রেক কষলো। গাড়িটা ঝাঁকুনী দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই ড্রাইভিং সীট থেকে নামলো কবীর হোসেন। ওপাশ থেকে নামলো মুন্সী ফজলুর রহমান আর তারা মিয়া। পেছন থেকে নামলো একজন বন্দুকধারী পুলিশ।

আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে একটু আড়াল খুঁজে নিতে চেষ্টা করলাম। শেলীর পড়ার ঘরের শেষে লাউঞ্জের কোণায় এক চিলতে অন্ধকার জায়গাটায় এসে দাঁড়াতেই সদর

দরজার ঘণ্টা বেজে উঠলো।

ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমি সহজেই বাড়ির পেছনের চাকরদের কোয়ার্টার হয়ে পালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু একটা অদম্য কৌতূহল আমাকে আটকে রাখলো। কবীর হোসেন মুন্সী আর তারা মিয়াকে নিয়ে এসে কি করতে চায়? শেলীকে খুন করার পরিকল্পনাটা কি কবীর হোসেন ওদের নিয়ে আবার সাজাতে চাইছে? এখন পর্যন্ত কতদুর সে এগিয়েছে? অ্যালি-বাইটা কি সে ভাঙতে পারলো?

কয়েকবার ঘণ্টা বাজার পরও যখন দরজা খুললো না, তখন কবীর হোসেন নিজেই দরজায় ধাক্কা দিলো। হাট হয়ে খুলে গেল দরজা। ওরা সবাই ভেতরে ঢুকে পড়লো।

'মোমেন, তুমি একটা কাজ করো—' কবীর হোসেন বলতেই বন্দুকধারী পুলিশটি সামনে এসে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। 'আমার মনে হয় না, বাড়িতে এখনও কেউ আছে। তবে নিশ্চিন্ত হওয়া ভালো—তুমি একবার বাড়ির চারধারটা দেখে এসো।'

পুলিশ স্যালুট করে চলে গেল সরু বারান্দা ধরে চাকরদের ঘরগুলোর দিকে।

মুন্সীর দিকে তাকিয়ে কবীর হোসেন বললো, 'আপনারা আমার সঙ্গে লাউঞ্জে চলুন।'

কবীর হোসেনের পেছন পেছন মুন্সী ও তারা মিয়া হাঁটতে শুরু করলো।

'আমি কিন্তু প্রথম থেকেই একটা কথা বলে আসছি কবীর সাহেব, আপনি কোথায় যেন ভুল করছেন।' মুন্সীর গলা কানে

এলো। 'আমি রাসেলকে যতটুকু জানি, তাতে এ কাজ সে কিছুতেই করতে পারে না। তাছাড়া, সে-সময়ে সে তার পড়ার ঘরেই ছিলো। আপনাকে তো আমি বলেছি, আমি শুধু ওর গলাই শুনিনি, বিশ্বাস করুন, ওকে আমি চোখেও দেখেছি।'

'চেয়ারের ওপর একটা হাত দেখাকে ওকে দেখা বলা যায় না, মিঃ রহমান।' কবীর হোসেন খুব দৃঢ়তার সাথে বললো, 'একটু চালাকী করলে একটা হাত খুব সহজেই দেখানো যায়। জামার হাতার ভেতর শক্ত একটা কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে তা চেয়ারের হাতার ওপর বিছিয়ে রেখেও আপনার চোখকে ফাঁকি দিয়ে থাকতে পারে। তারা মিয়া, তুমি কি তার হাতটা ছাড়া শরীরের অন্য কোন অংশ দেখতে পেয়েছিলে?'

'আমি শুধু হাতটাই দেখেছিলাম, স্যার।'

'মিস পারভীন তোমাকে আড়াল করে দূরে সরিয়ে রেখেছিল—তাই কি?'

'ঠিক তাই, স্যার।'

'তবু, আপনি যাই বলুন না কেন, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।' মুন্সী যথেষ্ট প্রত্যয় ভরা কণ্ঠে কবীর হোসেনের কথাকে খণ্ডন করতে চাইলো। 'এ কি করে সম্ভব? আমি যখন বসে ছিলাম, তখন সে আমার সঙ্গে কথাও বলেছিলো। এটা তো আর মিথ্যে হতে পারে না।'

'পারে, মিঃ রহমান, খুব সহজ ভাবেই পারা যায়। পারভীন টেপ রেকর্ডারটা বাজাচ্ছিলো। কিছুটা অভ্যাস আর যথেষ্ট রকম মনের জোর থাকলে কথা বলার ব্যবস্থাটাও খুব সুন্দর ভাবেই

সমাধা করা সম্ভব। আপনাকে যে কথা বলা হয়েছিল তা আগে থেকেই রেকর্ড করে রাখা ছিল।'

'আপনি বলতে পারেন, কিন্তু আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছেনা।'

'আপনি দেখে নেবেন, মিঃ রহমান, কোর্ট ঠিকই এটা বিশ্বাস করবে। এ কথাটা তো আপনাকে মানতেই হবে, সে যদি এখানে থেকে চিঠি ডিক্টেট করতো, তাহলে এটা কেমন করে সম্ভব হলো যে, টেলিফোনের শব্দ টেপে ধরা পড়লো না? সে ভীষণ চালাক সন্দেহ নেই, কিন্তু এই একটা দিকই সামাল দিয়ে উঠতে পারেনি। আপনারা দু'জনেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে টেলিফোনের শব্দ শুনেছেন। শুনেছেন পারভীনকে টেলিফোনে উত্তর দিতে। আপনারা ঘরের বাইরে থেকেও যদি ওসব শুনে থাকেন তবে, টেপেও এটা রেকর্ড হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয়নি। ঐ টেপটা আমি বারবার বাজিয়ে শুনেছি। আর এটাই একমাত্র এবং অকাট্য প্রমাণ যে টেপটা ঘরে বাজানো হচ্ছিলো, রেকর্ড করা হচ্ছিলো না। এ ব্যাপারে আর কারও কোন সন্দেহ থাকতে পারে?'

ওরা কথা বলতে বলতে আবার হলঘরে ফিরে গেলো।

আমি এতক্ষণে ঘেমে উঠেছি। রুমালে মুখ মুছলাম। পুলিশের এই লোকটাকে প্রথম থেকেই আমি কম গুরুত্ব দিয়ে বেশ ভুল করেছি। পরিকল্পনাটা যেভাবে সাজিয়েছিলাম, তা নিয়ে নিজে বেশ গর্ব অনুভব করছিলাম। আমি কল্পনাও করতে পারিনি, সমস্ত ব্যাপারটা সে এত তাড়াতাড়ি ধরে ফেলতে পারবে।

তারা মিয়া হঠাৎ বলে উঠলো, 'তার তো এখন আর পালাবার কোন পথ নেই, স্যার ? তাকে খুব শক্ত করে ধরতে হবে, স্যার, আমার এমন সোনার মনিবকে সে খুন করলো—ওর কঠিন সাজা না হলে আমার খুবই খারাপ লাগবে।'

'এখন হয়তো কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে, কিন্তু পালাতে পারবে না। শহর ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করলেই ধরা পড়বে। সব সড়ক, এয়ারপোর্ট, রেল ষ্টেশন, বাস ষ্টেশন—সর্বত্র নজর রাখা হয়েছে। কোন পথেই সে বেশি দুর এগোতে পারবে না।'

আমি যেন এই মূল্যবান খবরটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। এ তথ্যটা আমার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিলো। পুলিশ আমার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা নিয়েছে সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম। এখন তার পরিধি সম্পর্কেও আমার জানা হয়ে গেল। সেভাবেই এখন আমাকে সাবধান হয়ে পথ চলতে হবে।

পুলিশটা হলঘরে ফিরে এলো।

'পেছন দিকে কেউ নেই, স্যার। ওপরটা একবার দেখে আসবো ?'

'হ্যাঁ, তাই যাও। সব জায়গা ভালো করে দেখবে। তবে মনে হয় না, সে এখন এখানে থাকবে। তবে ঐ মেয়েটা—মানে পারভীন থাকতে পারে। কিছুক্ষণ আগেই সে হোটেলের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেছে। হঠাৎ করেই আমাদের লোক ওকে হারিয়ে ফেলেছে। ওপরে, যে ঘরটায় ও থাকতো, সেটাও একবার দেখে এসো।'

তাহলে শুধু আমার পেছনেই নয়, পারভীনের ওপরও ওরা নজর রাখছে।

আমি আর দেরি করলাম না। পা টিপে টিপে লুকানো জায়গা থেকে বের হয়ে ঝট্ করে শেলীর পড়ার ঘরে ঢুকে পড়লাম। দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। পায়ের শব্দে বুঝলাম পুলিশটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বারান্দা দিয়ে চলে গেল।

আর আমি স্থির করলাম, এখনই এ বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে হবে। কবীর হোসেনের হাতের কাছাকাছি থেকে কোন রকম ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। আমার আরও কিছু কাজ পড়ে আছে। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে-কাজগুলো শেষ করতে হবে। তারপর নিজের জন্যে চিন্তা—নৌকা তো নিষেধ না করা পর্যন্ত আমার জন্যে অপেক্ষা করবেই।

ডেস্কের ওপর শেলীর নতুন কেনা ন্যাশনাল প্যানাসোনিক টেপ রেকর্ডারটা রাখা ছিলো। কি মনে করে ওটা তুলে নিলাম। দরজার কাছে এসে আবার কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকলাম। নাহ্, কারো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। নিঃশব্দে দরজাটা খুললাম। তারপর সোজা পেছনের দরজার দিকে পা চালালাম।

গ্যারেজে পৌঁছে আবার চারদিকে সতর্ক চোখ বুলালাম। গাড়ির সামনের সীটে টেপ রেকর্ডারটা রাখলাম। গাড়ির ইঞ্জিন চালু করা এখানে ঠিক হবে না বলেই মনে হলো। শব্দ বাড়ির ভেতরেও পৌঁছে যাবে। অযথা ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।

গ্যারেজ থেকে নেমে যাওয়া পথটার দিকে তাকালাম। পথটা এখান থেকেই বেশ ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। ফিয়াটটাকে ঠেলে ঢালু পথটায় নিয়ে এলাম। ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে গাড়িতে লাফিয়ে উঠে গেলাম। স্টিয়ারিং হুইলটা ভাল করে ধরে ব্রেকের ওপর আলতো করে পা রাখলাম। গাড়িটা ধীরে ধীরে ঢালু পথে গড়িয়ে নামতে শুরু করলো। আমি হুইলের নিচে মাথাটা যথাসম্ভব নিচু করে রাখলাম। ব্রেকের ওপর চাপ রেখে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করে কয়েকটা বাঁক ছাড়িয়ে বেশ নিচে নেমে এলাম। বাড়ি থেকে আর গাড়িটা দেখা যাবে না বা শব্দও শোনা যাবে না বলে যখন আমি নিশ্চিন্ত হলাম, তখনই গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে দিলাম। গিয়ার দিয়ে এক্সিলারেটরে চাপ বসালাম। পুরনো ঝরঝরে গাড়িটা বিচিত্র শব্দ তুলে তীব্র বেগে ছুটতে শুরু করলো।

শেলীকে খাদে ফেলে দেয়ার বাঁকটায় আসতেই আমি সতর্ক হয়ে গেলাম। গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রাখলাম। কারণ এখনই আমি ওই খাদে পড়ে যেতে রাজী নই। পারভীনের ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নেবার কাজটাই আমার এখনো বাকী।

শহরে জন-কোলাহলের ভেতরে এসে আমার চোখ দু'টো আরও সতর্ক হলো। পুলিশ আমার ওপর নজর রাখছে। শহর থেকে বেরিয়ে যাবার সম্ভাব্য পথগুলোর ওপর ওদের প্রখর দৃষ্টি। আমি ওদের দৃষ্টিতে পড়ে গেলেই ওরা আমার পিছু নেবে। আর একবার পিছু নিলে ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া খুব কঠিন হবে। কবীর হোসেন তো এখন স্থির

সিদ্ধান্তে এসেই গেছে—শেলীর মৃত্যু দুর্ঘটনায় হয়নি, ওকে খুন করা হয়েছে। আর সে খুনী হচ্ছি আমি, শেলীর স্বামী—স্ত্রী খুন হলে পুলিশের প্রথম সন্দেহ যার ওপর বর্তায়। আমার সহযোগী পারভীন, শেলীর সেক্রেটারী। সে এখন পুলিশের চোখ থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু আমার চোখ থেকে সে হারিয়ে যায়নি। শত চেষ্টাতেও সে যেতে পারবে না।

পথে একবার গাড়ি থামিয়ে মাইকেলকে ওর পাওনাটা মিটিয়ে দিলাম। সেখানেই একটা বেকারীতে ঢুকে পেটে কিছু দিয়ে নিলাম।

সেই বাংলোটার কাছে যখন পৌঁছলাম তখন দুপুর দেড়টা। বাংলো থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা জঙ্গলে গাড়িটা লুকিয়ে রাখলাম। গাড়ির দরজা ভালো করে বন্ধ করে বাংলোটার দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজা জানালা সবই বন্ধ। তাহলে সে এখনও আসেনি।

আমি আবার ফিরে এলাম সেই জঙ্গলের ধারে। একটা গাছের ছায়ায় বসে পড়লাম। আর নজর রাখলাম সামনের পথটার ওপর।

দুপুরের রোদ বেশ তেতে আছে। বাতাস সামান্য যা একটু বইছে তাও বেশ গরম। তবু গাছের ছায়ায় মনটা বেশ শীতল হয়ে এলো। অজানা এক সুখ স্পর্শ যেন। এ সবুজ ছায়ার পরশ কি আর আমি পাবো? আমার দিন তো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। এতো ভালো করেই জানা, পুলিশের হাত থেকে এখন আর বাঁচার কোন আশা নেই। ওরা যে কোন সময়

আমাকে ধরে ফেলতে পারে। কারণ সবদিকেই ওরা জাল ছড়িয়ে অপেক্ষা করে আছে। বলতে গেলে ওদের জালে আমি এখন আটকা। যদি হাতে আরও বেশি কিছু সময় থাকতো, তাহলে সুযোগ বের করার চেষ্টা করে দেখা যেতো। এখন তো সময়ের অভাবই আমাকে ক্রমশঃ পুলিশের অন্ধ প্রকোষ্ঠের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আমার কি ভয় করছে? না, না, আমার ভয় করবে কেন? নিজের মনকেই নিজে সজাগ করতে চাইলাম। যার কিছু হারাবার থাকে না, তার আবার ভয় কিসের? শেলীর অনেক কিছু পাবার কল্পনা যখন আমার ছিলো, তখনই শুধু হারাবার চিন্তায় আমি ভয় পেয়েছিলাম। আর এখন···স্পষ্টই বুঝতে পারছি, আমার কল্পনাটা নিছক কল্পনাই। অনেক কিছু পাবার আশাতেই নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে হাত পেতেছিলাম। আর শেষ পর্যন্ত এখন দেখছি, সবকিছুই আমার হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে গেছে। আমার জন্যে কিছুই নেই। আর এই যখন অবস্থা, তখন আমার ভয় পাওয়ার কিই বা আছে?

সিগারেট ধরালাম। এখন পারভীনের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তা না করা পর্যন্ত আমি মানসিক শান্তি পাবো না। তারপর সময় পেলে নিজেকে দেখবো। ব্যাস। শুধু মাত্র এ একটা কাজই আমার বাকী আছে।

পারভীনের চিন্তা ছেড়ে-দিয়ে নিজের বাঁচার ব্যবস্থা করাই আমার স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা হয় না—ওর সঙ্গে আমার একটা শেষ বোঝাপড়া হওয়া একান্ত দরকার। সে আমার

সবকিছু শেষ করে দিয়েছে। করেছে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। ওহ্, অসহ্য। এর আগে কোন মেয়েই এমন ভাবে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। পারভীনও তা করে আমার হাত থেকে পার পাবে না। এই হয়তো আমার জীবনে প্রথম এবং শেষ মেয়ে—আর হয়তো কেউ আমার সঙ্গে কোন দিন বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে আসবে না। আসলে সত্য কথা হলো, আমিই হয়তো আর থাকছি না।

পথের ওপর হঠাৎ চোখটা আটকে গেলো। দূর থেকে একটা গাড়ি ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে আসছে। পারভীনই আসছে। ছাই রংয়ের গাড়িটা ক্রমশঃ এগিয়ে এলো। খুব দ্রুত গতিতে। প্রেমিকটিকে বসিয়ে রাখতে চায় না পারভীন। আর সে কথা ভেবে উদ্বিগ্ন পারভীনের দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো খুবই স্বাভাবিক। ঘড়ি দেখলাম—সাড়াইটে বাজতে এখনও এক মিনিট বাকী।

গাড়িটা একদম বাংলোর সামনে নিয়ে গেলো পারভীন। একটু ঘুরিয়ে বাংলোটার আড়াল করে গাড়িটা রাখলো। রাস্তা থেকে যাতে গাড়িটা নজরে না আসে এজন্যেই এ ব্যবস্থা। ওর গাড়ির পেছনে আর কোন গাড়ি আসতে না দেখে মনে হলো, পুলিশ তাকে সত্যিসত্যিই হারিয়ে ফেলেছে।

গাড়ি থেকে নেমে পারভীন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলো। পেছনের খোল থেকে স্যুটকেস বের করলো। দ্রুত পায়ে বাংলোর দরজার চাবি লাগিয়ে দরজা খুললো। তারপর স্যুটকেসটা নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো।

আমি গাছের ছায়ায় বসে থাকার আরামটুকু ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। পায়ের নিচে গরম বালি আর মাথার ওপরে সূর্যের প্রখর তাপ অনুভব করতে করতে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম বাংলোর দিকে। ঘরের ভেতরে কোন সাড়া শব্দ শুনলাম না। হঠাৎ দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

আট

কমিশনার সাহেব, আমি একটানা প্রায় দেড় ঘণ্টা কথা বলে চলেছি। আমার বিশ্বাস, এর মধ্যেই আমি আপনার কাছে আমার বক্তব্যটা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। আপনার কাছে এসব বলার কারণ হলো, আমার স্ত্রীকে খুন করার পূর্বাপর ঘটনাবলীর একটা পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরা। কারণ এতসব কথা হয়তো আর কোথাও বলা যাবে না, কেউ হয়তো তা শুনতেও চাইবে না। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সুযোগটুকু আমি এক্ষেত্রে গ্রহণ করলাম। আমি জানি, আমাদের আলাপ পরিচয়ের নিরিখে এরূপর আমার খুনী হওয়ার কারণটা যুক্তিসহ মেনে নিতে আপনার আর কোন অসুবিধা হবে না।

আমার বক্তব্য থেকে একথাটা খুব সহজ ভাবেই বের হয়ে আসবে, যা এখন সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা করতে গিয়ে আমারও মনে হচ্ছে, যদি পারভীনের প্রেমে না ডুবতাম তবে আমার

স্ত্রীকে আমি খুন করতাম না। এটা আমার পক্ষে দেখানোর মতো একটা যুক্তি বলে মনে হতে পারে, আপনিও তা ভাবতে পারেন, কিন্তু আমি তা ভাবছি না। নিছক স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাবার জন্যে আমি এতক্ষণ ধরে টেপ করতাম না, আর তা আপনাকে ধৈর্য ধরে শুনতেও অনুরোধ করতাম না। আমি জানি, খুনী হিসাবে আমার কোন যুক্তিই এখন ধোপে টিকবে না। পারভীনের জন্যে যদি এ ঘটনা না ঘটতো, তবে আপনার কাছে এ ধরনের স্বীকারোক্তি জানাতাম না। শেলীকে বিয়ে করার ফলে যে সুবিধেগুলো আমি পাচ্ছিলাম, তা থেকেই আমার প্রয়োজনের বেশি টাকা এসে যাচ্ছিলো। ওতেই আমি সন্তুষ্ট থেকে ওকে বিয়ে করার অসুবিধাগুলো মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু ঐ যে পারভীন, আমার সমস্ত সন্তুষ্টির মাঝে ওর মোহময়ী রূপ নিয়ে সে এসে দাঁড়ালো। ও কামনার পশার সাজিয়ে আমাকে দুর্বল করে ফেললো। ফলে ওর সঙ্গে নির্জনে মিলনের জন্যে আমাকে ফন্দি আঁটতে হলো। আর সুযোগ বুঝে সে আমাকে তার রূপলাবণ্যের মাদকতার বড়শীতে গেঁথে ফেললো। তখন বাধ্য হয়েই আমাকে একটা সমাধানের পথ খুঁজতে হলো।

সে সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়ে কিন্তু আমার মাথায় কখনো খুনের কথা আসেনি। হয়তো কোনদিনই তা আসতো না, যদি না পারভীন আমার মাথায় সে-ইঙ্গিতটা সূক্ষ্ম ভাবে ঢুকিয়ে না দিতো। ঐ ইঙ্গিত আমার মাঝে খুব দ্রুত কাজ করেছিলো। শুধু তাই নয়, ঐ ইঙ্গিতের পর থেকেই পারভীন

আমাকে নিয়ে আরও বেশি খেলতে শুরু করেছিলো। আমার মনের কামনাকে উছলে দিয়ে ও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বেশ নিরাপদ দূরত্বে থাকতে লাগলো। এখন বুঝতে পারছি আমার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া খুনের বীজটাকে তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠার জন্যে ওসব করছিলো ও। ওর প্রতি আমার আগ্রহকে পারভীন এ ভাবে এমন এক পর্যায়ে টেনে নিয়ে গেলো যে, এর পর শেলীকে খুন করার পরিকল্পনা করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিলো না। এ ক্ষেত্রে আপনি খুনের জন্যে আসলে দোষ দেবেন কাকে? নিঃসন্দেহে এ দোষ পারভীনকেই দিতে হয়। তাই নয় কি?

অবশ্য এখন খুব সহজে, শুনতে যতই খারাপ মনে হোক না কেন, আমি বলতে পারি—পারভীনকে আমি কিছুক্ষণ আগেই খুন করেছি। অবশ্য এটাও ঠিক যে, আমি ওকে খুন না করলে সেই আমাকে খুন করতো। ওর হাতে খুন হওয়াটা আমার কাছে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। তাই আমিই কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলেছি। শেলীকে খুন করার কথা যেক্ষেত্রে আমি অকপটে স্বীকার করছি, সে-ক্ষেত্রে আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন, পারভীনকে আমার মারতে হয়েছে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে।

আপনাকে বলতে বাধা নেই, পারভীন সেই প্রথম থেকেই সব সময় আমার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে ছিল। বিশ্বাস করুন, আমি যখন এত মানসিক প্রস্তুতি নিয়েও বাংলোতে ঢুকলাম—তখনও দেখি সে আমার চেয়ে এক ধাপ এগিয়েই আছে।

ওর হাতে ৩৮বোরের স্বয়ংক্রিয় সেই পিস্তল। আমার দিকে সোজা তাক করে ধরে আছে।

ও কেমন করে আমার আসার সাড়া পেয়েছে জানি না। তবে সাড়া পেয়েই খুব দ্রুত পিস্তল হাতে তৈরি হয়ে নিয়েছিল। এমনও হতে পারে, পাশের জানালা দিয়ে আমাকে জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসতে দেখেছে। তা যেমন করেই হোক,—আমি ঘরে ঢুকেই দেখি ও আমার জন্যে উল্টো দিকের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে। হাতে পিস্তল।

'এই যে পারভীন!' পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

হাতে পিস্তল থাকলেও পারভীনের ভেতরকার ভয় দূর হয়ে যায়নি। আর সে ভয় যে একজন মেয়েকে কেমন ভয়ঙ্কর ভাবে পেয়ে বসে তা পারভীনকে না দেখলে আমি বুঝতেই পারতাম না। আমার বেশ মজা লাগল, ভয় ওর সমস্ত সৌন্দর্যকে মুছে দিয়ে ওকে অসম্ভব রকম কুৎসিত করে তুলেছে। আমি যখন ঘরে ঢুকে ওর দিকে সরাসরি তাকালাম, ঠিক সে-মুহূর্তে ওকে প্রায় শেলীর মতোই কুৎসিত দেখাচ্ছিলো। সে তখন দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে। দুচোখেরই চারদিক ঘিরে কালো দাগ, চোখ দুটো যেন ভেতরে বসে গেছে, মুখের হাড়গুলো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে—সব মিলিয়ে কেমন যেন—বিধ্বস্ত। ভয় ওকে যেন অত্যন্ত দুর্বল করে দিয়েছে। কপালের শিরাগুলো নীল হয়ে ফুটে উঠেছে। এ যেন ঘন্টা তিনেক আগে আমার দেখা সেই পারভীন নয়, অন্য কেউ।

'সব বুঝি এখানেই শেষ হয়ে গেলো, কারণ আমাদের আর পালাবার কোন পথ নেই।' আমি স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। 'তুমি হয়তো জানো না, ইতিমধ্যেই পুলিশ আমাদের ওপর নজর রাখতে শুরু করেছে। অবশ্য হোটেল শাহজাদা থেকে বের হয়ে আসার পর পুলিশ তোমাকে হারিয়ে ফেলেছে। এখন আমাদের দুজনের যাকেই পাক না কেন, ধরে নিয়ে একদম হাজতে পুরবে।'

'চুপ করো, রাসেল, তোমার ওসব মিথ্যে বুলি আমাকে আর শুনিও না। ওসবে আর আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না।' প্রায় দম বন্ধ করে কথা বললো পারভীন। কথা বলতে গিয়ে গলাটা যেন কেঁপে না ওঠে সেদিকেও খুব সচেষ্ট রইলো। 'কিন্তু আমি এখানে আছি জানলে কি করে?'

'সে কথা তোমার জেনে কি হবে? শুধু জেনে রাখো, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছি সবসময়। তোমার মতো বিশ্বাস-ঘাতিনী মেয়েকে নিয়ে এটাই ঝামেলা, সব সময় চোখে চোখে রাখতে হয়।'

'মুখ সামলে কথা বলো, রাসেল।'

'আহা, আমিতো আর মিথ্যে বলছিনা। আচ্ছা তুমি নিজেই বলো, আজও শেষ পর্যন্ত তুমি যা করলে তাতে তোমাকে বিশ্বাস করার আর কোন যুক্তি আমার আছে কি?

'আমি কোন যুক্তির কথা শুনতে চাইনা। তুমি বেরিয়ে যাও, তা না হলে···'

'নিজের মনকে নিজে ও ভাবে ধাপ্পা নাইবা দিলে, পারভীন?

তুমি কি মনে করছো, তুমি খুব নিরাপদ আছো ? তা নয়, আমি সে কথাটাই তোমাকে বলতে এসেছি। চৌধুরী ভবন থেকে আমি এখনই এলাম। কবীর হোসেন এখনও সেখানেই আছেন। মুন্সী ফজলুর রহমান আর তারা মিয়াকে নিয়ে তিনি আমাদের অ্যালিবাইটা সাজাচ্ছেন। আমরা কেমন করে কাজটা করছি, তুমি কেমন করে টেপ নিয়ন্ত্রণ করেছ, তারা মিয়াকে আমার চেয়ার থেকে কেমন করে আড়ালে রেখেছ, জামার হাতায় শক্ত কিছু ঢুকিয়ে চেয়ারের হাতলে রেখে ওদের ধোকা দিয়েছ—সব, সব কিছুই কবীর হোসেন নিখুঁত ভাবে মুন্সীকে বুঝিয়ে দিলো। আমি নিজের কানেই সব শুনেছি। মুন্সী যে কোন কারণেই হোক, কোন কিছুই বিশ্বাস করতে চাইছিল না। কিন্তু কবীর হোসেন তাকে বিশ্বাস করিয়ে তবে ছাড়বেন। কারণ সে-ই হবে তাঁর প্রধান সাক্ষী। কিন্তু আজকে আমাদের এই সর্ব শেষ পরিস্থিতির জন্যে তোমার নিজকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত পারভীন। তুমি নিজেই নিজেকে, সেই সাথে আমাকেও আজ পুলিশের জালে আটকে ফেলেছ। সে রাতে যদি তোমার টেলিফোনের কথাটা মনে থাকতো, তুমি যদি ঘরে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে তা বলতে—আমি এখন—তাহলে দক্ষিণ আমেরিকার কোন এক শহরে পরম নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে পারতাম। ইচ্ছে করলে তুমিও আমার সঙ্গে থাকতে পারতে।'

এতক্ষণ কথা বলার ফাঁকে ওর ওপর নজর রেখেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, এতটা সময়ে মেয়েটা একটুও নড়লো না। পিস্তল উঁচিয়ে যেমন দাঁড়িয়েছিলো ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো তেমনি। মনে

ভয় থাকলেও তেমন কাবু হয়েছে বলে মনে হলো না। আমি আবার আগের কথার রেশ টানলাম।

'কিন্তু এখন আর তা হচ্ছেনা। ইচ্ছে থাকলেও তুমি আর আমার সঙ্গে থাকতে পারবে না। কবীর হোসেনের মুখেই শুনলাম, সব সড়ক, এয়ারপোর্ট, বাস ও রেল ষ্টেশন—পুলিশ তাদের প্রখর দৃষ্টি দিয়ে ঘিরে রেখেছে। আমরা কিছুতেই আর তাদের ঐ সতর্ক দৃষ্টির বেড়াজাল ভেঙ্গে পালাতে পারছি না।'

চোখে মুখে দৃঢ় ভঙ্গি নিয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো পারভীন। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'আমরা নয়, বলো তুমি পালাতে পারবে না। আমি ঠিকই পালাতে পারবো।'

'ঠিকই বলেছ, তা তুমি পার। তুমি তোমার ঐ লোক দেখানো চশমাটা না পরলে আর বোকা বোকা সতীপণা ভাবটা ছেড়ে দিলে—তোমাকে চেনা ওদের পক্ষে কষ্টই হবে। তুমি যে তোমার রূপ মুহূর্তে মুহূর্তে পাল্টাতে পারো, সে কথাতো ওরা জানে না, এ সুযোগটা তুমি নিতে পারো ঠিকই। তাছাড়া শাহেদ খান দেখতে কেমন তাও পুলিশ জানে না—জানে না শাহেদ খানের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের কথাও। সবাই তো জানে তুমি অবিবাহিতা। তুমি সত্যি বলেছ পারভীন, তুমি পালিয়ে যেতে পারবে, আমার চেয়ে তোমার পালিয়ে বাঁচার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তবে একথাও তোমাকে আবার বলছি, তুমি যদি আমার সঙ্গে প্রতারণা না করে সহজ সরল ব্যবহার করতে তবে, আমিই তোমাকে পালিয়ে যাবার অনেক সুযোগ

করে দিতে পারতাম। কিন্তু এখন আর তা হয় না। আমি কিছুতেই আর সে-সুযোগ তোমাকে পেতে দেবো না। শেলীকে খুনের ব্যাপারে আমরা দু'জনেই জড়িয়ে আছি, প্রথম থেকেই আমরা এর জন্যে সমান ভাবে দায়ী। সমান দায় ভোগ না করে এখন তুমি একা পালিয়ে যাবে—তা কি হয় পারভীন? প্ররোচনা থেকে প্রতারণা,—সব ক্ষেত্রেই তো আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি। আর এখন তুমি সুযোগ বুঝে পালিয়ে যাবে, তা কি হয়? কি হলো, চুপ করে রইলে কেন? কিছু একটা বলো? তোমার শাহেদ খান কি এতসব কিছু জানে?'

মাথা নাড়লো পারভীন—'শাহেদ খান জানে না।'

'আমিও অবশ্য তাই ধারণা করেছিলাম। এত কাণ্ড-কীর্তির কিছুই সে জানে না। জানলে এখন হয়তো আর সে তোমার কাছে ছুটে আসতো না। সে যাতে তোমার কাছে ছুটে আসে সেজন্যেই তো তুমি আমাকে খুন করতে ইন্ধন জুগিয়েছিলে। কারণ শাহেদ খানকে আবার ফিরে পাওয়াটা তোমার জীবনে একটা রিবাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছিল। আমি কি মিথ্যে বলছি, পারভীন? আর যাই হোক, সে প্রচণ্ড অর্থলোভী। অন্যত্র অর্থলাভের আশায় সে তোমাকে প্রায় ত্যাগ করতেই বসেছিল। কিন্তু তুমি এও ভালো করে জানতে যে, শেলীর সব টাকা যদি তোমার হাতে এসে যায়, শাহেদ খান আনন্দে লেজ নাড়তে নাড়তে আবার তোমার কাছে ফিরে আসবে।'

একটু থেমে ঢোক গিললাম। আরও কিছুক্ষণ ভেবে

কথা বলেই যেতে হবে। তা নাহলে ওকে বাগে আনা যাবে না। কারণ, আমি অন্য কিছু করতে গেলে, ও হাতের পিস্তলটা ব্যবহার করে বসবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি আবার বলতে শুরু করলাম।

'শাহেদ খানকে পাওয়ার জন্যে তুমি আমার কাছে এলে। নিখাদ প্রেমের অভিনয় করলে। তোমার প্রেমে আমাকে এতই উন্মত্ত করে ফেললে, যাতে আমি শেলীকে খুন করতে পেছপা না হই। শেলী খুন হলে যে তোমারই সবটুকু লাভ তাও তুমি জানতে। জেনেশুনেই করছো যা করার। চমৎকার পরিকল্পনা এঁটেছিলে তুমি, পারভীন। আমার সমস্ত বিচার বুদ্ধি, ন্যায়-নীতি বোধ—সবকিছু ডুবিয়ে দিয়ে তোমার পরিকল্পনাটা আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। আর তার জন্যে কোন কৌশলই আমার ওপর প্রয়োগ করতে বাদ রাখোনি। তুমি অবশ্য চেয়েছিলে খুনের ব্যাপারে নিজেকে মুক্ত রাখতে। দূর থেকে আমার ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করে চলেছিলে যেন আমি তোমার কোন সহায়তা ছাড়াই শেলীর হাত থেকে নিস্তার পাবার ব্যবস্থা করি। সেটা যদি হতো, তবে তো আজ তুমি বেশ শান-শওকতের সাথে শেলীর অগাধ অর্থ আর বিষয় সম্পত্তি ভোগ করতে পারতে। কিন্তু তা আর হলো কৈ। পারভীন···তুমি কি মনে করো না, শেলীকে খুন করার জন্যে তুমি খুব বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলে? যাকগে ওসব কথা, এখন কিন্তু পুলিশ তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তুমি হোটেল থেকে চলে আসার দশ মিনিট পর ওরা সেখানে

গিয়েছিল। বুঝে দেখো, পুলিশ তোমার কত কাছে এসে গেছে।'

কথার ফাঁকে ফাঁকে ওর প্রতিও আমি লক্ষ্য রাখছি। ওর মাঝে যেন একটা অস্থিরতা ক্রমশঃ জেগে উঠছে। আমার ওপর খুব সতর্ক দৃষ্টি রেখেও চকিতে ও জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দেখে নিচ্ছে। আমার কথার শেষের দিকে বারবারেই বাইরে তাকাচ্ছিলো। ওর এই হাবভাব দেখে বুঝতে পারছিলাম, আমার আর দেরি করা ঠিক হবে না। ও কিছু করার আগেই আমাকে কাজ সেরে ফেলতে হবে। আমি জানি, পারভীন এই মুহূর্তে আমাকে খুন করার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ ছাড়া আমার হাত থেকে রেহাই পাবার ওর আর কোন পথ নেই। বাইরের দিকে ঘন ঘন তাকানোর কারণ, শাহেদ খান যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে। ও ওই রকমই আশা করেছে। কিন্তু তার আগেই আমাকে খুন করে ফেলা ওর একান্ত দরকার। তা নাহলে ওর পথ নিষ্কণ্টক হয় না। শাহেদ খান এসে আমাকে এখানে দেখে ফেলুক তা ওর কাম্য নয়। আমাকে খুন করে বাংলোতেই ফেলে রাখবে। শাহেদ খানকে আসতে দেখলেই সে বাইরে গিয়ে দাঁড়াবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে চলে যাবে। শাহেদ খান জানতেও পারবে না, পারভীন পেছনে কি সব কাণ্ড ঘটিয়ে রেখে গেল। শাহেদ খানের সাথে গাড়িতে চেপে এ বিপদের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে যাবার চমৎকার সুযোগও ওর রয়েছে। শাহেদ খানের ভাড়া করা গাড়ি, শাহেদ খান নিজে এবং পারভীনকে এখন যেমন দেখা যাচ্ছে—সব মিলিয়ে

পুলিশ ওদের কোনরকম সন্দেহই করতে পারবে না। সত্যি, খুবই চালাক মেয়ে পারভীন। আঁট-ঘাট বেঁধে নিয়েই সে পথে নেমেছে।

কিন্তু আমি আর দেরি করলে বিপদ এড়াতে পারবো না। আপন মনে ভাবতে ভাবতে ওর দিকে দু'পা এগোলাম। আমার কাছ থেকে পারভীন এখনও ষোল-সতেরো ফিট দূরে। হাতে পিস্তল। এখন দু'পায়ের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়ানো। এ অবস্থায় ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াটা ঠিক হবে না।

'সাবধান, একটুও নড়বে না। পিছিয়ে যাও।'

'চমৎকার! এ না হলে কি আর তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মজা আছে? আমাকে তুমি খুন করবে?' ওর দিকে তির্যক একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে এক ঝটকায় কয়েক পা এগিয়ে গেলাম। দু'জনের মাঝের দূরত্বটা কিছু কমিয়ে নিলাম। 'নাও, তাই করো। খুন করে তোমার বাঁচার পথটা পরিষ্কার করে নাও। এ ছাড়া যে আর কোন উপায় নেই। জানো, আমি যদি সুযোগ পেতাম, তবে প্রথমেই ওই পথটা বেছে নিতাম, তোমাকে খুন করে ফেলতাম। কিন্তু সে সুযোগ আর আমার এলো কৈ। সব ক্ষেত্রেই তো তোমার জিত হচ্ছে, তবে আর এক্ষেত্রেই বাকী থাকবে কেন? সেই ভালো, খুন করার কাজটা আমার করার আগে তুমিই সেরে ফেলো। বিচারটা তোমারই হোক—ফাঁসির দড়িটা তোমার গলাতেই ঝুলুক। কি হলো? দেরি করছো কেন? এগিয়ে এসো গুলি করো। তোমার হাতে খুন হয়ে তোমাকে আপাততঃ বাঁচিয়ে দিতে আমি প্রস্তুত। তোমার

গুলিটা আমার শেষ উপহার হোক।' আমি আমার হাত দু'টো ওপর দিকে তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করে দাঁড়ালাম।

আমার চোখ তখন পিস্তলটার ওপর। ট্রিগারে ওর তর্জনীটা চাপ খেয়ে বসা। ট্রিগারটা টানার জন্যে নিজেকে শক্ত করতে গিয়ে পারভীন একটু নড়ে উঠলো। এই বুঝি সে টানলো··· না, কি যেন হচ্ছে ওর মধ্যে, টানতে গিয়েও টানতে পারছে না। মনে হচ্ছে, পেছন থেকে কিছু একটা যেন ওকে বারবার টেনে রাখছে। আমি একটু নড়ে-চড়ে ওকে উত্তেজিত না করলে যেন ও সহজে গুলি করতে পারবে না। হাতের রগগুলো ওর ফুলে উঠেছে—হাতের তালুটা ক্রমশঃ চেপে বসছে পিস্তলটার গায়। এখন শুধু মনের জোর পাবার মতো একটু প্রলোভন—তা হলেই গুলি করে ফেলতে পারবে।

তবে এটাও ঠিক, সে গুলি করতে আর বেশিক্ষণ ইতস্ততঃ করবে না। সুতরাং আর অপেক্ষা নয়··

'তুমি কিন্তু গুলি করতে খুব বেশি দেরি করে ফেলছো, পারভীন···' বলতে বলতে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে ওর পেছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। 'ওই তো। তোমার প্রেমিকটি দেখছি এসে পড়েছে।'

যে-কোন মুহূর্তে শাহেদ খানকে পারভীন আশা করছিলো। কারণ ওর দেয়া সময় আড়াইটে অনেক আগেই বেজে গেছে। ও যে আসবে, পারভীনের এ চিন্তাটাই আমার কাজে লাগলো। পারভীন ভেতরে ভেতরে এ নিয়েই বেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলো। শাহেদ খান আসার আগেই আমাকে শেষ করে

ফেলার জন্যে ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। ওর মাঝে এ অস্থিরতাটা না থাকলে এই পুরনো চালাকীটা কোন কাজে লাগতো না বলেই আমার বিশ্বাস।

আমার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই ঝট্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে জানালার পথে বাইরের দিকে তাকালো পারভীন। বিস্তীর্ণ জনহীন বালুকাবেলায় ধু-ধু তপ্ত বালিরাশি ছাড়া আর কিছুই ওর নজরে এলো না।

আমি চোখের পলকে একপাশে সরে গিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড শক্তিতে পিস্তল সহ ওর কব্জিটা চেপে ধরলাম।

আর সে-মুহূর্তেই পিস্তল থেকে গুলি ছুটে বেরিয়ে গেল। সামনের জানালার কাঁচে গিয়ে আছড়ে পড়লো গুলিটা। কাঁচগুলো ঝন ঝন করে ভেঙে চুরমার হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। নির্জন দুপুরে উত্তপ্ত বালুকাবেলায় গুলির শব্দটা মিলিয়ে যাবার আগেই আমার মনে হলো, আমি যেন অল্পের জন্যে বেঁচে গেলাম।

ওর হাতে একটা মোচড় দিয়ে পিস্তলটা নিয়ে নিলাম। নলের আগা থেকে তখনও পোড়া বারুদের গন্ধ বের হচ্ছে। ওটা হাতে নাড়তে নাড়তে ওর দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকালাম। তারপর পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ঘরের কোণে। মেঝেতে আছড়ে পড়তেই ওটা থেকে আরেকটা গুলি বের হয়ে গেল। পর পর দুটো গুলি। অথচ ওর একটা গুলিতেই আমার শেষ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু পারভীন বুঝতে পারেনি, ওই পিস্তলটা

ওকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। কারণ ওর হাতে খুন হওয়ার জন্যে আমি অতটা পথ পাড়ি দিয়ে এখানে আসিনি।

ওর গায়ে যে এত জোর তা কিন্তু আমি কল্পনা করিনি। আমার আনমনা হওয়ার সামান্য সুযোগেই ও এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো। আবার ওকে জাপটে ধরার আগেই পিস্তলটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আমাকে মেরে ফেলার প্রচণ্ড আগ্রহটা ওর তখনো যায়নি। ওটাই যে ওর একমাত্র সহায়। পিস্তলটা তুলে নেবার জন্যে যেই হাতটা বাড়িয়েছে, আমি এক পা এগিয়ে গিয়ে ওর পেছনে সজোরে লাথি বসালাম। ও ছিটকে কাত হয়ে পড়ে গেলো মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর। দু'হাত দিয়ে জোরে ঠেলে আমার বগলের নিচ দিয়ে মাথা গলিয়ে বের হয়ে যেতে চাইলো। আমি টেনে ওর মাথাটা আমার বুকের নিচে রাখতে চাইছি, কিন্তু পারছি না। অগত্যা ওর ঘাড় চেপে মেঝেতে শুইয়ে দিলাম। তারপর জাপটে ধরলাম। মেঝেতে আমরা তখন জড়াজড়ি করে গড়াগড়ি খাচ্ছি। হাত-পা ছুঁড়ে পারভীন আমার বাঁধন থেকে আলগা হতে চাইছে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর হঠাৎ বাঁ দিকে কাত হয়ে পিস্তলটার দিকে আবার হাত বাড়িয়ে দিলো। ওর আঙুলগুলো পিস্তলের বাঁটটা ধরে মুঠোতে নেবার চেষ্টা করছে। আমি হাতটা যতই টেনে রাখতে চাইছি, ততই শরীর বাঁকিয়ে পিস্তলটার কাছে হাতটা এগিয়ে দিতে চাইছে। আমি হাঁটু দিয়ে ওর কোমরে সজোরে গুঁতো দিতেই কাজ হলো। হাতটা কিছুটা

শিথিল হলো। সেই সুযোগে হাতটা মেঝেতে ঠুকে দিলাম। হাত বাড়িয়ে পিস্তলটাও ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলাম।

হাতের কব্জিটা ধরে মোচড় দিতেই ও চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে আমার চোখে মুখে কিল-ঘুষি চালাতে শুরু করলো। কি সাংঘাতিক মেয়েরে বাবা—সব রকম কায়দা কানুনই দেখি এর জানা। ওর হাত দুটো মেঝেতে চেপে রেখে তাড়াতাড়ি মুখটা সরিয়ে নিলাম। এবার সে আমার দিকে পা চালালো। কিছুতেই দমার পাত্রী সে নয়।

আমরা যেন একজোড়া হিংস্র পশু—অনেকক্ষণ ধরে মেঝেতে গড়াগড়ি খেয়ে লড়াই করছি। মরণ-বাঁচন লড়াই।

আমি বারবারই ওর গলাটা আমার হাতের মুঠোয় আনতে চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না। হাতটা যখনই গলার কাছে এগিয়ে নিই, ওর একটা হাত ছিটকে এসে শক্ত করে আমার কব্জিটা চেপে ধরে। প্রচণ্ড শক্তিতে আমার আঙুলগুলোকে ওর গলার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কোন মেয়ের শরীরে এত শক্তি, সত্যি আশ্চর্য হতে হয়। এতক্ষণ ধরে ওকে মেঝের ওপর চিৎ করে ফেলে রাখা ছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারিনি।

এত শক্তি ওর শরীরে এলো কোথা থেকে? এ কি শুধু ওর বেপরোয়া মনোভাবের জন্যে? শেলীকে খুন করার ব্যাপারে আমাকে ব্যবহার করার পর আমার চেয়ে ওরই অনেক বেশি কিছু পাওয়ার ছিলো। আর তা থেকেই কি ওর মনে বিদ্বেষ,

ঘৃণা আর প্রচণ্ড ক্রোধ জেগে উঠেছিল ? তারই কি বহিঃপ্রকাশ এই অবিশ্বাস্য শক্তি ?

কিন্তু একজন পুরুষের সঙ্গে ও কতক্ষণই বা লড়তে পারে। আমি ততক্ষণে ওর ওপর হাঁটু গেড়ে চেপে বসেছি। আমি বুঝতে পারছি, আমার বাড়তি ওজন আর শক্তি ওর জোর কমিয়ে দিচ্ছে। প্রতিরোধের শক্তি ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসছে। বুকের কাছ থেকে ওর ডান হাতটা যখন জোর করে নামিয়ে দিলাম—ফোঁপানির মতো শব্দ করে ও শ্বাস নিলো। আমার বাম হাঁটুর নিচে ওর ডান হাতটা চেপে রাখলাম। হঠাৎ হাতটা ছুটাতে চেয়ে বেপরোয়াভাবে ও বাম হাতে আমাকে আক্রমণ করে বসলো। আচমকা আমার মুখ খামচে ধরলো। হাতের কব্জি ধরে আমার চোখের নিচে বসে যাওয়া ওর তীক্ষ্ণ নখগুলোকে সরিয়ে দিলাম। ও কিন্তু হাতটা আমার মুঠো থেকে ঝট্‌কা মেরে ছাড়িয়ে নিতে চাইলো। তাড়াতাড়ি দু'হাতে ওই হাতটাকে চেপে ধরে আস্তে আস্তে মেঝের ওপর নামিয়ে নিলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার ডান হাঁটুর নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে চেপে রাখলাম।

এবার, এবার কোথায় যাবে তুমি, পারভীন ? তোমাকে এবার মেঝের সাথে একেবারে গেঁথে ফেলেছি। তোমার সব তেজ এবার আমার হাতের মুঠোয়। বড় বড় চোখ করে ওর দিকে তাকালাম।

পারভীন এবার উপায়ান্তর না দেখে পা ছুঁড়ে আমার পেছন দিকে লাথি দিতে থাকলো। সেই সাথে হাঁটু দিয়ে আমার

পিঠে আঘাত করলো। শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে মোচড় দিয়ে হাত দুটো ছাড়াতে চাইলো। দাঁত খিঁচিয়ে ঘাড় উঁচু করে আমাকে কামড়ে দেবার চেষ্টাও করলো। কিন্তু কোন ভাবেই সুবিধে করতে না পেরে ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসায় ফুঁসতে থাকলো পারভীন। সত্যি বলতে কি, তখন ও আর মেয়ে নয়, মহা ফাঁদে পড়া একটা বেপরোয়া হিংস্র জন্তু যেন।

বেশ কিছুক্ষণ আমার ফাঁদে আটকা থেকে ছটফট করলো। যখন বুঝলো ওর আর কোন উপায় নেই, তখন অসহায়ের মতো মৃদু শব্দ করে কেঁদে উঠলো। চোখের কোল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে। আর ঠিক সে সময়েই আমার হাত দু'টো ধীরে ধীরে ওর গলার দিকে এগিয়ে গেলো। ...

'কাঁদো, পারভীন, কাঁদো! চিৎকার করে কাঁদো! আরও আগেই তোমার কাঁদা উচিত ছিল। কিন্তু কাঁদতে গিয়ে এটা ভেবো না যে, কেউ তোমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। আর শাহেদ খান, তোমার সাধের স্বামী প্রবর— সে আসতে আরও দু'ঘণ্টা। তবু কাঁদো, তোমার কান্না আমার মাঝে এখন আনন্দের দোলা দিচ্ছে।'

'আমাকে মেরো না, রাসেল, রাসেল...' আর্তচিৎকার করে উঠলো পারভীন।

'মরণ যখন চোখের সামনে, তখন আর ওকথায় কোন কাজ হয় না, পারভীন।'

'রাসেল, এখনও সময় আছে,—চলো আমরা পালিয়ে যাই!'

'তুমি আমাকে যে পথে টেনে এনেছ, সেখান থেকে আর পালিয়ে যাওয়া যায় না।'

'আমি বাঁচতে চাই, রাসেল। আমি—আমি তোমাকে বিয়ে করবো।'

সেই মুহূর্তেই প্রচণ্ড একটা থাবায় ওর টুঁটিটা চেপে ধরতে ইচ্ছে করছিল। বিয়ে করবে বলে আবার আমায় লোভ দেখাচ্ছে ?

'বিয়ে করবে··· ?' গলা থেকে আমার শ্লেষ ঝরে পড়লো।

'আমাকে তুমি বিশ্বাস করো—আমি···'

'তোমাকে বিশ্বাস করে করেই তো এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি···'

আমার দশটা আঙ্গুলের নিচেই এখন ওর গলাটা।

'রাসেল···' শরীরটা একটু মোচড় দিয়ে বললো, 'আমাকে ছেড়ে দাও, রাসেল। চলো, আমি এখনই তোমার সঙ্গে যেতে রাজী আছি।'

আমার আঙ্গুলগুলো ওর গলার ছোঁয়া পেলো।

'ছেড়ে দেবো তোমাকে ? তোমার মতো বিশ্বাসঘাতিনী জঘন্য নীচ একটা পিশাচিনীকে ?'

আমি জানি, ওকে ছেড়ে দিলে পরমুহূর্তে ক্রুদ্ধ সাপের মতো ফণা তুলে আমার ওপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। ওর চোখের দিকে তাকালেই সব বোঝা যায়। চেপে ধরার যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ থেকে হিংস্রতার ছাপ এখনও যায়নি। মুখে বললেও দয়া ভিক্ষা বা অনুশোচনার

কোন চিহ্ন ওখানে নেই। তার পরিবর্তে একরাশ তীব্র ঘৃণা শুধু দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে ওর দু'চোখে। আমার জন্যে এত ঘৃণাও জমা রেখেছিল পারভীন? মৃত্যুর শীতল ছোঁয়া পেয়েও ওর চোখে ঘৃণা প্রকাশের কমতি নেই। রাশ রাশ ঘৃণা বুঝি উপচে পড়ছে।

ওর গলার নরম মাংসের অনুভূতি আমার সারা দেহ মনকে অপার্থিব আনন্দে ভরিয়ে দিলো।

'রাসেল—!'

আমার আঙ্গুলগুলো নরম মাংসের গভীরে তলিয়ে যেতে থাকলো।

'রা--সেল---'

'বিদায় পারভীন—বিদায়।' ওর দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে আমি বলে উঠলাম। 'আমিও আসছি পারভীন—তোমারই পিছু পিছু। এ বিশাল পৃথিবীতে তোমার যেমন স্থান হলো না, আমিও জানি, আমারও স্থান হবে না। তুমি যেখানে যাচ্ছো, আমাকেও সেখানেই যেতে হবে। পালিয়ে বাঁচার কোন উপায় নেই। তুমি যদি আজ পালিয়ে যেতে পারতে—তবু নিজেকে তুমি বাঁচাতে পারতে না।'

হাত দু'টোর কনুইতে ভর দিয়ে পিঠ বাঁকা করে মোচড় দেবার চেষ্টা করলো পারভীন। তারপর ঘাড়টা কাত করে আমার শক্ত করে চেপে বসা আঙ্গুলগুলোকে আলগা করে দিতে চাইলো। বাঁচার কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

কিন্তু তোমার মৃত্যুকে তুমিই ডেকে এনেছ, পারভীন। আমার

করার কিছু ছিলো না। এই যে জীবনের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা—এর মাঝেই তুমি তোমার মৃত্যুর বীজ বপন করে রেখেছিলে। জীবনকে উপভোগের আকাঙ্ক্ষা তোমার যতই তীব্রতর হয়েছে—মৃত্যুর বীজটা ততই অংকুর মেলেছে। সারা জীবন ভর হাহাকার করা একটা প্রচণ্ড অতৃপ্তিই আজ তোমাকে ঠেলে নিয়ে এসেছে মৃত্যুর এই হিমশীতল দুয়ারে। তবু তো, শেষ মুহূর্তেও আমাকে ঘৃণা দেখাতে তোমার বাধলো না। হায় পারভীন—উপভোগের জীবনটা তোমার এসেও এলো না।

আমার বুড়ো আঙ্গুল দু'টো—ওর শ্বাসনালী খুঁজে নিয়ে সেখানে দ্রুত ডুবে গেলো।

অপলক তাকিয়ে আছি আমি ওর দিকে। শরীরটা ওর কাঁপছে। দম বন্ধ হয়ে গেছে। চোখ দুটো যেন আপন জায়গায় থাকতে পারছে না। কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এলো। সবশেষে মুখটা হাঁ হয়ে গেলো। বেরিয়ে আসছে জিভ।

হিংস্র হাত দুটো আমার আরো জোরে চেপে বসলো ওর শ্বাসনালীর ওপর।

ওর মৃত্যু যেহেতু আমি আর দেখতে চাইছিলাম না—চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

একেই বলে নিয়তি। জনাব কমিশনার সাহেব, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা শুনে আপনিও হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন। নিয়তি যেমন আপন হাতে গড়ে নেয়া যায় না, তেমনি ইচ্ছে থাকলেও নিয়তিকে খণ্ডন করা যায় না। পুরো ঘটনা

শোনার পর আপনার প্রতিক্রিয়া জানা আমার সম্ভব হবে না, তবু আশা করবো, আমার প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হবে না।

এই টেপটা আমি আপনাকে ডাকে পাঠিয়ে দেবো। পারভীন তো মৃত। প্রচণ্ড গরমে এই বাংলোতে রেখে যাওয়া ছাড়া ওর জন্যে আর কোন ব্যবস্থা করতে পারলাম না বলে আমারও খারাপ লাগছে। তবে ভরসা এই, টেপটা পেয়ে, শোনা মাত্র আপনারা ওর একটা ব্যবস্থা করবেন। ওকে খুঁজে পেতে আপনাদের আর তেমন বেগ পেতে হবে না।

আর আমাকে? আমাকেও খুব শীঘ্রিই পেয়ে যাবেন। আপনার হাতে টেপ পৌছার আগেই হয়তো কেউ গিয়ে আপনাদের একটা জ্বলন্ত গাড়ির খবর জানাবে—সেখানেই আমি থাকবো।

আপনি হয়তো ভাববেন, ঐ পিস্তলটা চালিয়ে বাংলো ঘরেই কাজটা আমি শেষ করে নিলাম না কেন? অসম্ভব, স্বীকার করতে লজ্জা নেই, নিজের হাতে গুলি চালিয়ে একটা তপ্ত সীসের টুকরো শরীরের ভেতর ঢুকিয়ে নেবার মতো মনের বল আমার নেই। আমি খুনী হতে পারি, কিন্তু ওভাবে আত্মহত্যা করার মত মানসিক শক্তি আমার নেই। আমার পক্ষে সহজ উপায় ওই একটাই—ফিয়াট গাড়িটা নিয়ে ঐ টিলার বাঁকটায় চলে যাওয়া এবং ভাঙা বেড়াটার পথে শেলীকে অনুসরণ করে নিচে নেমে পড়া। সেটা আমি করতে পারবো, কমিশনার সাহেব, কারণ ওখানে আমার ভূমিকাটা তেমন বেশি কিছু নয়। খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে ঠিক জায়গা মতো

এসে স্টিয়ারিং হুইলটা বেড়ার ভাঙাটা বরাবর ঘুরিয়ে দিলেই হবে। কোন কিছুতে ধাক্কা লাগার আগে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। আর ধাক্কা যখন লাগবে—আমি তখন শেষ। ওপথে যেতে আমার কোন ভয় নেই।

শেলী কি আমার জন্যে সেখানে অপেক্ষা করে আছে? ও কি বসে থেকে থেকে আমাকে ও পথে টানছে? অনেকেই তা বলতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় না। সত্যি যদি সে ওখানে আমার জন্মে অপেক্ষা করে থাকে, তবে তা কিন্তু আমার জন্মে এক অট্টহাসির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আপনি হয়তো এর কারণ জানতে চাইতে পারেন। আপনাকে আমি তেমন কিছুই বলতে পারবো না, তবে যে কোন কারণেই হোক না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—শেলী আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে না। থাকতে পারে না। আমি আপনাকে বলতে পারি, ওখানে গিয়ে যা দেখবো, তা হলো—শুধু অন্ধকার আর বিভীষিকাময় স্তব্ধতা। না, না, ওতেও আমার কোন ভয় নেই।

সব শেষে, কমিশনার সাহেব, আমি বিদায় নিচ্ছি। তার আগে আপনার এতটা মুল্যবান সময় আমার জন্যে ব্যয় করার জন্যে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

রাসেল নামে আপনার পরিচিত একটা ছেলে আজ হারিয়ে গেলো।

আমার জন্যে দোয়া করবেন।

খোদা হাফেজ।

নয়

রেকর্ডার থেকে ক্যাসেটটা বের করে নিলো রাসেল। আর সামান্য একটু টেপ বাকী ছিল—সময় মতই শেষ হয়েছে বক্তব্য। খানিক নাড়াচাড়া করে রেকর্ডারের মধ্যেই আবার ঢুকিয়ে দিলো ক্যাসেটটা।

একটা সিগারেট ধরালো রাসেল।

রেকর্ডিং-এর শেষের দিকের কথা ভাবতে গিয়ে মনে মনে সে হাসলো। বেশ ভাবালুতায় পেয়ে বসেছিল। মৃত্যুর কথা বর্ণনা করতে গিয়ে যেন সে অন্য একটা জগতে চলে গিয়েছিলো। অবধারিত মৃত্যুকে যেন সে কিছুতেই এড়াতে পারবে না।

ডান চোখের নিচটা বেশ টন্‌টন্‌ করছে। কি করবে কিছুই ভেবে পেলো না। টেপ রেকর্ডারটা একটু ঠেলে টেবিলের মাঝে রাখলো। তারপর রেঞ্চটা হাতের কাছে টেনে নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালো রাসেল। আর বেশি সময় নেই, এখন যে-কোন সময় এসে পড়বে শাহেদ খান।

দূরে ওই পাহাড়ী পথটায় চোখ রাখলো রাসেল। চেয়েই থাকলো কিছুক্ষণ ধরে। একসময় দেখতে পেলো, পাহাড়ের গা বেয়ে একটা গাড়ি নেমে আসছে। ধুলো উড়িয়ে আরও কিছুটা আসতেই রাসেল বুঝতে পারলো, ওটা একটা পুরনো ফোর্ড ব্রঙ্কো পিক-আপ।

আর দেরি করলো না রাসেল। উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারটাকে একপাশে সরিয়ে রাখলো। সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটা পায়ের নিচে পিষে ফেললো। মনের সমস্ত ভাবালুতা ঝেড়ে ফেলে নিজেকে কঠিন করে তুললো। একটা চাপা হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে—আর সেই সাথে সারা মুখটায় ছড়িয়ে পড়লো হিংস্র একটা ভাব। টেবিল থেকে রেঞ্চটা তুলে নিলো রাসেল। ভালো করে মুঠিতে ধরে বাংলোর দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলো। দরজার একপাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো।

গাড়ির শব্দ শুনে রাসেল বুঝলো, এসে গেছে। দরজার প্রায় কাছে এসেই গাড়িটা থেমে গেলো। দম নিলো রাসেল।

গাড়ির দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনলো।

'তুমি কি ভেতরে আছো, পারভীন?' বাংলোর দরজার দিকে পা বাড়িয়েই মোটা গলায় হেঁকে উঠলো শাহেদ খান।

এগিয়ে আসার পায়ের শব্দ কানে এলো।

দম বন্ধ করে নিজেকে তৈরি করে নিলো রাসেল। রেঞ্চটাকে ডান হাতের মুঠিতে খুব শক্ত করে চেপে ধরলো।

ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেলো। ভেতরে পা দিলো

শাহেদ খান।

মুহূর্তমাত্র দেরি করলো না রাসেল। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করলো। কোন রকম শব্দ না করেই একটা পাক খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেলো শাহেদ খান। রেঞ্চের প্রচণ্ড আঘাতটা মাথার ঠিক মাঝখানে পড়েছে। তাই হয়তো মৃত্যু ঘটতে বিন্দুমাত্র দেরি হয়নি। শাহেদ খান বুঝতেই পারলো না কার এবং কিসের আঘাতে তার মৃত্যু হলো।

কাজটা এত সহজে সমাধা হয়ে যাবে, রাসেল নিজেও তা ভাবতে পারেনি। মেঝেতে লুটানো দেহটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো সে। শ্বাস নিচ্ছে ঘন ঘন। ডান হাতটা মৃদু ঝাড়া দিয়ে নিলো—অত জোরে রেঞ্চের মতো ভারী জিনিসটা দিয়ে আঘাত করতে গিয়ে রগে বেশ টান লেগেছে। হাঁটু গেড়ে বসে পরীক্ষা করে দেখলো রাসেল—না, বেঁচে নেই। অমন আঘাতের পর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকার ভয়টা দূর করে নিলো সে। নিশ্চিত হয়ে রেঞ্চটা রেখে দিলো টেবিলে।

তারপর মৃতদেহটাকে চিৎ করে শুইয়ে দিলো। চেহারাটা দেখতে গিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলো। জামা ও প্যান্টের পকেটে দ্রুত হাত চালিয়ে সবকিছু দেখলো রাসেল। তেমন কিছুই পেলো না। পলিথিনের কাগজে জড়ানো ড্রাইভিং লাইসেন্স, কিছু চিঠিপত্র আর একশ টাকার একটা নোট। আর বের হলো সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই, একটা রুমাল, পকেট চিরুণী। সব জিনিসই টেবিলের ওপর জড়ো করে রাখলো। তারপর নিজের পকেটেও হাত চালালো। সবকিছু বের

করে আলাদা ভাবে রাখলো টেবিলে।

শাহেদ খানের গা থেকে দ্রুত হাতে সমস্ত জামাকাপড় খুলে নিলো। জাঙ্গিয়া আর জুতো মোজাটাই শুধু অবশিষ্ট রইলো মৃতদেহে।

উঠে দাঁড়িয়ে নিজের নাইলনের সাদা শার্ট নীল ঢোলা প্যান্টটা খুলে ফেললো রাসেল। শাহেদ খানের চেক শার্ট, ছাই রঙের পুরোনো ফ্লানেলের প্যান্টটা পরে নিলো। আর নিজের জামা প্যান্ট শাহেদ খানকে পরিয়ে দিলো। টেবিলের ওপর রাখা জিনিসগুলো নিজের পকেটে পুরলো।

মৃতদেহের জামা কাপড় বদলানো যেমন কঠিন, তেমনই বিরক্তিকর। খুব ধীরে সুস্থে করতে গিয়েও রাসেল ঘেমে উঠলো। রুমালে কপালের ঘাম মুছে ঘড়ি দেখলো। প্রায় ছ'টা বাজে। সন্ধ্যে হতে এখনও ঘন্টা খানেক বাকী। পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে যাবার শেষ চেষ্টা সে করবে। এখন তো ওর এই একটা কাজই বাকী। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে হবে। আর তা করার জন্যে অন্ধকার একটু গভীর হয়ে নামা দরকার। অন্ধকারের জন্যে আরও এক ঘন্টার ওপর অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু অতটা সময় এই দম বন্ধ করা ঘরটায় কাটানো সম্ভব নয়। ডিভানের ওপর চোখটা পড়তেই নাক-মুখ কুঁচকে উঠলো রাসেলের। পারভীনের প্রেতাত্মার সঙ্গে এতক্ষণ বসে থাকার কোন মানে হয় না।

দরজার চাবিটা খুঁজতে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দেয়া

পারভীনের স্যুটকেসটা নজরে পড়লো। দ্রুত পায়ে গিয়ে স্যুটকেসটা তুলে আনলো রাসেল। টেবিলের ওপর রেখে খুললো। এলোমেলো গোছানো খান কয়েক শাড়ী কাপড় সরাতেই শেলীর গয়নার বাক্সটা নজরে পড়লো। গয়নার বাক্সটাই স্যুটকেসের বেশির ভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে। বাক্সটার ডালা খুলে চাপা হাসি হাসলো রাসেল। না করা সত্ত্বেও পারভীন কথাটা কানেই তোলেনি। বীমা করা হীরেটাও নিয়ে আসতে ভুল করেনি। আশ্চর্য লোভ ছিল পারভীনের।

শাড়ী কাপড়গুলো বের করে শুধু গয়নার বাক্সটা স্যুটকেসে রেখে তা বন্ধ করলো রাসেল। টেপ রেকর্ডারটার পাশে গুছিয়ে রাখলো। তারপর নতুন পোশাকে ঘর থেকে বাইরে এলো। দরজাটায় তালা লাগিয়ে দিলো।

এলাকাটা জনবসতিহীন। তবু হঠাৎ করে কেউ এসে পড়তে পারে। তাইতো শাহেদ খানের মৃতদেহটা এখন বের করে আনতে সাহস পেলো না রাসেল। একটু আঁধার নামলেই এই কাজটা করবে বলে মনস্থির করলো।

সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। আরও এক ঘন্টা পর সূর্য ডুবে যাবে সাগরে। বালুর তাপ এখনো কমেনি। হাঁটতে হাঁটতে রাসেল তার ফিয়াট গাড়িটার কাছে চলে এলো। একটা গাছের গুঁড়ির সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়লো। তারপর পরম নিশ্চিন্তে সিগারেট ধরালো।

ফিয়াটের মধ্যে পাওয়া মৃতদেহটা যে তার নয় এটা বের করতে কবীর হোসেনের কত সময় লাগবে? রাসেল তার পরি-

কল্পনাটা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলো। তবে কবীর হোসেনের মতো অত্যন্ত চালাক গোয়েন্দাকে কম গুরুত্ব দেয়া আর ঠিক হবে না। শেলীর গাড়িটা যেমন সাংঘাতিক ভাবে জ্বলেছিলো; এটাও যদি তেমনি জ্বলে তাহলে ঐ দেহ আর কারও চিনতে পারার কথা নয়। কিন্তু কবীর হোসেন ছাড়বে না। সে তার স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। চেষ্টা করবে সামান্যতম সূত্রও খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। তাকে ফাঁকি দেয়া হয়তো সম্ভব হবে না। হয়তো এমনও হতে পারে, শাহেদ খানের দাঁতগুলোই সব চালাকী মাটি করে কবীর হোসেনকে সূত্র পাইয়ে দেবে। তবে সবকিছু অনুসন্ধান করতে সময় লাগবে। অনুসন্ধানের ব্যাপারে আরেকটা ধাঁধাঁ থাকবে গাড়িটা। সবকিছু মিলিয়ে কবীর হোসেনের সিদ্ধান্তে আসতে আসতে যে সময় লাগবে ততক্ষণে সে পালিয়ে গিয়ে নতুন কোন দেশে নতুন ভাবে জীবন যাত্রা শুরু করতে পারবে। মৃতদেহটা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে না আসা পর্যন্ত তারা হয়তো তাকে আর খুঁজবে না।

খাদে পড়ে আরেকটা গাড়ি জ্বলছে খবরটা পুলিশের কাছে পৌঁছা মাত্রই তাদের সমস্ত মনোযোগ সেখানে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে। সে সময় থেকে মৃতদেহটা ওর নয় তা প্রমাণের আগে পর্যন্ত যেটুকু সময় পাওয়া যাবে সেইটুকুই রাসেলের পুঁজি।

আগে তো ঠিক করেছিলো নৌকা করেই পালিয়ে যাবে। তবে রাতের বেলায় সে-পথে রওনা দেবার ব্যাপারে চিন্তা করলো রাসেল। সন্ধ্যার পর থেকেই নদীতে টহল পুলিশ নেমে যায়।

তার চেয়ে রাত একটু বেশি হলে কক্সবাজারের পথেই বেরিয়ে যাওয়া ভালো। ভোরের দিকে কক্সবাজার পৌঁছে নৌকা নিয়ে মহেশখালী। তারপর চোরাই একটা ষ্টীম লঞ্চ পেয়ে গেলেই হলো। দুপুরের মধ্যে দেশের সীমানার বাইরে চলে যেতে পারবে। সমস্যা দেখা দিবে পাসপোর্টের। কিন্তু তা নিয়ে ভাবলো না রাসেল। টাকা থাকলে ওসব কোন সমস্যাই নয়। এখন এ বিপদের হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়াই বড়ো কথা। তবে পরিকল্পনাটা কাজে লেগে গেলে সে-সম্ভাবনাও খুব উজ্জ্বল বলেই তার মনে হলো।

আসল কাজ হলো ফিয়াট গাড়িটাকে সেই খাদের কাছে নিয়ে গিয়ে নিচে পাঠিয়ে দেয়া। গাড়িটাকে জ্বলতে দেখে আবার এই বাংলোতে ফিরে আসা। তারপর শাহেদ খানের কোর্ড ব্রকোটা নিয়ে কক্সবাজারের পথে পাড়ি জমানো।

সবকিছু চিন্তা করতে করতে বেশ কয়েকটা সিগারেট পুড়ালো রাসেল। এখন শুধু অন্ধকার নামার অপেক্ষা। অন্ধকার নামলেই সে তার চিন্তা মতো কাজে লেগে যাবে। এই তার শেষ কাজ। এ কাজে সফল হলে সে বেঁচে যাবে। কবীর হোসেনের ক্রুর হাসিতে ওকে আর বিদ্ধ হতে হবে না।

গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে সন্ধ্যা নেমে এলো। নাম না জানা পাখিগুলো ডেকে ডেকে ঘরে ফিরছে। এখনই সামনের ঐ বালুকাবেলায় সাগরের কালো জলে আঁধার নেমে আসবে। আঁধার নামবে ঐ বাংলো ঘরে। যেখানে এখন পড়ে আছে দু'টো মৃতদেহ। কিছুক্ষণ আগেও রাসেল দেখে এসেছে

ডিভানের ওপর শোয়া মৃতদেহটার গায়ে মাছি উড়ছে।

ফিয়াট গাড়ির দরজা খুলে স্যুটকেসটা বের করে নিলো রাসেল। ওটা রেখে যাবে বাংলোতে। কারণ খাদে গাড়িটা ফেলে দেবার পর ওকে প্রায় দু'তিন মাইল হাঁটতে হবে। তার আগে কোন বেবী বা বাস পাবে না। হাঁটতে হবে বাংলোর কাছাকাছি এসেও অনেকটা পথ। স্যুটকেস হাতে হাঁটা বেশ কষ্টকর হবে। তাছাড়া ফিয়াট গাড়ি খাদে ফেলে ফেরার পথে শহরের ব্যস্ত কোন এলাকা থেকে সম্ভব হলে পুলিশকে একটা ফোন করে দেবার ইচ্ছেও ওর আছে।

অন্ধকারে টলতে টলতে বাইরে এলো রাসেল। কাঁধে শাহেদ খানের মৃতদেহ। এত ওজন যে সামাল দিতে ওর কষ্ট হচ্ছে। বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে পাগুলো বালিতে ডুবে যাচ্ছে। কষ্ট হলেও কাঁধ থেকে নামালো না মৃতদেহটা। ওতে বালি লাগ্যানো যাবে না। কোন রকমে গাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছলো। দরজা খুলে ওর দেহটাকে চালকের আসনের ঠিক সামনে মেঝেতে শুইয়ের দিলো।

বাংলো ঘরটায় ফিরে এলো আবার। যা যা নেবে টেবিলের ওপর একত্র করে রাখলো। শাহেদ খানের কাছ থেকে নেয়া গাড়ির চাবিটা একবার নিজের পকেটে নিলো, আবার কি মনে করে তা টেবিলের ওপরই টেপ মেশিনটার গা ঘেঁষে রাখলো। আঁধারের মধ্যে পরে যেন খুঁজে পেতে কোন অসুবিধা না হয়— ঠিক সেভাবেই সবকিছু রেখে ঘর থেকে বের হয়ে এলো। দরজায় চাবি ঘুরিয়ে তালা লাগালো রাসেল।

বাইরে দাঁড়িয়ে তাকালো চারদিকে। ঘন আঁধারের মাঝে কিছুই নজরে এলো না রাসেলের। নাহ্, তেমন কোন ভয় নেই। কেউ এদিকে সাধারণতঃ আসে না। ঘরে শুধু এখন পারভীনের প্রেতাত্মাই রইলো। আর রইলো ওর টাকা-পয়সা আর গয়নার বাক্স। পারভীনের তো ওসবের দিকে প্রচণ্ড লোভ ছিলো।

জঙ্গলের ধারটায় এসে ফিয়াট গাড়িতে উঠে বসলো রাসেল। পায়ের কাছে শাহেদ খানের মৃতদেহটার স্পর্শ লাগতেই সারা শরীর শির শির করে উঠলো। এই প্রথম বারের মতো রাসেল অনুভব করলো, কেমন যেন একটা ভীতি তার শিরদাঁড়া বেয়ে ওপর দিকে উঠছে। কী-হোলে চাবিটা ঢোকাতে গিয়েও যেন হাতটা কাঁপলো। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে সশব্দে পুরোনো গাড়িটা চালু হতেই সে ভাবটা আবার কেটে গেলো। ইঞ্জিনটাকে একটু গরম করে ব্যাক গিয়ারে গাড়িটা নিয়ে এলো রাস্তায়।

খুব স্বচ্ছন্দ গতিতে গাড়ি চালাতে থাকলো রাসেল। মনটাও বেশ ঝরঝরে লাগছে। এখন আর তার কোন ঝামেলা নেই। নেই পারভীনের পিছুটান। নিজের বাঁচার এই সুযোগটুকু সৃষ্টি করতে পারলেই সে মুক্ত। কিন্তু পুলিশ কি এখনও সেই খাদের বাঁকটা পাহারা দিচ্ছে? যদি এখনও পাহারায় থাকে তবে তো সে ডুবে যাবে। কিন্তু এখনও কেন পাহারা দেবে সে জায়গা? কবীর হোসেন যখন রাসেলকে খুনী বলে নিশ্চিত হয়ে গেছে, তখন আর ওখানে পাহারা বসিয়ে কি লাভ? ওকে ধরার জন্যে সেখানে রাতভর পুলিশ রাখার কোন যুক্তিই রাসেল খুঁজে পেলো না। কবীর হোসেন

নিশ্চয় এ কাজের জন্যে অন্য ব্যবস্থা নিয়েছে।

আর সে-সুযোগটাই রাসেল নেবে।

খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে চলে এলো সে এলাকাটায়। গাড়িটা আঁকাবাঁকা পথ ধরে ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠে চলেছে। আর কিছুদূর এগোলেই সেই বাঁকটা আসবে—গাড়ির আলোয় ভাঙা বেড়াটা অস্পষ্ট হয়ে উঠবে। ঐ পথেই সে শেলীর গাড়িটাকে খাদের পথে নামিয়ে দিয়েছিলো। মরার আগে শেলীর কতই না কাকুতি-মিনতি—প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলো। অথচ ওর জন্যে সামান্যতম সহানুভূতিও রাসেলের মনে ছিলো না। আর পারভীনকে এত তীব্র ভাবে পাওয়ার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত কি পেল? মৃত্যুর আগে পারভীন একরাশ ঘৃণা ছিটিয়ে গেলো ওর ওপর। সে-দৃশ্যটা মনে হতেই হাত দুটো কেঁপে উঠলো রাসেলের।

ঐ খাদের বাঁকটা যতই কাছে আসছে, রাসেলের বুকে ধুক-ধুক শব্দ বাড়তে লাগলো ততই। গাড়ির সামনের ছোট আলোটা জ্বালিয়ে এগোচ্ছে সে। বেশ সাবধানে। আবছা আলোতে ভাঙা বেড়ার ফাঁকটা নজরে পড়তেই গাড়ি থামালো রাসেল।

গাড়ি থেকে নেমে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখে এলো চারধারটা। খাদের গভীরে নজর গেলো—সেখানে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। ওদিকে সর্পিল রাস্তাটা পিঠ বাঁকানো একটা ঢেউ খেলে আঁধারে মিলিয়ে গেছে। তারার আলোয় এর বেশি কিছু আর ওর নজরে পড়লো না।

তাড়াতাড়ি ফিরে এলো সে গাড়িতে। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। গাড়িটাকে খাদে নামিয়ে দিয়ে তাকে অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। তারপর পৌঁছুতে হবে বাংলোতে। তারপর দীর্ঘ পথ-যাত্রা-চোরাকারবারীদের লঞ্চে উঠলে তবেই পাবে সে মুক্তির স্বাদ।

গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে এলো খাদের একদম মুখোমুখি। ভাঙা বেড়াটার গা ঘেঁষে রাখলো গাড়িটা।

গিয়ারটা নিউট্রাল করে ব্রেকটা ছাড়লো। তারপর ঝট করে গাড়ি থেকে নেমে এলো রাসেল। গাড়ির ইঞ্জিন চালুই রইলো। শাহেদ খানের শক্ত হয়ে ওঠা মৃতদেহটাকে কোন মতে টেনে সামনের সীটে বসালো।

এর পরের কাজটাই হবে চালাকীর—এবং কঠিনও বটে। এখানে দেখাতে হবে গাড়ির গিয়ার ঠিক মতোই কাজ করছিলো। গিয়ার যদি নিউট্রালে থাকে তবে কবীর হোসেনের বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না, ব্যাপারটা কি ঘটেছিলো। শুধু মাত্র এই একটা সূত্রই তাকে জানিয়ে দেবে যে গাড়িটা খাদের ধারে এনে ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে, চলন্ত অবস্থায় হঠাৎ করে পড়ে যায়নি।

গাড়ির দরজাটা খুলে আটকিয়ে রাখাটা সমস্যা হয়ে দেখা দিলো। অগত্যা কাঁধ দিয়ে ঠেলে রেখে গাড়ির ভেতর ঝুঁকে পড়লো রাসেল। এক হাত বাড়িয়ে ক্লাচ্ প্যাডাল চেপে ধরলো। অন্য হাতে গিয়ারটাকে ঠেলে তৃতীয় ঘরে নিয়ে এলো। হাত দিয়ে ক্লাচ্টা চেপে রাখতে ভারী কষ্ট হচ্ছে—কিন্তু উপায়

নেই। ইঞ্জিনটাকে খুব জোরে চালু হতে সময় দিতেই হবে। সে সময় পর্যন্ত চোক্‌টা সম্পূর্ণ টেনে রাখলো। গাড়িটাকে কাঁপিয়ে ইঞ্জিন তার আপন মেজাজে গড়্‌ গড়্‌ করে উঠলো। তারপর একটা লম্বা দম নিলো রাসেল। ক্লাচ্‌টা ছেড়ে দিয়েই লাফ দিল পেছন দিকে।

গাড়িটা আচমকা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সামনের অন্ধকার খাদে লাফিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজাটা রাসেলের কাঁধে মারলো এক প্রচণ্ড ধাক্কা।

সে-ধাক্কায় ছিট্‌কে দু'পাক গড়িয়ে পড়লো রাসেল। তড়িৎ গতিতে নিজের পা দু'টো টেনে নিলো—গাড়ির পেছনের চাকা দুটো সোঁ করে বেরিয়ে গেলো।

চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলো গাড়িটা।

কিন্তু রাসেল বুঝতে পারলো চাকার নিচে থেকে পা সামলাতে গিয়ে এখন পায়ের নিচে সে মাটি পাচ্ছে না। পা দুটো শূন্যে ঝুলছে। শরীরের নিচটা খাদে পড়ে আছে। নিচের দিকে চলে যেতে যেতে প্রাণ ভয়ে সে ওপরের ঘন দুর্বা ঘাসগুলো আঁকড়ে ধরলো। কিন্তু তা কোন কাজে এলো না। বুকটা মাটির সঙ্গে ঘষাতে ঘষাতে শরীরটা ধীরে ধীরে খাদের দিকে পিছলে যাচ্ছে। প্রাণে বাঁচার মতো কোন শক্ত অবলম্বনই সে হাতের কাছে আঁকড়ে ধরার জন্যে পেলো না। সমস্ত শরীরটাই এখন শূন্যে ঝুলছে।

তাড়াতাড়ি একটা হাত নামিয়ে খাদের গায়ের নরম মাটির মধ্যে আঙ্গুলগুলো গেঁথে নিচে পড়ে যাওয়া থেকে

কোন মতে রক্ষা পেলো।

সেই ভাবেই ঝুলে থেকে অনেক কষ্টে দম নিল। সারা শরীর ঘেমে উঠেছে। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটার শব্দ। হাতের ওপর সমস্ত শরীরের চাপ। হাতটাও থর থর করে কাঁপছে।

পায়ের পাতাটাকে আশ্রয়ের আশায় এদিক ওদিক নাড়লো। কিন্তু কোন কিছুই পাওয়া গেল না। এখানটায় খাদের ধারটা খুব খাড়া। কোন রকম খাজ নেই। অগত্যা শরীরটাকে হাতে ভর করে ওপরের দিকে টেনে তোলার চেষ্টা করলো রাসেল। কিন্তু···সে শক্তি আর তার নেই। মৃত্যুর গহ্বরে পতন থেকে নিজেকে রক্ষা করার শক্তি বুঝি এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেছে।

খাদের মধ্যে গাড়িটা কয়েকটা পাক খেয়ে শেষ পর্যন্ত বিকট শব্দে এলাকাটা কাঁপিয়ে তুললো। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো আগুন। লাল আভায় আকাশটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

আর এদিকে চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছে রাসেল। কি করবে ভেবে পেলো না। মৃত্যুর এক ভয়াবহ আতঙ্ক ওর মনের ওপর চেপে বসলো।

তবু মরিয়া হয়ে নিজেকে টেনে তোলার শেষ চেষ্টা করলো। পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে খাদের মাটিতে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একটা হাঁটু কোনক্রমে খাদের ওপর তুলে আনলো। তারপর থাবা দিয়ে একটা ঘাসের গোছা ধরে শরীরের ভার সামলাতে চাইলো। কিন্তু ঘাসের গোড়াটা শিকড় শুদ্ধ ধীরে ধীরে

উপড়ে এলো···শরীরের ভারটাও ক্রমে খাদের দিকে হেলে পড়লো। রাসেল বুঝলো, আর আশা নেই, রওনা দিয়েছে সে ভয়ঙ্কর স্তব্ধতায় ভরা এক অন্ধকারের পথে।